তারাশঙ্করের শিল্পিমানস

তারাশঙ্করের শিল্পিমানস

ডঃ নিতাই বসু

পরিবেশক : দে বুক স্টোর

প্রকাশক রবি রায় ॥ মানস প্রকাশনী ৬৪ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ॥ মুদ্রক রবীন্দ্রনাথ দাশ মুদ্রাকর প্রেস ১০/১সি মারহাট্টা ডিচ লেন, কলকাতা-৩ ॥ প্রচ্ছদ অজয় গুপ্ত ॥

মূল্য ॥ পনের টাকা

স্বর্গত

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

স্মৃতির উদ্দেশে

নিবেদিত

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

রসশেখর রাজশেখর

আগামী প্রকাশন :

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ-জিজ্ঞাসা

শরৎচন্দ্র : জীবন ও সাহিত্য

সূচীপত্র

ভূমিকা

ডক্টর শ্রীমান্ নিতাই বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেছেন—এ সংবাদে হয়তো কেউ কৌতূহলী বা বিস্মিত হবেন না। কারণ এখন বাংলা সাহিত্যের নানা বিভাগ নিয়ে ছোট-বড়ো-মাঝারি মাপের নানা গবেষণা চলেছে, কিছু কিছু গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিতও হচ্ছে। পাঠকসমাজের যাঁরা রম্যরচনা-বিলাসী 'ডিলাটেন্ট্', তাঁরা এই সমস্ত বৃহৎ কর্মের প্রতি স্বভাবত উদাসীন। যাঁরা 'জর্ণালিজ্‌ম্'কে সাহিত্যের মোক্ষ বলে মনে করেন, তাঁরা বাংলা গবেষণাগ্রন্থের নাম শুনলেই 'উদ্যতমুষল' হয়ে ওঠেন। অবশ্য এ-কথাও স্বীকার করতে হবে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপমারা সব গবেষণাই সুখাদ্য বা সুখপাঠ্য নয়। যাঁদের কলম সরস্বতীর কৃপাপুষ্ট নয়, অর্থাৎ যাঁরা সুলেখক নন, তাঁদের গবেষণাগ্রন্থ অনেক সময়েই অ-বিশেষজ্ঞের কাছে নিতান্ত নীরস বলে মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা স্মরণীয় যে, সাহিত্যের গবেষণা পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার, তথ্য ও তত্ত্বগত অনুসন্ধান তার মূল লক্ষ্য। সুতরাং গবেষণাগ্রন্থ যে গল্প-উপন্যাস-কবিতার মতো মানসিক রসনালোভন হবে না, একথা তো সহজেই অনুমেয়। তবু যে গবেষণাগ্রন্থে লেখকের দূরপ্রসৃত জ্ঞান, ঋজু চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গিমার চারুতা নেই, তা তথ্যসমৃদ্ধ ও মৌলিক হলেও পাঠকসমাজে তার কদর হওয়া দুরূহ। সে যাই হোক, বাংলা গবেষণাগ্রন্থগুলি পড়তে বসে পাঠকসমাজ অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, অন্যান্য পরিশ্রমসাধ্য কাজের মতো সাহিত্যের গবেষণাও একটা মানসিক 'ডিসিপ্লিন'-এর নিয়ন্ত্রণাধীন। সেটি লেখক ও পাঠক—দু'জনের আয়ত্ত না হলে একের সঙ্গে অপরের মানসিক সংযোগ ও রসের সহমর্মিতা গড়ে উঠতে পারে না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় দুটি ব্যাপারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়—মৌলিক আবিষ্কার এবং নতুন আলোকপাত। যেখানে মৌলিক আবিষ্কারের বিশেষ সম্ভাবনা নেই, অর্থাৎ যেখানে সমস্ত উপাদানই মুদ্রিতাবস্থায় সুলভে পাওয়া যায়, সেখানে প্রাপ্ত তথ্যের নতুন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ডক্টর নিতাই বসু বক্ষ্যমাণ আলোচনা গবেষণাগ্রন্থ-হিসেবে পেশ করার সময়ে এতে শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্করের তুলনামূলক আলোচনাই বিবৃত করেছিলেন এবং দু'জন লেখকের মনোভঙ্গিমা, সমাজবোধ, শিল্পিসত্তা প্রভৃতি সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ কিন্তু সংযত আলোচনা করেছিলেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময়ে তিনি তারাশঙ্কর-সম্পর্কিত অংশই মুদ্রিত করেছেন, অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে শরৎচন্দ্রের কথাও এসে গেছে।

তারাশঙ্কর অল্প দিন হল ভারতব্যাপী গৌরব নিয়ে অন্তর্হিত হয়েছেন। এখনও তিনি আমাদের আত্মীয়কল্প কাছের মানুষ, কারো বন্ধু, কারো গুরুজন। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে এখনই নিঃস্পৃহভাবে

আলোচনার সময় হয়নি। তবে যিনি সমস্ত পাঠকসমাজকে অভিভূত করেছেন, অবাঙালী পাঠকও যাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাস অনুবাদ করেছেন —তাঁকে কেন্দ্র করে মুগ্ধ ভক্ত পাঠকসমাজ গড়ে উঠবেই। তারাশঙ্কর ছোটগল্প ও উপন্যাসে এমন সমস্ত ঘটনা এবং অঞ্চলের চিত্র অঙ্কন করেছেন যার সম্বন্ধে নাগরিক পাঠকের বড়ো-একটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। সে-সব কাহিনী ও চরিত্রকে যেন কোন্ দূর বনান্তরালবর্তী রহস্যময় ইঙ্গিত বলে মনে হয়। সুতরাং তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও লেখক-জীবনের প্রতি পাঠকসমাজের কৌতূহল জাগাই স্বাভাবিক। তাই তারাশঙ্কর জীবিতকালেই সাহিত্যরসিকের শুধু রসভোগের নয়, আলোচনা ও বিশ্লেষণেরও সম্মুখীন হয়েছিলেন। ডক্টর নিতাই বসু নিছক কৌতূহলের বশে এই গবেষণাকর্মে লিপ্ত হননি। শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্করের চারিত্রমূর্তি ও সারস্বত মূর্তিকে কখনও শিল্পের মাপ-কাঠিতে, কখনও দর্শনবিজ্ঞানের তুলাদণ্ডে, কখনও বা সমাজমানস ও রাজনীতির বিতর্কসঙ্কুল উত্তপ্ত পরিবেশে তাঁদের সাহিত্যকর্মকে বিশ্লেষণ করে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। লেখক শিল্পীর অন্তর্জীবন ও শিল্পের রূপকর্মাদি আলোচনা প্রসঙ্গে যেভাবে সমাজমানসের সুবিস্তৃত পটভূমিকায় বিশ্লেষণ করেছেন, রাজনীতির অলিগলিতে বিচরণ করেছেন এবং জন ও জনতার ছায়াপটে তারাশঙ্করের খোদাইকরা নরনারীগুলিকে দাঁড় করিয়েছেন, তাতে তাঁর তথ্যসংগ্রহের নির্বাচনরীতি ও বিশ্লেষণের যুক্তিপদ্ধতি বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য।

অবশ্য ডক্টর বসুর সব সিদ্ধান্তই যে তর্কাতীত তা নয়। কারণ সাহিত্যের কোনকিছুই বেদবাক্যবৎ শিরোধার্য নয়। সুতরাং লেখকের কোন কোন সিদ্ধান্ত যদি পাঠককে প্রশ্নমনস্ক করে তোলে তাতে লেখকের মানসিক সুস্থতা এবং পাঠকের মানসিক সজীবতাই প্রমাণিত

হবে। কালে কালে সাহিত্যের প্রশ্নের বদল হয়, উত্তরেরও অদলবদল হয়। এ-কাল নানা সমস্যায় জর্জরিত, তার সাহিত্যেও সেই সমস্ত কলহকলরবের প্রতিধ্বনি সঞ্চারিত হয়েছে। একালের লেখকও জীবন সম্বন্ধে বিষণ্ণ সংশয়ী, পাঠকও সে-সম্পর্কে প্রশ্নাতুর। তাই ডক্টর বসুর আলোচনা যদি কোন পাঠককে প্রশ্নে ও প্রতিবাদে মুখর করে তোলে তা হলে বুঝতে হবে, এই লেখককে অবহেলায় বহির্দ্বারে বসিয়ে রাখা সম্ভব হবে না, তাঁকে হট্টগোলের মধ্যেই আহ্বান করতে হবে। সে যাই হোক, বহু-পঠনকে জীর্ণ করা এবং তার থেকে মানসিক বলাধান সংগ্রহ করা সাহিত্যঘটিত গবেষণার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেদিক থেকে ডক্টর নিতাই বসু সফল হয়েছেন একথা পাঠকেরা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবেন না বলেই আমার বিশ্বাস।

বাংলা বিভাগ,
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কয়েকটি কথা

প্রায় বছর দশেক আগে আমার 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে যখন ঐ লেখাটি একটি সাহিত্যপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন স্বর্গত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাটির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সেই সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠে ; সাগ্রহে তিনি ঐ বইটির একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে দেন এবং প্রধানত তাঁরই পরামর্শে আমি গবেষণায় নিরত হই। বিষয়বস্তু—'শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্করের সামাজিক চেতনার তুলনামূলক বিচার।'

সামাজিক চেতনা-প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের সমকালীন রাজনীতি, অর্থনীতি ইতিহাস প্রভৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। সুতরাং ভারতীয় সাহিত্যের দুই যুগন্ধর লেখকের তুলনা করতে গিয়ে যে বিরাট প্রেক্ষাপটের পরিচয় জানা প্রয়োজন তা রীতিমত সময়-সাপেক্ষ। এই কারণেই গবেষণাকার্য সমাপ্ত হতে প্রায় এক দশক লেগেছে এবং সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষে, বিশেষত পশ্চিমবাংলায়, যে প্রচণ্ড রাজনৈতিক ভাঙাগড়া চলছে তার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলা আমার পক্ষে অপরিহার্য হলেও নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। বিভিন্ন অসুবিধা এবং বাধাবিপত্তিসত্ত্বেও আমার গবেষণা যখন প্রায় সমাপ্তির মুখে এসে পৌঁছেছিল, তখন আমার নির্দেশক পরলোকগমন করেন। প্রচণ্ড সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

কোনো অধ্যাপকের সঙ্গে এই সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় আলোচনা করতে আমাকে উপদেশ দেন।

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমার বক্তব্য জানালে তিনি সানন্দে আমার গবেষণা-নির্দেশক হতে রাজি হন এবং পাণ্ডুলিপিটি দেখতে চান। তাঁর মূল্যবান পরামর্শে আমি রচনাটির পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ করে কৃতকার্য হই।

বলা বাহুল্য, আমার গবেষণার বিষয়বস্তুর প্রতি নিষ্ঠাশীলতার জন্য শরৎচন্দ্র বা তারাশঙ্করের সাহিত্যকর্মের সামগ্রিক মূল্যায়ন ঐ গবেষণায় অপরিহায ছিল না, পরন্তু আমি যদি উভয়ের সৃষ্টির বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতাম তাহলে তা অপ্রয়োজনীয় হত। কিন্তু আমার মনে সর্বদা জাগরূক ছিল, এই দুই লেখকের সাহিত্যসৃষ্টির বিশ্লেষণ করে দুখানি পৃথক গ্রন্থ রচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনের তাগিদে এই গ্রন্থটি রচিত হল, শরৎচন্দ্র সম্পর্কিত গ্রন্থটি আগামী বছর প্রকাশিত হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পি. এইচ. ডি. উপাধি-প্রাপ্তির জন্য আমি যে পাণ্ডুলিপিটি পেশ করেছিলাম এই গ্রন্থের প্রথম চারটি অধ্যায় সেখান থেকে গৃহীত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায় থেকে নবম অধ্যায় পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু এখানে আলোচিত হয়েছে সেখানে আমার গবেষণা সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপিটির সংশোধন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে এবং প্রয়োজনে প্রচুর নতুন তথ্যের সমাবেশ করা হয়েছে।

তারাশঙ্কর রবীন্দ্রোত্তর-পর্বের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক হিসেবে স্বীকৃতি ও সম্মান পেলেও এখন পর্যন্ত তাঁর উপর মাত্র একখানি গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বইয়ের নাম 'তারাশঙ্কর', লেখক ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র। তারাশঙ্কর-সম্পর্কিত প্রথম রচনা হিসেবে বইটির একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে, তবে বইটি অসম্পূর্ণ কারণ বইটি প্রকাশিত হওয়ার পরে

তারাশঙ্কর অন্তত ত্রিশখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। আমার নিরীক্ষার সঙ্গে ডঃ মিত্রের মতান্তর প্রাসঙ্গিকভাবে এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে।

এই বইটি সম্পর্কে আরো একটি কথা মনে রাখা দরকার। কালানুক্রমিক তালিকা অনুযায়ী তারাশঙ্করের রচনাগুলিকে সাজিয়ে অথবা গল্প-উপন্যাসের সংক্ষিপ্তসার রচনা করে আমি তারাশঙ্করের সাহিত্যের বিশ্লেষণ করিনি। বাংলাসাহিত্যের পাঠকেরা তারাশঙ্করের রচনার সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত আছেন, এ সম্পর্কে নিশ্চয়ই সন্দেহের অবকাশ নেই। পর্ব-অনুযায়ী লেখাগুলিকে না সাজিয়ে সামগ্রিকভাবে আলোচনা করে তাঁর সাহিত্যের মূল সূত্রনির্ণয় করতে আমি প্রয়াসী হয়েছি। আমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে যদি কারো মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত না হয়, তার জন্য বিব্রত হওয়া অনুচিত, কারণ ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গি থাকা শিল্পরসিকদের পক্ষে স্বাভাবিক।

এই গ্রন্থ রচনায় যাঁদের কাছে আমি অপরিসীম কৃতজ্ঞ তাঁদের মধ্যে স্বর্গত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বাদ দিলে স্বর্গত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা সর্বাগ্রে মনে পড়ে। সাহিত্যের একজন অখ্যাত ছাত্রের প্রতি তাঁর সস্নেহ প্রশ্রয়ে আমি লাভবান হয়েছি। বহু বছর ধরে তিনি যেভাবে আমার জন্য তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন, বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানার ও বোঝার সুযোগ দিয়েছেন তা একমাত্র তাঁর মত সৎ নিয়মনিষ্ঠ ভদ্র এবং সুরুচিসম্পন্ন লেখকের পক্ষেই সম্ভব। সাহিত্যসেবী হিসেবে সমকালীন বাংলার অধিকাংশ লেখকের সৌজন্যবোধের যে নমুনা পেয়েছি, একালের শ্রেষ্ঠ লেখক সেদিক থেকে কিন্তু সত্যিই ব্যতিক্রম। তাঁর বিনীত উদার ও শোভন ব্যবহার না পেলে আমার পক্ষে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনো সহজসাধ্য হত না।

অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। প্রকৃতপক্ষে তারাশঙ্করের সঙ্গে আমার যোগাযোগের সেতু হিসেবে তিনি কাজ করেছেন। আমার গবেষণার প্রতি বরাবরই তাঁর কৌতূহল ছিল। শুধু যে তারাশঙ্কর-সম্পর্কিত বহু তথ্য তিনি আমাকে সরবরাহ করেছেন তাই নয়, তারাশঙ্করের রচিত বহু গ্রন্থ তিনি আমাকে সানন্দে দান করেছেন। এই গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় আমি তাঁর মূল্যবান মতামত গ্রহণ করেছি। আলোকচিত্রী শ্রীমোনা চৌধুরী-কর্তৃক গৃহীত তারাশঙ্করের ফোটো এবং তারাশঙ্করের 'মিছিল' বইয়ের পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করতে দেওয়া আমার প্রতি তাঁর প্রীতিস্নিগ্ধ ব্যবহারেরই প্রকাশ।

বন্ধুবর শ্রীঅজয় গুপ্তের তত্ত্বাবধানে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হল। প্রচ্ছদটিও তিনি রচনা করেছেন। আমার লেখকতার প্রতি তাঁর বরাবরই ঔৎসুক্য রয়েছে এবং প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় বইটিকে পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া গেল। সহকর্মী শ্রীযুগল চক্রবর্তীর সহায়তা না পেলে গ্রন্থটির প্রকাশনায় আরো বিলম্ব হত। এই গ্রন্থটি যদি পাঠকমহলে সমাদর পায় তাহলে পাঠকদের তরফ থেকে এঁরা নিশ্চয়ই ধন্যবাদপ্রাপ্তির আশা করতে পারেন।

প্রবন্ধ-গ্রন্থ প্রকাশের ঝুঁকি নেওয়ার ব্যাপারে মানস প্রকাশনীর শ্রীরবি রায় এবং মুদ্রণ ইত্যাদি আনুষঙ্গিক বিষয়ের পারিপাট্যের জন্য মুদ্রাকর প্রেসের শ্রীরবি দাশ আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।

তারাশঙ্কর-সাহিত্যের পাঠক, ছাত্র, গবেষক ও সর্বোপরি রসিকদের কাছে বইটি সমাদৃত হলে আমার পরিশ্রম সফল হয়েছে বলে মনে করব।

৭২/৪ বারুইপাড়া লেন
কলকাতা ৩৫

নিতাই বসু

১০

জীবন

'মিছিল' বইয়ে তারাশঙ্কর রাধাদার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, 'মানুষের চরিত্র-বৈচিত্র্যের প্রধান হেতু দুটি ; প্রথম সে যে পারিপার্শ্বিক এবং পটভূমিতে জন্মেছে এবং দ্বিতীয় হল তার জীবনের ধাতু ও প্রবণতা। প্রথমটা তৈরী হয়েই থাকে, সমাজ রাষ্ট্র তৈরী করে রেখে দেয় ; দ্বিতীয় তৈরী করে দেন মহাপ্রকৃতি ; তার বংশানুক্রম থেকে সংগ্রহ করে গুছিয়ে সাজিয়ে দেন তিনিই ; চরিত্রের সবটাই যেন ঠিক হয়ে থাকে।' আমরা সঙ্গত কারণে প্রথমে চরিত্র-বৈচিত্র্যের দ্বিতীয় হেতু অর্থাৎ বংশানুক্রম-সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করে তারাশঙ্করের শিল্পিমানসের প্রবণতা লক্ষ্য করার চেষ্টা করব এবং পরিবার ও পরিবেশের পরিধি অতিক্রম করে সমাজ ও রাষ্ট্রের অভিঘাতে তাঁর মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ নির্ণয় করব দ্বিতীয় পর্যায়ে যেখানে সমকালীন যুগলক্ষণগুলি প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত হবে।

ইংরাজী ১৮৯৮ সালের জুলাই মাসে, বাংলা ১৩০৫ সালের ৮ই শ্রাবণ 'সূর্যোদয়ের ঠিক পূর্বলগ্নে'[১] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূম জেলার লাভপুরে জন্মগ্রহণ করেন।

তারাশঙ্কর স্বীকার করেছেন, তিনি তাঁর বাবার কাছ থেকে 'আধ্যাত্মিক ভাবগম্ভীরতার প্রভাবের'[২] দ্বারা নিজের মানসিক গঠনের ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট উপাদান লাভ করেছিলেন এবং 'বাবার গম্ভীর ও গভীর তত্ত্বানুসন্ধানের আকৃতি'[৩] থেকে জীবনে পথের সন্ধান লাভ করেছেন। তিনি অল্প বয়সে মারা যান এবং বাস্তব সংসারের যুদ্ধক্ষেত্রে মর্মান্তিক পরাজয়ের ক্ষোভ বহনের দুঃখকে স্বীকার করেই জীবনতত্ত্বের রহস্য অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি এবং দৃষ্টি আয়ত্ত করার চেষ্টায় ঐ বয়সের মধ্যেই যদিও তিনি কৃতকার্য হতে পেরেছিলেন তবু পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে জীবনে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছিলেন। তারাশঙ্করের রচনার সূত্র ধরেই আমরা তাঁর ডায়েরিতে পাই সরল আক্ষেপোক্তি, 'লাভপুরে আসিয়া, লোকের সংসর্গে আসিয়া অল্প-বয়সেই মদ্যপানে অভ্যস্ত হইলাম, বেশ্যাসক্তি জন্মিল'। এই রকমের কদর্য সংসর্গে কিন্তু তাঁর মানসিক প্রবণতা ছিল না, তাই তারাশঙ্করের মায়ের আবির্ভাবের পর তাঁর চরিত্রে আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে, স্ত্রীর গভীর স্বদেশানুরাগ তাঁর হৃদয়েও সংক্রামিত হয়। ঐতিহাসিক রাখীবন্ধনের অনুষ্ঠানকে স্মরণ করে তিনি ডায়েরিতে লিখেছিলেন, 'হে বিশ্বপিতা, বিশ্বপতি, জগদীশ্বর—হে জগজ্জননী, অসুরদর্পদলনী মা—একবার তোমাদের চিরআশ্রিত শরণাগত ভারতসন্তানগণকে —যাহাদের জন্য তোমরা যুগে যুগে এই ভারতভূমে অবতীর্ণ হইয়া পাপের নাশ করিয়াছ—পুণ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছ—অসুর প্রাদুর্ভাব দলন করিয়াছ—তাহাদের শক্তি দাও, তাহাদের হৃদয়ে পুণ্যের আলোক প্রজ্বলিত কর। সত্যধর্ম-হিন্দুধর্মকে গৌরবান্বিত কর। দীনবন্ধো, কৃপা কর, কৃপা কর, কৃপা কর।' এমন কি, তিনি নাকি কিছু দেশপ্রেমোদ্দীপক পদও রচনা করেছিলেন।

বাবার সঙ্গে মায়ের তুলনা করতে গিয়ে তারাশঙ্কর বাবাকে 'বিগত কালের প্রতীক'[৪] বলে চিহ্নিত করেছেন। শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ যদিও জানিয়েছেন যে শরৎচন্দ্রের প্রথম বয়সের রচনা 'শুভদা' তাঁর আত্মজৈবনিক উপন্যাস, বিশেষত 'শুভদা'র চরিত্রচিত্রণের সময় 'শরৎচন্দ্রের মনে তাঁহার মাতৃমূর্তিটি হয়তো দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত ছিল',[৫] তবু মায়ের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সম্পর্ক শীতল নীরবতায় অবলুপ্ত. 'নারীর মূল্য'-বোধে তিনি উদ্দীপিত ও অনুপ্রাণিত হন অন্নদাদিদি বা নিরুদিদির কাছ থেকে, কিন্তু নারীচরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে, তারাশঙ্করের কল্পলোকের বিরাট ভূগোলকে জুড়ে রয়েছেন দুজন মহিলা—একজন তাঁর মা, অন্যজন পিসীমা। শরৎচন্দ্র যেন আশৈশব পরিবার-বহির্ভূত এক ভবঘুরে উদাসীন মানুষ, তারাশঙ্কর আশৈশব পারিবারিক গণ্ডীর সীমিত জীবনচর্যায় অভ্যস্ত একটি স্থিতধী পারিবারিক চরিত্র। তাঁর এই মানসিকতা গঠনে প্রধানতম মূল 'প্রেরণাদায়িনী'[৬] তাঁর "তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশালিনী, বুদ্ধিতেও প্রখরা"[৭] জননী যাঁর শিল্পিতায় তাঁদের সংসারে আনে এক আকাঙ্ক্ষিত মধুর সুন্দর পরিবর্তন। তাঁর বাবা বিগত কালের প্রতীক হলেও 'অপরার্ধ নূতন কাল' যেন তাঁর মা—'জ্যোতির্ময়ী-প্রসন্ন'। বাবার হিমশীতল মৃতদেহের পাশে মাকে নতুন বৈধব্যবেশে দেখে তারাশঙ্কর যেন পরস্পর-সংলগ্ন দুই কালের অন্বয়ে নিজের শিল্পিসত্তাকে এক সমন্বিত রূপে গড়ে তুলতে প্রেরণা পান: 'অনন্তের ধ্যানে সমাধিস্থ, অর্ধনিমিলিত চক্ষু, হিমশীতল দেহ আমার বাবা আমার কালের অর্ধাঙ্গ—আমার জ্যোতির্ময়ী প্রদীপ্ত-দৃষ্টি শুভ্রবাস-পরিহিতা তেজস্বিনী মা আমার কালের অপর অর্ধাঙ্গ; আমার জীবনে আমার কাল সাক্ষাৎ অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে প্রকটিত। তাই আমার সেকাল আর একালের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই। চিরকল্যাণের একটি ধারা তার মধ্যে আমি দেখতে পাই। কোন কালে ওপারে ফুটেছে ফুল—কোন কালে এপারে ফুটেছে ফুল। আমি সকল কালের সকল ফুলের মালা গেঁথেই পরাতে চাই মহাকালের

গল্পায়। ওই অর্ধনারীশ্বর মূর্তি আমার কালের রূপ ভেদ করেই একদা আমাকে দেখা দেবেন'

আবেগতপ্ত হৃদয়ে মাতৃস্মৃতিচারণা প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর আমাদের বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তাঁর মনের ওপর মাতৃপ্রভাবের কথা। তাঁর মা ছিলেন 'পাটনা শহরের প্রবাসী বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে, বাপ ইংরিজীনবিস সরকারী চাকুরে। শুধু এইটুকু বললেই বলা হল না। তিনি অসাধারণ একটি মেয়ে। প্রতিভাময়ী'।[৯] পঞ্চদশী বালিকা-বধূর শুচিস্নিগ্ধ প্রসন্ন পদপাতে সংসারের চেহারার হল আমূল পরিবর্তন। তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্বে স্বামীর উদ্ধতা মহিমময় গাম্ভীর্যে পরিণত হল। আপন গণ্ডীর মধ্যে তিনি যেন শান্ত হয়ে সাধনামগ্ন হলেন। স্বাদেশিকতার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হলেন তিনি স্ত্রীর সান্নিধ্যে।

তারাশঙ্করের শিশুমনে দেশপ্রেমের বীজ বপন করেন তিনিই। তাঁর হাতে মায়ের রাখীবন্ধনের ঘটনাই জীবনে প্রথম মধুরতম স্মৃতি, তিনি বলেছেন, 'সেই আমার উপনয়ন'[১০]। শুধু রুচির দিক থেকেই নয়, ভাবের দিক থেকেও তাঁর মহিমময়ী জননী তাদের জীবনে এনেছিলেন যেন এক নতুন কালের স্পর্শ, এক আশ্চর্য সঞ্জীবনমন্ত্রের আস্বাদ। প্রচণ্ড অধ্যয়নলিপ্সা ছিল তাঁর, পুরাণ মহাভারত রামায়ণ থেকে শুরু করে অতি আধুনিক সাহিত্য পর্যন্ত যাবতীয় পুস্তকপাঠে তিনি ছিলেন অক্লান্ত: অসাধারণ গল্পবলিয়ে হিসেবে পুত্রের 'গল্পের আসক্তি' জন্মানোর প্রথম প্রেরণাদাত্রী। তাঁর জীবনের ওপর সার্বিক প্রভাবের কথা স্বীকার করে তারাশঙ্কর শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে মহিমময়ী জননীর সঙ্গে দেশমাতৃকার তুলনা করেছেন এবং এই উভয় জননীর দ্বৈত সত্তায় তাঁর শিল্পচেতনার অনুপ্রাণিত হওয়ার সূত্র সন্ধান করেছেন: 'আমার জীবনে মা-ই আমার সত্যসত্যই ধরিত্রী, তাঁর মনোভূমিতেই আমার জীবনের মূল নিহিত আছে, শুধু সেখান থেকে রসই গ্রহণ করেনি, তাকে আঁকড়েই দাঁড়িয়ে আছে। ওই ভূমিই
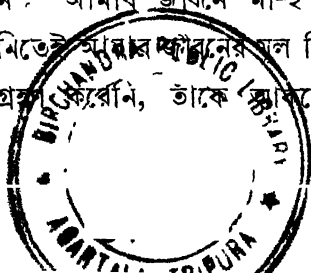
আমাকে রস দিয়ে বাঁচিয়ে প্রেরণা দিয়ে বলেছে, আকাশলোকে বেড়ে চল, স্বর্গ-আরাধনায় যাত্রা কর। তুলে ধর তোমার জীবন পুষ্প দিয়ে সূর্যার্ঘ্য'।[১১]

এর পর পিসীমা। তারাশঙ্করের জীবনে প্রথম বিশ বছর ইনি অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তিনি তাঁর কৈশোর জীবনের ছায়াছত্র। পিতার মৃত্যুর পর তিনিই তাঁর পিতার আসনে বসে-ছিলেন। একমাত্র রোগ মৃত্যু এবং দৈব দুর্ঘটনা ছাড়া তিনি অসীম সাহসের সঙ্গে অন্য যে কোন ঘটনার মুখোমুখি হতে পারতেন। কিন্তু বিশ্ব সংসারের উপর রুক্ষ ছিল তাঁর প্রকৃতি। মাত্র চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সের মধ্যেই স্বামী, দুই পুত্র, পিতা এবং তিন ভগ্নীকে হারিয়ে তিনি মেজাজের দিক থেকে বেশি মাত্রায় রুক্ষ হলেও একমাত্র ভাই এবং সেই সূত্রে ভ্রাতৃজায়া ও তাঁদের ছেলে তারাশঙ্করের প্রতি তাঁর ছিল প্রগাঢ় স্নেহ ও ভালবাসা। সমাজ ও সংসারের মৌলিক নীতিগুলোর উপর তাঁর ছিল দৃঢ় প্রত্যয়। আবার হাঁচি-টিকটিকি, দিনক্ষণ, স্বপ্ন, ভূত প্রভৃতিতে তাঁর কিছু কুসংস্কারও ছিল—কিছুটা তাঁর শূন্যহৃদয়ের কাছ থেকে কোন কিছু হারানোর ভয়, আবার কিছুটা পরিপার্শ্বের দ্বারা প্রভাবিত। সবকিছু বৈশিষ্ট্য নিয়েই তিনি তারাশঙ্করের শিল্পিসত্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন। তাই, 'তাঁর চরিত্রের ছায়া ধাত্রীদেবতার পিসীমাব উপর পড়েছে যথেষ্ট পরিমাণেই'।[১২] তাঁদের বৈঠকখানায় বা সদর বাড়ির সংলগ্ন পুকুরের পাড়ের উপর জরীপের শিকল ফেলা নিয়ে ঘটনা এবং সীমানা গণ্ডগোলের অজুহাতে তাঁদের গাছ কেটে ফেলার ব্যাপারে 'ধাত্রীদেবতা'য় বর্ণিত দুটি ঘটনাই তাঁদের বাড়িতে ঘটেছিল—দু'বারই তাঁর পিসীমা অসামান্য ব্যক্তিত্বে অত্যাচারী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলা করেছিলেন। শুধু বিক্ষিপ্ত ঘটনা কেন, তারাশঙ্করের চোখে তাঁর পিসীমা এবং ধাত্রীদেবতা দুই-ই একাত্ম হয়েছেন। তাই, কৈশোর স্মৃতিচারণায় তাঁর কথা শেষ

করবার সময় 'ধাত্রীদেবতা'র পরিশিষ্ট উদ্ধৃত করে তারাশঙ্কর তাঁকে প্রণাম জানিয়েছেন :

'সমস্ত জীবের ধাত্রী যিনি ধরিত্রী, জাতির মধ্যে তিনিই তো দেশ, মানুষের কাছে তিনিই বাস্তু। সেই বাস্তুর মূর্তিমতী দেবতা তুমি, তুমিই তো আমায় বাস্তুকে চিনিয়েছ, তাতেই চিনেছি দেশকে। আশীর্বাদ কর, ধরিত্রীকে চেনা শেষ করে যেন তোমাকে চেনা শেষ করতে পারি।'

বাবা, মা ও পিসীমা এই তিনটি চরিত্র নিয়ে একটু বিস্তৃতভাবে বলা হল কারণ, এঁরা তারাশঙ্করের 'রক্তে মাংসে মেদে মজ্জায় চিন্তনে মননে ধাতুগত'[১৩] হয়ে আছেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে তাঁর উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছেন কে? নিঃসংশয়িত উত্তর, তাঁর মা। কারণ, প্রথমত, তাঁর বাবা ও পিসীমার মতো ইংরেজের নামে একটা জৈবিক আতঙ্ক তাঁর ছিল না—সম্ভবত পুত্রের স্বাদেশিক চেতনা এবং পরবর্তী জীবনের রাজনীতি-চর্চার প্রেরণা সেখান থেকেই। দ্বিতীয়ত, এবং প্রধানত, তাঁর রুচি, শুচি-সুন্দর শিল্পিতা, নানাবিধ গ্রন্থপঠনে নিরলস সংসক্তি, গল্প বলার চমৎকার মনোহারিতা প্রভৃতির ফলে পুত্রের পরবর্তী জীবনে সারস্বতসাধনায় আত্মনিবেশের ভিত্তি তৈরী হয়েছিল। তারাশঙ্করের ভাবীজীবন সম্পর্কে তিনজনের পৃথক দৃষ্টিভঙ্গীও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। স্নেহময়ী পিসীমা সীমিত ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁকে বলতেন, 'কাছারীতে বসবি, রূপোর ফুরসীতে তামাক খাবি, সামনে বাক্স থাকবে, লোকজনে গমগম্ করবে বৈঠকখানা, তখন আমার চোখ জুড়োবে।'[১৪] এই বাসনায় বিদ্যাশিক্ষার প্রশ্ন গৌণ, কিন্তু তাঁর বাবার দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু আরেকটু প্রসারিত। 'বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পৈতৃক সম্মান বংশ প্রতিষ্ঠাকে তুমি ফিরাইয়া আনিবে। বহু কীর্তি করিবে।........ ব্যবসা করিয়া অর্থ প্রচুর হয়, কিন্তু তাহার মূল্য তত নয়—যত মূল্য বিদ্যাবলে উপার্জন করা অর্থের। আমার বাবার পাট তোমাকে

বজায় রাখিতে হইবে।' তাঁর ডায়েরিতে লেখা এই আকুতিটুকুর মধ্যে একটা কোন বিশেষ সাংসারিক লক্ষ্য ছিল না, কিন্তু উপলক্ষ-মাত্র হয়ে দাঁড়ালো একটা 'শালের সামলা'কে কেন্দ্র করে। সেজন্য তারপরেই তিনি লিখেছেন, 'তুমি উকীল হইবে। আমার বাবা জীবনে শখ করিয়া শালের সামলা কিনিয়াছিলেন। ঐ সামলা আমি সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছি—ওই সামলা তোমাকে পরিতে হইবে। এখানকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইবে।'[১৬] লাভপুরের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তিনি হয়েছেন তবে কাছারিতে বসে বা সামলা গায়ে দিয়ে নয়, ভিন্নতর পথে, যে পথের আলোর সন্ধান দিয়েছিলেন তাঁর মহিয়সী জননী।

পারিবারিক প্রভাবের পরেই বলব তাঁর গ্রামের কথা, লাভপুরের তদানীন্তন সামাজিক পরিবেশের কথা। তারাশঙ্করের সামাজিক চেতনার কথা আলোচনা করতে গেলে তাঁর গ্রামীণ পরিবেশের কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা দরকার। তারাশঙ্কর আমাদের সাহিত্যের প্রধানতম স্থানিক লেখক—পার্ল বাকের অর্থে নয়, ফকনারের অর্থে। অর্থাৎ বিভিন্ন স্থানের আঞ্চলিকতাকে তিনি সাহিত্যে রূপায়িত করতে চাননি, ফকনারের মতো তিনিও তাঁর সাহিত্যের ভূগোলকে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে মূলত ধরতে চেয়েছেন। নাগরিক জীবনের অধিবাসী হিসেবে এবং পাঠকের চাহিদা এবং আনুষঙ্গিক কারণে তিনি পরবর্তীকালে তাঁর সাহিত্যের পটভূমি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত করলেও মূলত তিনি রাঢ় অঞ্চলের গ্রাম্যজীবনের নিপুণ কথাকার। ভাগলপুর 'শ্রীকান্তে'র উপর কিঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করলেও কিংবা 'শ্রীকান্ত' 'পথের দাবী' 'চরিত্রহীন' ও 'ছবি'র উপর ব্রহ্মদেশের অভিজ্ঞতার বাস্তব স্পর্শ থাকলেও শরৎ-সাহিত্যের কোন ভৌগোলিক রূপ নেই। তাল-সোনাপুর বা কুঁয়াপুর, মামুদপুর বা গঙ্গামাটি কয়েকটি বিক্ষিপ্ত নাম মাত্র—সেগুলো পশ্চিম বাংলার যে-কোনো একটি গ্রাম হতে পারে।

আসলে. শরৎচন্দ্রের মেজাজে স্থানিক সচেতনতা একেবারেই নেই। স্থান বলতে 'পশ্চিম' শব্দটি তিনি প্রায় পৌনঃপুনিক ব্যবহারে একঘেয়ে করে তুলেছেন, যার সংজ্ঞা পশ্চিমবাংলার প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে শুরু করে সুদূর আগ্রা পর্যন্ত। কলকাতা তাঁর রচনায় কয়েকবার এসেছে কিন্তু সেখানে মহানগরীর কোন সুস্পষ্ট ছবি নেই ; শেষের দিকের রচনায় 'শেষপ্রশ্ন' এবং 'পথের দাবী'তে পাত্রপাত্রীকে বাংলার বাইরে সংস্থাপিত করেছেন বটে, কিন্তু সেখানে আগ্রা বা বার্মার যেন কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে, বিশেষত নারীচরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় বাঙ্গালীয়ানার জন্য মনে হয় তাঁর সাহিত্য-পরিবেশ বাংলাদেশ, অন্য কোন কারণে নয়। তবে তারাশঙ্কর এবং শরৎচন্দ্র একটি ব্যাপারে সাদৃশ্য রেখেছেন—উভয়ের রচনাতেই পূর্ব এবং উত্তর বাংলা লক্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিত। কিন্তু তারাশঙ্কর শরৎচন্দ্রের মতো ভূগোলনিরপেক্ষ নন, তিনি চরিত্র ও ঘটনাসংস্থাপনের ক্ষেত্রে পরিবেশের দাবীকে প্রথমেই স্বীকার করে নেন। এবং এই পরিবেশ তাঁকে সারাজীবন এমন আবিষ্ট করে রেখেছে যে তাঁর মুখ্য রচনাগুলির ভৌগোলিক গণ্ডী পাঠকেরা সহজেই চিনে নিতে পারেন। 'আরোগ্যনিকেতন' উপন্যাসে যে বিষয়বস্তুকে তিনি রূপ দিয়েছেন, সেই উপজীব্যের ক্ষেত্রে ঐ পটভূমি অনিবার্য ছিল না। তাঁর বহু শ্রেষ্ঠ গল্প এবং গৌণ রচনায় তিনি নিজের পরিচিত পরিবেশকে সম্প্রসারিত করতে যাননি, পরিণত বয়সে চরিত্রচিত্রণের বাসনায় তিনি স্মৃতির সমুদ্র মন্থন করে যাদের এনে হাজির করেছেন, দীর্ঘজীবন পরিক্রমান্তেও যারা তাঁর মনের মণি-কোঠায় সযত্নে অবস্থান করেছে সেই শশীশেখর, কুলদা ঠাকুরদা, যতীন কাকা, বিলিতি মাষ্টার বা অভিনেতা রতনবাবু—সকলেই একই পরিবেশের ফসল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র বা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও উল্লেখ্য স্থানিক সাহিত্যের স্রষ্টা কিন্তু এঁরা কেউই তারাশঙ্করের

মতো নিজস্ব ভূগোলের সীমানায় আজীবন অক্লান্তভাবে বিচরণ করতে উল্লাসবোধ করেননি; 'পদ্মানদীর মাঝি'র স্রষ্টা 'সহরতলী'র পরিবেশে 'স্বাধীনতার স্বাদ' বুঝতে চেয়েছেন, 'পথের পাঁচালী'কার লবটুলিয়ার অরণ্যে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রে এক আশ্চর্য অতিপ্রাকৃতিক নৈসর্গিক আবহাওয়ায় প্রকৃতি, মানুষ এবং মনুষ্যেতর প্রাণীর ঐক্যসূত্র গড়ে তুলেছেন; শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র ও নারায়ণ যথাক্রমে বীরভূম-বর্ধমানের কয়লাখনি-অধ্যুষিত শিল্পাঞ্চল, নদীমাতৃক বাংলাদেশ এবং প্রাকৃতিক মহিমায় মহিমময়ী উত্তরবাংলা ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়বস্তু ও পরিবেশের উপর বহু উল্লেখ্য গল্প-উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন। পরিমাণবাহুল্যের দিক থেকে উল্লেখ্য অবদান না রেখেও 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এর লেখক সতীনাথ ভাদুড়ী 'জাগরী'র মতো সাড়া-জাগানো উপন্যাস রচনা করতে পেরেছিলেন। তাই, তারাশঙ্করের সাহিত্য আলোচনার প্রসঙ্গে তাঁর শৈশবকালীন গ্রামীণ পরিবেশের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যা তার শিল্পিসত্তাকে চিরকাল প্রেরণা দিয়েছে।

জন্মস্থান লাভপুর তারাশঙ্করকে সর্বদাই বিস্মিত করেছে। তার কারণ, সেখানে কালের লীলা, কালান্তরের রূপমহিমা আশ্চর্য রকমের সুস্পষ্টতা লাভ করেছে। সে গ্রামে জন্মে তিনি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করেন। লাভপুরের তদানীন্তন পরিবেশ ছিল, অনেকটা সামন্ততান্ত্রিক, সমাজের নেতৃত্বের শাসন নিয়ে বিচিত্র বিরোধ সমাজ-জীবনের নানা স্তরে বিস্তৃত ছিল। কীর্তির প্রতিযোগিতা চলছে মহাসমারোহের প্রকাশের মধ্যে, দ্বন্দ্ব চলছে সৌজন্য প্রকাশ নিয়ে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে রাজভক্তি নিয়ে, প্রতিযোগিতা চলছে জ্ঞানমার্গের অধিকার নিয়ে, আবার পরস্পরের মধ্যে কলঙ্ককালি ছিটানো নিয়েও চলছে জমিদার ও ব্যবসায়ীর মধ্যে উৎকট রেষারেষি।

এর পাশাপাশি চলেছিল অর্থনীতি, শিক্ষা ও ধর্মের ব্যাপারে ভাঙা-

গড়ার লীলা। সমাজের যে-সব মানুষের তখন স্বল্প আয়, কৃষিক্ষেত্র নিয়ে স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা চালিয়ে আসছিলেন, তাঁরা অকস্মাৎ সম্মুখীন হলেন এক অভিনব সভ্যতার, যার ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপে আরম্ভ হয়ে গেল এক অর্থনৈতিক বিপ্লব। তজ্জনিত বিপর্যয়ের দুঃখও শুরু হয়েছিল। বাইরের যে জগৎ গ্রামের অর্থ টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, সেখান থেকে সেই অর্থ উপার্জন করে ফিরিয়ে নিয়ে এসে দুঃখ থেকে পরিত্রাণের পথ অনুসন্ধান করার শিক্ষা ও সাহস কোনোটাই স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে ছিল না। সে আমলে সুখীর অন্যতম সংজ্ঞাই ছিল অপ্রবাসী। শিক্ষাক্ষেত্রে যখন নতুন এক সুস্পষ্ট পরিবর্তনের আভাস সুচিত হয়েছিল, তখন যাঁরা ইংরিজী জানতেন না, তাঁদের সামনে বহির্জগতের পথ ছিল অবরুদ্ধ, তাঁদেরও ছিল তাই ধারণা। অথচ সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে তাঁরা ছিলেন যোগ্য ব্যক্তিত্বময় পুরুষ। এই সব বিচিত্র অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে তখন সব মানুষই যেন দৈব বিশ্বাসকে অবলম্বন করে বেঁচেছিলেন, বিশ্বাস ছিল না নিজের উপর, ভরসা ছিল না রাজশক্তির উপর, ঈশ্বরই তখন তাদের একমাত্র পরিত্রাতা। ধর্মের অবস্থা তখন বিকৃত। এইকালের ধর্মের বিকৃত অবস্থাটা ঐতিহাসিক সত্য। তাই অসহায় মানুষ ক্ষুদ্রতম দুঃখের জন্য দেবতাকে মানত করেছে—মানত করেছে বা করতে চেয়েছে তার সব কিছু। তারাশঙ্করের পিসীমা তাঁর ডান হাতখানি এক বছরের জন্য মানত রেখেছিলেন। 'এমনি ভাবে এককালের নগর ভেঙে পড়ল জীর্ণ হয়ে, তার চারিপাশের উপবনগুলি সংস্কারাভাবে হয়ে উঠল অরণ্য, সেই অরণ্য শিকড় গজিয়ে ফাটিয়ে ফেলল নগরীর বসতি, দেওয়ালের সেই ফাটলে ফাটলে উড়ে এসে পড়ল গাছের বীজ, প্রাসাদের বসতির মাথায় জন্মাল বনস্পতি—তারই মধ্যে যে মানুষের দল বাস করছিল, তাদের চোখে একদা প্রখরতম আলো ফেলে এগিয়ে এল নূতন কাল তখন চোখ তাদের ধেঁধে গেল। উপায়ান্তরহীন হয়ে তারা পশ্চাদপসরণ করে লুকোতে চাইলে এই ভাঙা নগরীর গহনতম

প্রদেশে। ওইখানেই তাদের বাঁচবার আশ্বাস'[১৬]। এমনিভাবে, সেদিন মানুষ যে-কোনো একটা ধর্মবিশ্বাসকে অবলম্বন করে বাঁচতে চেয়েছিল।

পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাবের পর তারাশঙ্করকে সমকালীন যুগধর্ম প্রভাবিত করেছে। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে মহাকাল নতুন যুগে বেশ পরিবর্তন করে, রূপান্তর গ্রহণ করে, নতুন দৃষ্টি, উপলব্ধি ও ভাবধারা নিয়ে এসেছিল। মাণিকতলা বোমার মামলা, দিল্লীর রাজসূয় যজ্ঞের শোভাযাত্রায় বোমা, বিলিতি বস্ত্রে আগুন দেওয়া প্রভৃতি ঘটনার ঢেউ মহানগরীর কেন্দ্র থেকে সর্বত্র প্রসারিত হয়েছিল। রামপুরহাটে তুকড়িবালা দেবী পিস্তলসহ গ্রেপ্তার হয়ে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিতে দিতে পুলিশের সঙ্গে চলে গিয়েছিলেন, লাভপুরের স্কুলের থার্ড মাষ্টার প্রদীপ্ত-তরুণ দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বহ্নিকুণ্ডে সমিধ দানের মতো বিলিতি বস্ত্রের বহ্নুৎসবের আয়োজন করেছেন, নিত্যগোপাল বাবু শারদীয় পুণ্যলগ্নে কবিতা লিখেছিলেন 'দেবাসুর সংগ্রামের এই তো সময়', আবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছিল প্রবল প্রতিক্রিয়া। থিয়েটারের ড্রপসিন থেকে, গ্রন্থাগারের রবার স্ট্যাম্প থেকে 'বন্দেমাতরম্' শব্দটি মুছে দেওয়া হয়েছিল। তার কারণ স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী নির্মলশিব বন্দোপাধ্যায় এবং তাঁর পরিবারের অন্যান্যরা জেলা শাসকদের সহযোগিতা করে রাজভক্ত বলে পরিচিত হতে চেয়েছিলেন। তবে পুলিশ বিভাগে চাকরি নিয়ে নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় দেশপ্রেমমূলক কবিতা লেখা বন্ধ করলেও মহাকালের নব আবির্ভাবের প্রভাব কোন প্ররোচনাতেই রুদ্ধ হয়নি।

এই বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে তারাশঙ্করের জীবন শুরু হয়। তিনি স্থানীয় পাঠশালায় ভর্তি হননি। পাঠশালার পরিবেশ সম্পর্কে বলেছেন, 'শরৎচন্দ্রের দেবদাসে পাঠশালার চিত্রটুকু নিখুঁত। জীবনে পার্বতী কদাচিৎ সত্য কিন্তু হুঁকো কল্কে প্রায় সার্বজনীন সত্য'।[১৭] তিনি একবারেই স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। সেখানকার বিচিত্র চরিত্রের

শিক্ষকমণ্ডলী এবং বিভিন্ন নেশায় আসক্ত সতীর্থদের স্মৃতিচারণায় তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন আত্মচরিতমূলক রচনাগুলোর পাতায়। পরবর্তীকালে টাইপ-চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর দক্ষতা এসেছে অনেকক্ষেত্রে তাদেরই জীবনের উপর একটু রংয়ের প্রলেপ দিয়ে।

বিদ্যালয়ের জীবনেই রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী' এবং 'কণিকা'র সুর তাঁর কানে বেজেছিল, একটি ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে জীবনে প্রথম বিদ্রোহের উপলব্ধি ঘটেছে, এবং একটি অত্যন্ত আকস্মিক ঘটনাকে কেন্দ্র করেই বিবাহ করেছেন স্থানীয় ধনী প্রতিবেশীর বালিকা-কন্যাকে। উভয় পরিবারের তীব্র মনোমালিন্যের জন্য তাঁর বিবাহিত জীবনের প্রথম কয়েকটি বছর অত্যন্ত বিরক্তিকর তিক্ততায় পর্যবসিত হওয়ার ফলে তিনি দাম্পত্যপ্রেমের অমৃতনিঃস্যন্দী স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। তাই তাঁর সাহিত্যে দাম্পত্য-জীবনের মধুর চিত্রণের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, 'আমার সাহিত্যে নবদম্পতির বা তরুণ-তরুণীর রাগ-অনুরাগ বিরহ-মিলনের কথা ও চিত্রের অভাব আছে। বাইরে থেকে এ অভিযোগ আছে এবং এ অভিযোগ সত্য বলেই আমি স্বীকার করি। তার কারণ আমার প্রথম যৌবনে পিসীমার সঙ্গে ওই দ্বন্দ্ব (বাবার মৃত্যুর পরে পিসীমাই ছিলেন তাঁদের পরিবারের মূল অভিভাবিকা)। এই দ্বন্দ্ব এমনি উত্তপ্ত এবং কঠোর হয়ে উঠল যে, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার জীবনের সম্পর্কের সকল মাধুর্য ও সরসতা প্রায় ঝলসে গেল, কঠিন হয়ে গেল। জীবনের প্রথমে তরুণ-তরুণীর যে মধুর দিবা-বিভাবরী আসে, সে এল না। বা আসেনি বললেই ঠিক বলা হবে'[১৮]। শুধু দাম্পত্য চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রেই নয়, সামগ্রিকভাবে তাঁর সাহিত্যজীবনের ক্ষেত্রে এই বিবাহ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাঁর দৃঢ় ধারণা, 'কৈশোরে বিবাহ না হলে আমার জীবনে আমি সাহিত্যিক খুব সম্ভব হতাম না, জীবনের প্রবাহ রাজনৈতিক খাতেই নিঃশেষিত হত। বন্দী জীবনে পড়াশুনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের

পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হতাম এবং আজকের এই প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের দিনে ভোটপ্রার্থী হয়ে জোরালো বক্তৃতা করে বেড়াতাম। বিধানসভায় বা লোকসভায় আমার কণ্ঠস্বর শোনা যেত'[১৯]। কিন্তু তা না যাওয়ার কারণ, তাঁদের 'বাল্যজীবনেই এক খাঁচাতে দুটি পাখী পোষার শখের মতো শখে দুজনকে বেঁধে' দেওয়া হয়েছিল।

ছাত্রাবস্থাতেই তিনি মায়ের সঙ্গে মাতুলালয় পাটনায় যান। সেখানে নবাবী আমলের প্রমোদকানন কঙ্করবাগের স্মৃতি এবং সাহিত্য ও রাজনীতি-প্রভাবিত নতুন যুগধর্মে দীক্ষিত মাতুল পরিবারের সান্নিধ্য তাঁকে মুগ্ধ ও আবিষ্ট করে।

পাটনা থেকে ফিরে এসে একদা এক অপরাহ্নে দ্বিজপদ ('কবি' উপন্যাসের বিপ্রপদ) ও বৈদ্যনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুতার সূত্রে নিয়মিত বৈকালিক ভ্রমণকালে তাঁর জীবনে এক দুর্ঘটনা ঘটে। ম্যাকলাউড কোম্পানির ছোট লাইনের সৌন্দর্য তাঁকে চিরদিন গভীরভাবে আকর্ষণ করে (এই লাইনটি কবি উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে)। এই লাইনের উপর দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে হেঁটে যাওয়ার সময় এক উৎকট ছেলেমানুষির নেশায় তিনি গুরুতর আহত হন। ঐ সূত্রে তাঁদের দুই পরিবারের মনোমালিন্যের কিঞ্চিৎ অবসান ঘটে এবং শ্বশুরালয় থেকে তাঁর স্ত্রী তাঁদের পরিবারে ফিরে আসেন।

অতঃপর তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং বহরমপুর কলেজে পড়ার সূত্রে গ্রাম ছেড়ে জীবনে প্রথন একক স্বাধীনভাবে যাত্রা। কিন্তু সেখানে সুবিধা না হওয়ায় কলকাতা অভিমুখে রওনা হলেন। তাঁকে নাকি তখন মহানগরী 'হাতছানি' দিয়ে ডাকছিল।

মহানগরীতে জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূত্রপাত হল। মেসো-মশায় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ বিরাট একান্নবর্তী পরিবারে তিনি প্রবেশ করলেন একজন অতিথি হিসেবে এবং সকলের প্রসন্ন উদারতায় সাদরে গৃহীত হলেন এবং বঙ্গবাসী কলেজে জায়গা

না পেয়ে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হলেন। অনাথ, সুশীল প্রভৃতি কতিপয় বন্ধু ও সহপাঠীর সান্নিধ্যে শুধু কাব্যচর্চাই শুরু হয়নি, স্বদেশীমন্ত্রেও গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হচ্ছিলেন। লাভপুরে থাকতেই স্বামীজির রচনার সঙ্গে পরিচিত হলেও পুনরধ্যয়নে আগ্রহী হলেন, পাঠ্যতালিকার পুরোভাগে দেখা গেল সখারাম গণেশ দেউস্করের রচনা। জনৈক রহস্যময় দাদার মন্ত্র তাঁর কানে বাজছে : 'এখন দেশের ভাবনা ছাড়া আর কিছু না। দেশকে স্বাধীন করতে হবে।'[২০] ঐ কথাগুলি শোনা অবধি উপলব্ধির মুহূর্ত থেকে তাঁর সমগ্র দেহে-মনে একটা শুদ্ধির তপস্যা শুরু হয়ে গিয়েছিল। তারপর, প্রথম পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে জনৈক সি. আই. ডি. অফিসারের কাছে আবেগদীপ্ত তারাশঙ্কর অসতর্কভাবে স্বাদেশিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ বিদ্রোহী মনকে তুলে ধরেন। পরিণতিতে পড়া ছেড়ে বাড়ীতে আবদ্ধ থাকতে হল। ঘরে বসে বন্ধনমুক্তির স্বপ্ন দেখতে দেখতে তিনি কৈশোর পার হয়ে যৌবনে উপনীত হলেন। এমন সময় শুনলেন জালিয়ানওয়ালাবাগের ধ্বনি, অহিংসার পথে গান্ধীজির উদাত্ত আহ্বান। সেই পথেই শুরু হল জীবনের তৃতীয় পর্ব।

এই পর্বে আমরা লক্ষ্য করি তাঁর লক্ষ্যহীন ব্যক্তি-জীবনের সংশয়কাল থেকে যেন এক সেতু পার হয়ে সাহিত্যজীবনের তোরণদ্বারে এসে ক্রমশ উপনীত হচ্ছেন। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ তারাশঙ্করের জীবনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কাল, বহির্জগতের দেশসেবা ও রাজনীতিচর্চা থেকে মনোজগতের একটা স্থির অচঞ্চল আদর্শের দিকে ক্রম-উত্তরণের কাল। মহামারীতে সেবা করা, সমাজের সর্বত্র এবং সকলের কাছে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করে দেওয়া, নানা কারণে স্থানীয় অন্ত্যজ শ্রেণীদের মধ্যে নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে বেড়ানো, সর্বোপরি রাজনীতির সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট হওয়া তখন তাঁর লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবনের কয়েকটি প্রধান আগ্রহের সূচক।

পুনরায় কারাবাস এবং ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কারাগারে থেকে তদানীন্তন রাজনৈতিক আন্দোলনের কদর্য দলাদলিতে ব্যথিত হয়ে তিনি ঐ সংস্রব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চান এবং এই স্বেচ্ছানির্বাসনের ফলে তাঁর জীবনে আসে এক ভিন্নতর প্রেরণা, সাহিত্যসৃষ্টির স্থির প্রত্যয়। পরবর্তী জীবনে রাজনীতি ও সাহিত্য তাঁর জীবনে পাশাপাশি দুইটি ধারার মতো প্রবাহিত হয়েছে, যদিও সাহিত্যের প্লাবনে রাজনীতির ক্ষীণ স্রোত মাঝে মাঝে তার অস্তিত্ব হারিয়ে লুপ্ত হয়ে পড়েছে।

জীবনের তৃতীয় পর্বে তিনি রাজনীতিচর্চা করতে গিয়ে সমাজের মধ্যে গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছেন। ধানচালের হিসেব করে বা কয়লাখনিতে কাজ করে ভাগ্য ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তিনি মোটেই সচেষ্ট হননি। তার চেয়ে দেশসেবার কাজই তাঁর কাছে আদরণীয় মনে হল। কংগ্রেসের আদর্শে খানিকটা গঠনমূলক কাজ হলেও কংগ্রেসের কাজ নয় বলেই তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হলেন। গ্রামান্তরে বিভিন্ন মেলায় বা যত্রতত্র ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়ানোই যেন তাঁর কাজ হয়ে দাঁড়াল। আগুন, ঝড় এবং কলেরার উপদ্রব থেকে বাঁচানোর জন্য ইতিমধ্যেই তিনি সেবাধর্মে নিযুক্ত হয়েছিলেন, তৎসহ নতুন ভাবে যুক্ত হল বিরোধ নিষ্পত্তি করা, মানুষের উপকার করা এবং উদ্দেশ্যহীন পরিক্রমার ফলে সমাজের নিচু স্তরের মানুষের হৃদয়ের আত্মীয়তালাভ। ইতিমধ্যেই 'কল্লোল' ও 'কালিকলমে' তাঁর সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত হয়েছিল, তবু তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে প্রায় এক বছর কারাগারে রইলেন, যার কথা আগেই উল্লেখ করেছি।

জেলখানা থেকে বেরিয়ে শুরু হল তাঁর জীবনের নতুন অধ্যায়, চতুর্থ পর্ব। সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে কেন্দ্র করে প্রাদেশিক কংগ্রেস-নির্বাচনে জটিল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল, এর ঢেউ বীরভূমেও পৌঁছল। সেখানে নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক

সুচতুর এবং তথাকথিত দেশপ্রেমিক ব্যক্তি সুভাষচন্দ্রের পক্ষে কাজ করলেও তিনি অন্যায়ভাবে অনেকগুলি অসত্য ঘটনায় তারাশঙ্করের নাম জড়িয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রের প্রবল ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়িয়ে, কখন লনে পায়চারি করতে করতে, তিনি নরেনবাবুর অসাধুতার বিবরণ ব্যক্ত করলেন। তাঁর সব কথা সুভাষচন্দ্র অকপটে বিশ্বাস করে দুঃখ ও লজ্জা প্রকাশ করলে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন। মনে-মনে সুভাষচন্দ্রের কাছে প্রায় আত্মসমর্পণ করেছিলেন। প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণী' তাঁকেই উৎসর্গ করেন।

বৈষয়িক জীবন থেকে মুক্তি নেবার জন্য ছোটভাইকে সব ভার অর্পণ করে বোলপুরে একটি ছাপাখানা করলেন। আকাঙ্ক্ষা ছিল—একখানা সাপ্তাহিক কাগজ বের করার। নীলাম-ইশ্‌তাহার-সর্বস্ব নয়, রীতিমত দেশপ্রেম-প্রচার-পত্রিকা। প্রচণ্ড আর্থিক অনটনের ফলে বাড়ির বধূদের কিছু অলঙ্কার বিক্রী করা হল এবং সেই টাকার সাহায্যে সাবিত্রীপসন্ন চট্টোপাধ্যায় তাঁকে প্রেস ও সরঞ্জামপাতি কিনে দিলেন।

বোলপুরে প্রেস হল। মাঝে মাঝে জগদীশ গুপ্ত আসতেন সেখানে। বীরভূমের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তখন গুরুসদয় দত্ত। রায়বেঁশে নৃত্যে সারা বীরভূমকে মাতিয়ে তুলেছেন, তাছাড়া যেখানে যত প্রাচীন মূর্তি, পট, দারুশিল্প পেয়েছিলেন সব কিছু তিনি সংগ্রহ করে এনেছিলেন। তাঁর অসহিষ্ণুতায় ও ঔদ্ধত্যে উত্যক্ত হয়ে তদানীন্তন রায়পুরের কংগ্রেসকর্মী ব্যোমকেশ চক্রবর্তী বা চট্টোপাধ্যায় তারাশঙ্করের অবর্তমানে তারই প্রেস থেকে একটি ব্যঙ্গ কবিতা ছাপিয়ে নিয়ে সমগ্র জেলায় ছড়িয়ে দিলেন। নির্বুদ্ধিতার ফলে সেই ছাপা কাগজটিতে প্রেসের নাম ছাপা হয়ে গিয়েছিল। দোষ অস্বীকার করলেও নোটিশ এল কয়েকদিন পরেই দু হাজার টাকা জামানত দিতে হবে। এমন সময়ে সংকট-ত্রাণ-সমিতিকে কেন্দ্র করে একটি অপ্রিয় সমালোচনার সূত্রে সুভাষচন্দ্র শান্তিনিকেতনে

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যান। বোলপুরে প্লাটফর্মে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আলাপের সূত্রে ছাপাখানার কথা এবং তাঁর প্রতি অবিচারের কথা তারাশঙ্কর জানান। 'তাঁর আশ্চর্য্য শুভ্র চোখ দুটি দপ করে জ্বলে উঠল। সে সত্যিই জ্বলে ওঠা। এমনভাবে চোখ জ্বলে ওঠা আমি আর কারো দেখিনি। তার ছটা আমার চোখে লাগল। উত্তাপ আমি অনুভব করলাম। বললেন, না। বন্ধ করে দিন। বণ্ডও দেবেন না, জামিনও দেবেন না।'[২১] অতএব স্থির হয়ে গেল পথ এবং প্রেস বন্ধ করে গোরুর গাড়িতে করে সব যন্ত্রপাতি লাভপুরে এনে ফেললেন।

এমন সময়, তাঁর প্রিয়তমা কন্যা বুলুর মৃত্যু হল, শোকে তিনি প্রায় উন্মাদের মতো হয়ে গেলেন, জীবনের সমস্ত অর্থ যেন তাঁর কাছে হারিয়ে গেল। তার উপর সংসারে প্রচণ্ড আর্থিক সঙ্কট তো ছিল-ই।

এর কিছুদিন পরে, শোকের তীব্রতা কমে এলে, শ্রীনিকেতনের উদ্যোগে শান্তিনিকেতনে পল্লীকর্মী সম্মেলনে উপস্থিত থাকার সুযোগে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়। প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীতজ্ঞ শান্তিদেব ঘোষের বাবা কালীমোহনবাবু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। পল্লীর পুনর্গঠনের গুরুত্ব বুঝিয়ে কবি তাঁকে এবং অন্যান্য সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বলেন, গ্রামকে গড়ে তোল। নইলে ভারতবর্ষ বাঁচবে না।

এ-প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর জানিয়েছেন, 'মহাকবির উপদেশ কালে পরিণত করব বলেই ঠিক করেছিলাম সেদিন; রাজনীতির পথে নয়, সেবার পথে। কিন্তু তাও পারলাম্ না। তখন যেন আমার জীবন কোন কিছুতেই বাধা পড়তে চাইছিল না।'[২২] কারণ, বুলুর মৃত্যুতে গভীর শোক, রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে সংশয়াচ্ছন্নতা এবং সাহিত্যসৃষ্টির দুর্নিবার আকর্ষণ।

এরই মধ্যে তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু হয়ে গিয়েছিল, তৎসহ প্রচণ্ড

আর্থিক সঙ্কট। ঐ সঙ্কটের ফলেই কিছুদিনের জন্য তিনি সাহিত্য-সাধনা স্থগিত রেখেছিলেন, অশান্ত মনকে শান্ত করতে একলা কাঁধে বোঁচকা বেঁধে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। মাঘী শ্রীপঞ্চমীর পর দিন শীতলাষষ্ঠীতে লাভপুর থেকে পনের মাইল দূরে দৈধা বৈরাগীতলায় বৈষ্ণব সাধক গোপালদাস বাবাজীর আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে মেলায় গিয়ে তিনি পৌঁছলেন। মেলায় দুদিন ছিলেন। তাছাড়া বুলুর স্মৃতি তাঁকে তখন পরলোক রহস্যের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছিল, তাই তিনি অনেক সময় নির্জনে শ্মশানে গিয়ে বসে থাকতেন।

১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে বীরভূমের রাজনৈতিক কর্মীদের জীবনে মহাদুর্যোগের কাল ঘনিয়ে এল। কারণ মহাধুরন্ধর সামসুদ্দোহা তখন ওখানকার পুলিশসাহেব। তাঁরই চক্রান্তে তারাশঙ্করকে বীরভূম ছেড়ে কলকাতায় এসে উঠতে হল। ঘর ভাড়া পাঁচ টাকা, লাইট চার্জ এক টাকা, চা জল খাবার সাত-আট টাকা, খাবার খরচ আট টাকা মাসে তিরিশ টাকা। কিন্তু লিখে তিরিশ টাকা উপার্জনের কথা দোহা সাহেব বিশ্বাস করবেন না। অতএব 'শনিবারের চিঠি'তে সহকারী সম্পাদক হিসেবে তাঁর নাম ছাপা হতে লাগল এবং তিনি মাইনে না নিলেও ঐ পত্রিকার মাইনের খাতায় তাঁর নাম তুলে তিরিশ টাকা হিসেবে খরচ লেখা হত। তিনি তখন মনোহরপুকুর সেকেণ্ড লেনে একখানি পাকা দেওয়াল টিনের ছাউনি ঘর ভাড়া করে থাকতেন এবং প্রায় দেড় বছর কাটিয়েছিলেন। এইসময় তিনি অসংখ্য উৎকৃষ্ট গল্প লেখেন। মাঝে একবার বিহার ফায়ার ব্রিক্‌স কারখানায় পিসতুতো ভাইয়ের বাসায় গিয়ে (বিহারের মগমা নামক স্থানে) 'আগুনে'র খসড়া তৈরী করেছিলেন।

মনোহরপুকুরের সেই ঘরটি ছেড়ে অতঃপর তিনি মধ্য কলকাতায় বৌবাজারে একটি মেসে ওঠেন। সেখান থেকে কিছুদিন বাদে হ্যারিসন রোডের 'শান্তিভবন' বোর্ডিং-এ। সাহিত্যিক হিসেবে ইতিমধ্যেই তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এমন সময় তাঁর

জীবনে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলো। প্রথম সাক্ষাতের সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'রাইকমল' সম্পর্কে প্রশংসা করে বলেছিলেন, তিনি নাকি শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে ঐ বইটির নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চে অভিনয় করে দেখতে পরামর্শ দিয়েছেন। তাছাড়া, অবিলম্বে শিশিরকুমারের সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি তারাশঙ্করকে নির্দেশ দিলেন। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সহায়তায় তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে শিশিরকুমার জানান 'রাইকমল' কিনে ইতিমধ্যেই তিনি পড়ে নিয়েছেন, 'ভালো জিনিস—বাংলার মাটির খাঁটি জিনিস', এবং তাড়াতাড়ি বইটির নাট্যরূপ দিয়ে শিশিরকুমারকে দিয়ে আসতে বলেন। নাট্যরূপ দেওয়া শুরু হলে তিনি জানতে পারেন, শিশিরকুমার ষ্টার রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে দিয়েছেন এবং হয়তো আর রঙ্গালয়ের সংস্রবেই আসবেন না।

শান্তিভবন বোর্ডিং ছেড়ে তিনি এসে উঠেছিলেন মোহনবাগান রো-য়ে এবং সেখান থেকে কয়েকমাস পরে আনন্দ চ্যাটার্জী লেনে। সেখান থেকে উঠে গেলেন আরো উত্তরে, বরানগরে, কাশীনাথ দত্ত রোডে ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। কলকাতায় বাস একরকম পাকা হয়ে গেল। 'ভারতবর্ষে' তখন ধারাবাহিকভাবে চলছে 'গণদেবতা,' পাটনার 'প্রভাতী'তে শুরু হয়েছে 'কবি'। এই সময় 'কালিন্দী'র নাট্যরূপ দিলেন তিনি এবং 'নাট্যনিকেতন' মঞ্চে সাতাশ দিন চলবার পর ঐ প্রতিষ্ঠানটিই উঠে গেল। তারপর 'নাট্য-ভারতী'তে তাঁর 'দুই পুরুষ' নাটকটি অভিনীত হওয়ায় নাট্যকার হিসেবে তিনি উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন লাভ করেন। তিনি বরানগরের বাড়ি ছেড়ে পুনরায় বাগবাজারের আনন্দ চ্যাটার্জী লেনের বাড়ীতে ফিরে আসেন। এর মধ্যে, ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁর জীবনের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল। নলহাটীতে বীরভূম সাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্য শাখায় তাঁকে সভাপতিত্ব করার জন্য আহ্বান জানালেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐ সম্মেলনে মূল

সভাপতির আসনে ছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত। সেই সভায় শ্রীগুপ্ত তাঁকে 'বঙ্গসরস্বতীর খাসতালুকের মণ্ডল প্রজা'[২৩] বলে অভিনন্দিত করেন।

'দুই পুরুষে'র পরে তাঁর 'পথের ডাক' মঞ্চস্থ হয়েছিল। কিন্তু ভূমিকা বণ্টনের ত্রুটির ফলে নাটকটি ক্রমান্বয়ে মাত্র সাতাশি রাত্রি চলেছিল।

এই সময়ে ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের আহ্বান-ধ্বনি তাঁর অন্তরকে গভীরভাবে বিচলিত করেছিল। তাঁর ঐ সময়কার মনোভাব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে 'গণদেবতা'র শেষের দিকে লেখা কয়েকটি লাইনে, 'দেবু আকাশের দিকে চাহিয়া আত্মহারার মত হাত বাড়াইল, সমস্ত অন্তর পূর্ণ করিয়া সে নীরবে ডাকিল, ভগবান! ....একটা দূরাগত ঢাকের শব্দ কানে আসিয়া ঢুকিল। দেবু সচেতন হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। মহাগ্রামের ঢাকের শব্দ, ন্যায়রত্নের বাড়িতে রথযাত্রা। ঠাকুর বোধ হয় রথে চড়িলেন। রথ হয়তো চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাঁধের পথ ধরিয়া সে দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।' এই সময় অর্থাৎ ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা অ্যান্টিফ্যাসিস্ট রাইটার্স এ্যাণ্ড আর্টিস্টস্ এ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে তাঁর সংস্রব। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে এর প্রতিষ্ঠা, প্রথম সভাপতি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। দ্বিতীয় বছরে সভাপতি অতুলচন্দ্র গুপ্ত। তৃতীয় বছরে তিনি সভাপতি হলেন। কলকাতার বামপন্থী বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও রাজনৈতিক নেতারা ক্রমশ এই প্রতিষ্ঠানটিকে নিজেদের কুক্ষিগত করে নেন। একদা ওখানে সমবেত সভ্যদের একটি ঘরোয়া মজলিসে সুভাষচন্দ্রকে 'কুইসলিং' অ্যাখ্যা দেওয়ায় তিনি প্রতিবাদ জানিয়ে চলে আসেন। পরে কয়েকজন প্রধান ব্যক্তির অনুরোধে তিনি ফিরে যান এবং এ-ধরনের আলোচনা সংঘের নিয়মবিরোধী বলে ঘোষণা করা হয়।

চতুর্থ এবং পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন যথাক্রমে প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। তারাশঙ্কর তখন সংঘের নিয়মিত এবং সর্বাপেক্ষা সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এর স্বীকৃতি পাওয়া যায় ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে তাঁকে লেখা পি. সি. যোশীর একটি চিঠি থেকে:

'Dear Tarasankar Babu,

....It is our personal tribute to the great understanding you have shown of the Bengali people in their distress. We consider you as one of the great sons of Bengal who served her when many betrayed her.

To-day the whole country is suffering from a canker. You saw Bengal suffering in a small but very tragic way during the famine. India as the myrtyrs built it since '27 onwards is going up in flames. In this critical juncture we keep our faith intact in the destiny of our country and her great future by thinking about persons and friends like you who continue to remain true to the great tradition of the past and struggle to do their best for the future. With greetings.'

এর উত্তরে তারাশঙ্কর তাঁকে যে চিঠি দেন তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করলে কম্যুনিস্ট দল, সদস্য এবং তাঁদের সঙ্গে তারাশঙ্করের মতপার্থক্যের চেহারাটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়:

'Dear Mr. Joshi,

My best thanks to you for your very kind letter........ Inspite of my best regards for you, I differ in my outlook from that of yours in some points. As regards your party-policy, I disagree with you in many points. But I admire the sincerity of the workers of your party and your

boldness. I sincerely believe that everybody has the right of doing what he thinks just and right. You have done and are doing what you think right and just. My creed is Ahimsa and Truth. Not to accuse anybody and to love all, is my motto. I remain, I try always to remain, true to my creed and motto of life........'

আস্তিক্যবাদ এবং অহিংসার সঙ্গে বিরোধ না থাকলে সাম্যবাদের মহান আদর্শ সম্পর্কে তারাশঙ্করের মনে কোনো বিরূপতা নেই। 'সাম্যের কল্পনা তো আমাদের দেশে বহু আকাঙ্ক্ষিত এবং ধর্মজীবনের এই উপলব্ধি তো ভারতবর্ষের সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য। অন্নে বস্ত্রে, জলে বায়ুতে, রাষ্ট্রীয় অধিকারে, সামাজিক অধিকারে. মানবিক অধিকারে মানুষের সমান দাবী জানানো বা সেই দাবী প্রতিষ্ঠার অধিকার কোন দেশের বা একটিমাত্র শাস্ত্রের একান্তভাবে নিজস্ব নয়। এঁদের সঙ্গে বিরোধ আমার এখানেই'—এই উক্তি থেকে কম্যুনিস্ট পার্টি-প্রভাবিত এ্যাণ্টিফ্যাসিস্ট রাইটার্স এ্যাণ্ড আর্টিস্টস এ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে তারাশঙ্করের সম্পর্কচ্ছেদের সূত্রটি পাওয়া গেল। এরপর 'মন্বন্তর'-প্রকাশ উপলক্ষে ঐ দল তাঁর প্রতি বিরূপতা প্রশমিত করলেও তারাশঙ্কর কম্যুনিস্ট পার্টি সম্পর্কে নিজের ধারণা পরিবর্তিত করেননি। তিনি ভোলেননি ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাস পর্যন্ত 'সোভিয়েট এনসাইক্লোপিডিয়া'তে লেখা মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর আদর্শ সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবের কথা কিংবা স্ট্যালিন কর্তৃক 'ঐতিহাসিক ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ' গ্রন্থে মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে লেখা একটি উক্তি : 'গান্ধীর মতবাদ আর কৌশল জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টির প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা গ্রহণ করেছে।'

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে ফ্যাসিবিরোধী সাহিত্যিক ও শিল্পী সংঘের নাম পরিবর্তন করে প্রগতি সাহিত্যিক ও শিল্পী সংঘ রাখা হল। মত-পার্থক্যের প্রবলতা সত্ত্বেও তারাশঙ্কর কখনো ঐ সংস্থার সংস্রব

সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করতে পারেননি। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' প্রকাশিত হলে এই সংস্থার অধিকাংশ সদস্য তারাশঙ্করকে আকাশস্পর্শী প্রশংসায় অভিনন্দিত করেন। পরে ঘটনাচক্রে তিনি যখন এই সংস্থার সঙ্গে প্রায় সম্পর্কচ্ছেদ করলেন, তখন বামপন্থী সমালোচকবৃন্দ 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'র নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সভাপতিত্বে হাওড়ায় অনুষ্ঠিত প্রগতি সাহিত্যিক সংঘের অধিবেশনে বলা হয়েছিল, এটা সাহিত্যই নয়, এটা অ্যাডভেঞ্চারাস রোমান্টিসিজিম্ বা রোমান্টিক অ্যাডভেঞ্চারিজম্। যখন কম্যুনিস্ট মহল তাঁর প্রতি প্রচণ্ডভাবে বিরূপ হননি তখন চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে ওখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক প্রতিষ্ঠান 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' অনুবাদ করার প্রস্তাব জানিয়ে পত্র লেখেন কিন্তু এখানে বামপন্থী বন্ধুবর্গ তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হলে কী এক রহস্যময় কারণে চেক পুস্তক প্রতিষ্ঠানটি অনুবাদের প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে নেন।

প্রায় চার দশক ধরে অবিচ্ছিন্নধারায় নিরন্তর সাহিত্যসৃজন করলেও এই সুদীর্ঘ সময়ের ইতিহাস অনুসন্ধান করে দেখা যায় তিনি নৈষ্ঠিক গান্ধীবাদী এবং মার্কসবাদে একান্তভাবেই বিমুখ। কিন্তু জীবন-সায়াহ্নে পৌঁছে সাপ্তাহিক 'অমৃত' (শুক্রবার, ৩রা বৈশাখ, ১৩৭৭) পত্রিকায় 'লেনিন শতবার্ষিকী উপলক্ষে' শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধে তিনি এমন অনেক তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন, যা রীতিমতো বিস্ময়কর। লেনিন সম্পর্কে তাঁর আবেগতপ্ত শ্রদ্ধানিবেদন আমাদের মনে নতুন করে যে প্রশ্নগুলির অবতারণা করে সেগুলির একটু বিশদ আলোচনা করা যাক।

১. তিনি লিখেছেন: 'আমি ভারতবর্ষের মানুষ, আমার সম্মুখে একদা মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও বাণী মানব ভবিষ্যতের কুয়াশাচ্ছন্ন অনিশ্চয়তা ছিন্ন করে একটি স্থির আলোকোজ্জ্বল পথরেখা যেন মনের চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত করে তুলেছিল। এবং সারাজীবনই আমি

আমার জীবনের আচরণের মধ্যে সেই পথ ধরেই চলতে চেয়েছি। কিন্তু তার সঙ্গে আজ মুক্তকণ্ঠে বলছি লেনিনও আছেন। গান্ধীজীর বাণী এসেছিল প্রথম। তারপর এসেছিলেন লেনিন।' আবার ঐ প্রবন্ধেই অন্যত্র বলছেন: 'আজ এই মহান মানব প্রেমিক ও মানবেতিহাসের অসামান্য ও অদ্বিতীয় নেতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সেকালের স্মৃতিকথা স্মরণ করে অকপটেই বলি—১৯১৭ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ জাতীয় জীবনে গান্ধীজির আগমনের পূর্বকাল পর্যন্ত একমাত্র লেনিনই ছিলেন আমার জীবনের নায়ক।' এই পরস্পরবিরোধী অভিমতের মধ্যে কোন্‌টা সত্য? তিনি কী গান্ধীজির কথা দৃঢ়ভাবে স্মরণে রেখে লেনিনকে মানবেতিহাসের 'অদ্বিতীয়' নায়ক আখ্যায় ভূষিত করেছেন?

২. তিনি গান্ধীজির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করে অতঃপর জানিয়েছেন: 'মহান লেনিনের প্রভাবও আমার উপর কম নয়। সত্য বলতে গেলে বলতে হবে—রুশ বিপ্লব এবং মহান লেনিনই সকল মানুষের মুক্তির বার্তা ও পন্থাই আমাকে প্রথম জ্ঞাপন করেছিলেন।........মহাত্মা লেনিনের শ্রেণীহীন সমাজ, সাম্যবাদের মহান অধিকারের কল্পনাসুন্দর শোষণহীন সমাজের ছবিও ঠিক ততখানি আকর্ষণ করেছিল। এবং আজ এই ১৯৭০ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ভারতবর্ষের কম্যুনিজমপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে পন্থা নিয়ে রূঢ় মতবিরোধ সত্ত্বেও মহান লেনিনের প্রতি আমার অনুরক্তি এবং আকর্ষণ বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আমার যত মত-পার্থক্যই থাক, এই আশ্চর্য মানববন্ধুটি আজও আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং আজও তিনি আমার পথপ্রদর্শক।' বাংলাদেশের বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে তারাশঙ্করের মনোমালিন্যের সংবাদ আমাদের অজানা না থাকলেও তিনি তাঁর 'পথপ্রদর্শক' 'আশ্চর্য মানববন্ধু' লেনিনের কথা ইতিপূর্বে কখনো, কোনো প্রসঙ্গে উল্লেখ করেননি কেন?

৩. তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা গান্ধীজি পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সাহিত্যে বারবার আবির্ভূত হয়েছেন। অথচ লেনিনকে তিনি 'পথপ্রদর্শক' বললেন কেন? তার উত্তরে তিনি বলেছেন: 'রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের রুগ্ণ ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠা এবং তারই আংশিক অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত আমাদের ১৯২১ সালের প্রথম গণ-আন্দোলন আমার চিত্তভূমিকে প্রস্তুত করে দিয়েছিল। মনের মধ্যে 'জনার্দন যে পক্ষে জয় সে পক্ষেই'-এর মত নির্যাতিত শোষিত, নিপীড়িত, নিঃস্বের পক্ষে যে সনাতন ন্যায় জাগ্রত ও সেই ন্যায়ের যে চিরসঙ্গী জয় সর্বদা সহচারণ করে সেই বিষয় আমার চিত্ত নিঃসংশয় ছিল। মহাভারতের 'জনার্দন' একালে, রুশ বিপ্লবের পরবর্তীকালে, আমার কাছে শুধু 'জনে'র মূর্তিতেই ধরা দিয়েছিল। তাই আমার সমগ্র চিত্ত সজ্ঞানে এবং আমার অগোচরে সেই সনাতন ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করে সেই নিপীড়িত, নিঃস্ব ও তথাকথিত নিম্নদের পরম শ্রদ্ধায় ও সমাদরে নিজের মধ্যে আবাহন করে নিয়ে এসেছিল।' অতএব, তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য-নির্বাচনের ক্ষেত্রে রুশ বিপ্লবের প্রভাব নিশ্চয়ই কার্যকর হয়েছিল এবং সেদিক থেকে বিচার করলে বিপ্লবের প্রধানতম সৈনিক লেনিনের অনুপ্রেরণা অনস্বীকার্য। কিন্তু তাঁর জীবনীমূলক রচনার পাতায় রুশ-বিপ্লব ও লেনিনের নাম উল্লেখ করেননি কেন? 'নিঃস্ব ও তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা' তাঁর গল্পে আসর পেতে বসার কারণ হিসেবে তিনি রুশ-বিপ্লবের অনিবার্য প্রভাবের কথা উল্লেখ করলেও 'আমার সাহিত্যজীবন ১ম ও ২য় পর্ব' শীর্ষক গ্রন্থে তিনি নীরব থেকেছেন কেন?

এই প্রশ্নগুলির জবাবে আমাদের মনে হয়, গান্ধীজি ও লেনিন—মানব ইতিহাসের এই দুই শ্রেষ্ঠ ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিভেদের দিকে তারাশঙ্করের নজর ছিল না, তিনি উভয়ের অসামান্য মানব-প্রীতিতে মুগ্ধ। গত পাঁচ দশকব্যাপী ভারতবর্ষের রাজনীতিতে গান্ধীজির অসামান্য প্রভাবের ফলে তাঁর অন্যতম অনুরাগী-শিষ্য

তারাশঙ্কর জীবনের বিভিন্ন পর্বে গান্ধীজিকে স্মরণ করেছেন, কিন্তু রুশ-বিপ্লবের প্রধানতম নায়ক লেনিনকে ততটা গুরুত্ব দেননি। সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে উভয়কে একই লক্ষ্যের অভিযাত্রী মনে হয় বটে, কিন্তু লক্ষ্যপূরণের ক্ষেত্রে তাঁরা একই নীতিতে বিশ্বাসী নন। তারাশঙ্কর উভয়কে একই দৃষ্টিতে দেখতে পেরেছেন নিজস্ব মানবপ্রীতির জন্য কিন্তু কোনো সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকলে তিনি উভয়কে একই পংক্তিভুক্ত করতে পারতেন না।

অতঃপর তারাশঙ্করের জীবনের পঞ্চম পর্ব। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দ ও তার পরবর্তীকাল। প্রাক-স্বাধীনতা যুগের সাহিত্যিক-খ্যাতি তাঁকে স্বাধীনতা-উত্তর যুগে এনে দিয়েছে অভূতপূর্ব সামাজিক মর্যাদা—একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে যে মর্যাদা আজ পর্যন্ত ভারতীয় সাহিত্যে কেউ পাননি। তিনি লিখেছেন প্রচুর—প্রথম শ্রেণীর লেখক হিসেবে তাঁর রচনার পরিমাণবাহুল্য রীতিমতো বিস্ময়কর। গুণগত মানদণ্ডে শেষপর্বের রচনায় তাঁর সৃষ্টির উৎকর্ষ মাঝে মাঝে নিঃসন্দেহে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে, তবু কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর গল্প ও উপন্যাসও তিনি এই পর্বে লিখেছেন, প্রসঙ্গান্তরে সেগুলোর বিশ্লেষণ করা হবে।

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রথম শরৎ-স্মৃতি পদক ও ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে জগত্তারিণী পদক দ্বারা সম্মানিত হন। এ ছাড়া তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা 'আরোগ্য নিকেতনে'র জন্য ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার এবং ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে আকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত হন। এই সময়ে তিনি চীন সরকারের আমন্ত্রণে চীন ভ্রমণ করে এসেছিলেন এবং ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনে তাসখন্দে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব করেন। ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে তিনি সোভিয়েত সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়েও শরীরের অজুহাতে সে নিমন্ত্রণটি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

১৯৫৯ এবং ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দে যথাক্রমে মাদ্রাজে সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলনে এবং নাগপুরে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব তাঁর জীবনে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাঙালী লেখকদের মধ্যে তিনিই প্রথম ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁর 'গণদেবতা' উপন্যাসটির জন্য জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভ করেন এবং ১৯৬৮ সালে কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি পান। ঐ সম্মান তিনি ১৯৬৯ সালের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও পেয়েছেন। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর প্রয়াণের পর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর বাসভবনে একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তাঁকে মরণোত্তর ডি. লিট. উপাধি প্রদান করেন। এবং ১৯৬৯ সালেই তিনি সাহিত্য আকাদেমির অনারারি ফেলো মনোনীত হয়েছিলেন।

জীবনের এই পর্বে তিনি প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করলেও কংগ্রেসকে সমর্থন করার ফলে বামপন্থী রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক মহল তাঁর প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। কম্যুনিস্ট দলের সর্বভারতীয় নেতা হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতো ব্যতিক্রম ছিল কিন্তু তা নিতান্তই স্বল্প।

রাজনীতির সঙ্গে তাঁর সংস্রব পরোক্ষভাবে বর্জিত হয়নি। ১৯৫২ থেকে ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে রাজ্যপাল-মনোনীত প্রথম সদস্য হিসেবে তিনি যোগদান করেছিলেন। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি-মনোনীত রাজ্যসভার সদস্যের আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ১৯৬২ এবং ১৯৬৮ সালে তিনি যথাক্রমে পদ্মশ্রী এবং পদ্মভূষণ উপাধিতে বিভূষিত হন। সামাজিক খ্যাতি ও প্রতিপত্তির ফলে গত প্রায় তিন দশকব্যাপী তিনি প্রায় সহস্রাধিক সভায় সভাপতি অথবা প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেছেন। অধিকাংশ ভাষণগুলি পত্র-পত্রিকার পাতাতেই নিবদ্ধ রয়ে গেছে।

গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা (মাত্র একখানি) এবং বাল্যপাঠ্য রচনা ব্যতীত তিনি যে বইগুলি লিখেছেন, তার মধ্যে 'কৈশোর স্মৃতি', 'আমার কালের কথা' ও 'আমার সাহিত্যজীবন' (দুইখণ্ড) তাঁর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যজীবনের স্মৃতিচারণমূলক রচনা, 'বিচিত্র' তাঁর সাহিত্যজীবনের কয়েকটি উপাদানের কথা অবলম্বনে লেখা, 'মস্কোতে কয়েকদিন' রাশিয়া ভ্রমণের সময়কার কিছু অভিজ্ঞতার বর্ণনা, 'ভারতবর্ষ ও চীন' চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের পটভূমিকায় লেখা উভয়দেশের ঐতিহাসিক সম্বন্ধ-সূত্র নির্ণয় এবং চীনের বৈরী-ঐতিহ্যের বিবরণ এবং একমাত্র 'সাহিত্যের সত্য' তাঁর কয়েকটি ভাষণের সঙ্কলন। তারাশঙ্করের জীবনী জানতে হলে তাঁর নিজস্ব রচনা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই ; তাঁর বক্তৃতামালা এখনো সংগৃহীত হয়নি, আধুনিক-কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখকের ভাবনাচিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলোর মূল্য যাই থাকুক না কেন, প্রকাশককুল সে সম্পর্কে অত্যন্ত নিরুৎসাহিত, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় এবং কয়েকটি প্রবন্ধ গ্রন্থে বিক্ষিপ্ত-ভাবে তিনি আলোচিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর সাহিত্যকর্মের মূল্যায়নে এ পর্যন্ত মাত্র একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বইয়ের নাম 'তারাশঙ্কর', লেখক শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র। তাঁর পরলোকগমনের প্রায় দু'বছর পরে 'তারাশঙ্কর বিচিত্রা' নামক বিভিন্ন লেখকের লেখা একটি সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং তাঁর কিছু কিছু রচনা এবং তাঁর সাহিত্যকর্মের উপর আলোচনা ও গ্রন্থপঞ্জীকে সংগ্রথিত করে 'সোনার মলাট তারাশঙ্কর' নামে আর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ১৩৭২ সালের ৮ই শ্রাবণ তিনি আটষট্টি বছর বয়সে পদার্পণ করলে 'শনিবারের চিঠি' একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে, তারাশঙ্কর সম্পর্কিত বিভিন্ন সাহিত্যিক ও সমালোচকের রচনা সঙ্কলিত করে। তার দু'বছর পরে সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তাঁকে মহাজাতি সদনে যে অভিনন্দন জানানো হয়, তার আয়োজন করেন বাংলাদেশের রাজনীতি, সংস্কৃতি সাহিত্য ও শিক্ষাজগতের কৃতীজনেরা। এই উপলক্ষে একটি

স্মারকপত্র প্রকাশিত হয় এবং তাতে অভিনন্দনবাণী পাঠিয়েছিলেন তদানীন্তন ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীসর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, উপরাষ্ট্রপতি শ্রীভি. ভি. গিরি, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর তরফ থেকে তাঁর সচিব, পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীরের তরফ থেকে তাঁর সচিব, উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীবি. গোপাল রেড্ডী, গুজরাটের রাজ্যপাল শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীত্রিগুণা সেন, মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল শ্রী কে. সি. রেড্ডী এবং সর্বশ্রী জি. শঙ্কর কুরূপ, কৃষ্ণ কৃপালনী, প্রশান্ত মহলানবীশ, কাজী আবদুল ওদুদ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। ঐ স্মারক-পত্রে বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, 'অপূর্ব মণিমুক্তায় গাঁথা যে রত্নহার বঙ্গভাষার কণ্ঠে পরিয়েছেন তিনি, তাতে তাঁকে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের সমগোষ্ঠীতে সহজেই বসান যায়।' ঐ স্মারক-পত্রে কবিতা রচনা করে যাঁরা তারাশঙ্করের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধানিবেদন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী রমা চৌধুরী, শ্রীকালিদাস রায়, শ্রীনরেন্দ্র দেব ও শ্রীমতী আশাপূর্ণাদেবী উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য 'ভারতশিল্পী তারাশঙ্কর' শীর্ষক একটি গ্রন্থ প্রণয়নে মনোযোগী হয়েছেন। ১৩৭১ সালের আশ্বিন মাস থেকে 'শনিবারের চিঠি'তে তারাশঙ্কর 'আমার কথা' শীর্ষক এক নতুন পর্যায়ের রচনা শুরু করেছিলেন যার মাধ্যমে তিনি নাকি আত্মস্বরূপের আস্বাদনে প্রয়াসী হয়েছেন, তাঁর মৃত্যুর জন্য তা' অসমাপ্ত থেকে গেছে। তাঁর মৃত্যুর পর কালি ও কলম, চিত্রাঙ্গদা, কথা-সাহিত্য এবং শনিবারের চিঠির তরফ থেকে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছিল। ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দে চীন-ভারত-সংঘর্ষের পরে 'যুগান্তর'-সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করলে তিনি ঐ পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে যোগদান করেন।

২.

শখ ও প্রবণতা

মা ও পিসীমার জন্য এবং পরবর্তীকালে পারিবারিক দায়িত্ব-পালনের সূত্রে তারাশঙ্কর সংসারধর্মে নিষ্ঠাশীল হয়েও প্রিয়তমা কন্যা বুলুর মৃত্যুর পর এবং দেশসেবা ও মহামারীর কাজে বহুবার পারিবারিক গণ্ডীর বাইরে স্বেচ্ছায় চলে গিয়েছেন। মেলায় ঘুরেছেন, শরৎচন্দ্রের মতো পতিতালয়ে যাননি। তবে পতিতাদের জীবনচর্যা কাছে গিয়ে দেখেছেন এবং শরৎচন্দ্রের মতো সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ না করলেও জগৎ ও জীবনের উৎসকে খুঁজে দেখার ও জানার ব্যাকুল আগ্রহে তিনি 'আরোগ্য নিকেতন' লেখার আগে কাউকে কিছু না জানিয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী ও পুত্র তাঁকে কাশী থেকে ফিরিয়ে আনেন। সন্ন্যাস-জীবন এবং সন্ন্যাসীর প্রতি প্রগাঢ় অনুরক্তির পরিচয় বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র ও বিভূতিভূষণের মতো তিনিও দিয়েছেন তাঁর রচনার মধ্যে—'ধাত্রীদেবতা'য় রামজী সাধু এবং 'যোগভ্রষ্টে' সাধুজী এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

রাষ্ট্রনীতিক চেতনায় তারাশঙ্কর কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাসী, মহাত্মা গান্ধীর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধাশীল। তিনি সুভাষচন্দ্রের প্রতি বহুবার গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। কংগ্রেস ও কম্যুনিস্টের দলীয় মতানৈক্যে বহুবার বিচলিত হলেও তিনি অক্লান্ত যোদ্ধার মতো প্রতিপক্ষের বিরোধিতা করেছেন।

সামাজিক মানুষ হিসেবে প্রতিবেশীদের বিপর্যয়ে তারাশঙ্কর সর্বক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিতেন। গ্রামের আগুন নেবানোর ঘটনার মধ্যে তাঁর কৈশোরের জাগরণ ঘটেছিল এবং মহামারী ও নানারকম সেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের নিকট সান্নিধ্যে উপনীত হয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন বলে তাঁর আত্মকথামূলক গ্রন্থগুলোতে জানিয়েছেন।

শরৎচন্দ্রের মতো তিনি গান গাইতে জানতেন না তবে সঙ্গীত সম্পর্কে এবং তার বিশুদ্ধ তাল মান লয় সম্বন্ধে তাঁর প্রগাঢ় ধারণা আছে। তাঁর অসংখ্য গল্প উপন্যাসে গানের ছড়াছড়ি এবং 'কবি' থেকে শুরু করে হাল আমলের 'মঞ্জরী অপেরা' পর্যন্ত অধিকাংশ উপন্যাসের পাতায় তিনি কখনো আঞ্চলিক ভাষায়, কখনো রাঢ়ীয় পশ্চিমবঙ্গের লোক-সংস্কৃতির ধারাকে উপজীব্য করে অসংখ্য উৎকৃষ্ট গানের সৃষ্টি করেছেন। সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে তাঁর যেন একটু বেশি-মাত্রায় প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এমনকি, তাঁর কাহিনীর চিত্ররূপ ও নাট্যরূপ দেওয়ার সময়েও সাধারণত তিনিই সঙ্গীত রচনার দায়িত্ব পালন করতেন।

শেষের কয়েক বছর ধরে তিনি ছবি আঁকছিলেন। অধিকাংশই রঙীন ছবি। 'সপ্তপদী'র কৃষ্ণেন্দু, 'যাদুকরী' প্রভৃতি তাঁর আঁকা কয়েকটি উৎকৃষ্ট ছবি। প্রকৃতি-চিত্রণেই তাঁর ঝোঁক যেন একটু বেশি। এবং সেই নিসর্গ দৃশ্যগুলোতেও তিনি যেন বীরভূমের রুক্ষ প্রান্তরের স্থানিক বৈশিষ্ট্যকেই ফুটিয়ে তুলতে একটু বেশিমাত্রায় আগ্রহী। কয়েকবছর আগে এ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ তাঁর অঙ্কিত

চিত্রাবলীর একটি প্রদর্শনী হয়েছিল। কাঠের কাজেও তাঁর কিছু পারদর্শিতা আছে, কাঠ থেকে কেটে তিনি যে মৎস্যগন্ধা মূর্তিটি তৈরী করেছেন, আঙ্গিক পারিপাট্যে তা লাবণ্যময়ী হয়ে উঠেছে। প্রথম জীবনে তিনি কয়েকবার অভিনয় করেছিলেন। শুধু অভিনয়ের ক্ষেত্রেই নয়, নাটক রচনার অনুপ্রেরণাও তিনি গ্রাম থেকেই পেয়েছিলেন। নাট্যকার হিসেবে নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের গ্রামের পরিধিকে ছাড়িয়ে কলকাতার রঙ্গমঞ্চে তখন খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাছাড়া, নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং কালিকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় তখন তাঁদের গ্রামের দুই বিশিষ্ট নাট্যকার; এঁদের পরোক্ষ প্রভাবে এবং পরবর্তীকালের নাট্যকার হিসেবে খ্যাতি পাওয়ার প্রথমতম সূচনার প্রত্যক্ষ তাগিদ থেকে তাঁর মনে নাটক রচনার ব্যাকুলতা জেগেছিল। তাই, আঠারো টাকা খরচ করে গ্র্যাণ্ড ডাফ-এর তিনখণ্ড মারাঠাদের ইতিহাস কিনে, পড়ে, তিনি 'তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ' নিয়ে একখানা নাটক লিখে ফেললেন। আশ্চর্য রকম সফলতার সঙ্গে তাঁদের রঙ্গমঞ্চে সেটি অভিনীত হয়। তাঁর প্রথম জীবনের সাহিত্যগুরু নির্মলশিববাবুর মারফতে ঐ নাটকটি অভিনয়ের জন্য কলকাতার আর্ট থিয়েটারের অধ্যক্ষের কাছে এলে তিনি সেটি না পড়েই ফেরৎ দেন এবং নিদারুণ হতাশায় তারাশঙ্কর নাটকের পাণ্ডুলিপিটি বাড়ি ফিরে জলন্ত 'উনানে গুঁজে' দেন। এই আঘাতটি না পেলে হয়তো তিনি পরবর্তী জীবনে নাট্যকার হিসেবেই খ্যাতিমান হতেন, কথাসাহিত্যিক হিসেবে নয়। বাংলা নাটকের ইতিহাসে তাঁর ভূমিকা প্রসঙ্গান্তরে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তারাশঙ্করের একটি লক্ষণীয় সাদৃশ্য আছে: উভয়ের অসামান্য জনপ্রিয়তা, উভয়েরই অধিকাংশ রচনা চলচ্চিত্রে অথবা মঞ্চে রূপায়িত হয়েছে এবং মঞ্চরূপের ক্ষেত্রে নিজেদের উপন্যাসের সফল নাট্যরূপ বিরল ব্যতিক্রম ব্যতীত নিজেরাই দিয়েছেন। উভয় লেখকই ঘটনা সংস্থানের দিক থেকে

নাটকীয়তা একটু বেশি পছন্দ করেন বলে মনে হয়, তাই মূলত নাট্যকার না হয়েও তাঁরা চিত্র ও মঞ্চজগতে অসামান্য জনপ্রিয়তার মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছেন।

ঈশ্বরের প্রতি তারাশঙ্করের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল এবং সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই তিনি যে শুধু তাঁর স্বকীয় মতাদর্শের ভিত্তি গড়ে তুলে-ছিলেন তাই নয়, তাঁর সৃষ্ট অসংখ্য চরিত্রের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে লেখকের প্রখর নীতিবোধের সূত্রকে আশ্রয় করে। প্রয়োজন-বোধে তিনি বহুবার বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে নিজের দোষত্রুটি স্বীকার করেছেন যা তাঁর মতো ভারতবন্দিত খ্যাতিমান লেখকের পক্ষে রীতিমত বিস্ময়কর। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে আত্মজৈবনিক রচনার মাধ্যমে তিনি যেন মাঝে মাঝে বিচারকের আসনে বসে আত্মসমালোচনা করেছেন। মনের আয়নায় নিজের ছবি দেখেছেন।

শুধু জন্মস্থান নয়, জন্মভূমির সর্বস্তরের মানুষের প্রতি তাঁর প্রীতি ছিল অপরিসীম। অর্থ, অন্ন ও বস্ত্রদান করে তিনি স্থানীয় দরিদ্র ও অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের হৃদয় জয় করেছিলেন। শুধু দানের মাধ্যমেই নয়, ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করার পর থেকে তিনি যখনই গ্রামে যেতেন তখনই অসংখ্য মানুষ নানাবিধ সাহায্য সহযোগিতা ও উপদেশের জন্য তাঁর কাছে ভিড় করত এবং তিনিও তাঁদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশতেন, তাদের প্রতি তাঁর ব্যবহার ছিল প্রসন্ন উদার ও শোভন। তাঁর হৃদয়ের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে তাদের প্রবেশাধিকার ছিল অবিরত ও অব্যাহত। টালার বাড়িতেও তিনি দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য প্রত্যহ কিছু-না-কিছু অর্থব্যয় করতেন।

শুধু দরিদ্র মানুষেরাই নয়, তাঁর প্রীতিস্নিগ্ধ সরল ব্যবহার থেকে ছোট-বড় নির্বিশেষে কেউই বঞ্চিত হননি। পরিচিতজন অসুস্থ হলে বা কোনোপ্রকারে বিপদাপন্ন হলে তিনি সর্বপ্রথমে এগিয়ে আসতেন। কালিকানন্দ অবধূত আশ্রম বিক্রয় করবেন শুনে

তারাশঙ্কর সেখানে গেলেন, অতঃপর 'মরুতীর্থ হিংলাজ' বইটিকে কেন্দ্র করে অবধূতের প্রতিষ্ঠার প্রধান সহায়কের ভূমিকা নিলেন তিনি ; অসুস্থ জ্যোতির্বিদ-সাহিত্যিক দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্যের রোগ-শয্যার পাশে নিঃসঙ্গ তারাশঙ্করের আবির্ভাব বিস্ময়কর নয় মোটেই ; মৃত্যুর করালগ্রাসে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বদিন পর্যন্ত অসুস্থ শৈলজানন্দের বাসভবনে প্রত্যহ সকালে তাঁর আগমন ছিল অবধারিত ; অনুজপ্রতিম নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রয়াণ তাঁর জীবনে এক নিদারুণ আঘাত ; কবি-সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্যকে শুধু যে তিন-তিনখানি বই উৎসর্গ করেছিলেন তাই নয়, স্ত্রীকে উপহার-দেওয়া একখানা বইয়ের প্রথম কপিটি জগদীশবাবুকে উপহার দিতে তিনি স্ত্রীকে সম্মত করিয়ে-ছিলেন ; অসুস্থ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্য ও সহায়তার জন্য তিনি সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এসেছিলেন এবং 'বিবর'-প্রকাশের পরে তাঁর রুচিবোধ পীড়িত হওয়ার ফলে তিনি সমরেশ বসুর প্রতি অপ্রসন্ন হলেও সমরেশের লেখকতার প্রতি তাঁর প্রীতিস্নিগ্ধ ঔৎসুক্য বরাবরই অটুট ছিল। সাহিত্যিক বা সাহিত্যযশঃপ্রার্থী—সকলের জন্যই তাঁর হৃদয়ের দ্বার ছিল উন্মুক্ত।

প্রকৃতির প্রতি তাঁর আবাল্য আকর্ষণের ফলেই গাছপালার প্রতি বিভূতিভূষণের মতো তাঁরও ছিল এক দুর্নিবার মমত্ববোধ। শুধু লাভপুরে নয়, টালার বাড়িতেও তাঁর বাগান করার শখ ছিল এবং প্রত্যহ তিনি গৃহসংলগ্ন বাগানে গাছপালার কাজে কিছুক্ষণ নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন।

৩

তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবন

উপন্যাসিক এবং গল্পকার তারাশঙ্করের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগেই আমরা নাট্যকার এবং গীতিকার হিসেবে তারাশঙ্করের প্রবণতার কথা উল্লেখ করেছি। এবারে কবি তারাশঙ্করের সঙ্গে আমাদের একটু পরিচয় করিয়ে নিতে হবে, তার কারণ তাঁর প্রথম প্রকাশিত বইটি কোনো নাটক বা উপন্যাস বা গল্পের বই নয়, একটি কবিতার বই—'ত্রিপত্র', প্রথম প্রকাশ ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে।

খ্যাতিমান উপন্যাসিক বা নাট্যকারের জীবনের প্রারম্ভ পর্বে কাব্যচর্চার নিদর্শনে তারাশঙ্কর ব্যতিক্রম নন, বিশ্বসাহিত্যে এর অনেক নজির আছে। ইবসেন কৈশোরে স্কুলে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে কবিতা রচনা করেছেন। একুশ-বাইশ বছর বয়সে, অতিমাত্রায় প্রগতিপন্থী আনাতোল ফ্রাঁসের দুটি কবিতা একটি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হলে পত্রিকাটি রাজরোষে বাজেয়াপ্ত হয়। তাছাড়া, ঊনতিরিশ বছর বয়সে ফ্রাঁসের প্রথম প্রকাশিত বই

একখানি কবিতা সঙ্কলন। বাবার যক্ষ্মায় মৃত্যু হবার ফলে আতঙ্ক-গ্রস্ত আঁদ্রে জিদ অনেকের পরামর্শে কিছুদিনের জন্য আফ্রিকার বিসক্রায় থাকাকালীন স্থানীয় লোকজনের কাছে খুব প্রিয় হয়ে ওঠেন। বাসস্থানের নিকটবর্তী মরূদ্যান দেখে কবিতারচনায় অনুপ্রাণিত হন এবং অতি-অল্প সময়ের মধ্যেই কয়েকটি কবিতা রচনা করেছিলেন। বি এ. পাশ করার পরের বছর অলডাস হাক্‌সলির প্রথম কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছিল—'দি বারণিং হুইল।' পরবর্তী দু'বছরের মধ্যে 'জোনে' এবং 'দি ডিফিট অফ ইয়ুথ' প্রকাশিত হয়েছিল। চতুর্থ কবিতার বই 'লেডা' ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে এবং পঞ্চম ও শেষ কবিতার বই আরো এগারো বছর বাদে প্রকাশিত হয়। বাইশ বছর বয়সে, ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে, হাউপটম্যানের প্রথম কাব্যগ্রন্থ বায়রণের অনুকরণে রচিত কয়েকটি কবিতার সঙ্কলন প্রকাশিত হলে পাঠক ও সমালোচকমহলে দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হয়। মাত্র তিন বছরের মধ্যেই তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তরুণ বয়সে ফকনার মনপ্রাণ ঢেলে কবিতা রচনা করলেও সেগুলো পরিচিত মহলে হাসির খোরাক যোগাত। কিন্তু প্রথম যৌবনের স্বপ্নরঙিন দিনে আবেগমণ্ডিত চেতনায় সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে কাব্যরূপের প্রতি ঘনিষ্ঠ আকর্ষণ বোধ করা সঙ্গত ও স্বাভাবিক। তাই, তারাশঙ্করেরও প্রথম প্রকাশিত বই, একখানি কাব্যগ্রন্থ।

কাব্যচর্চার পশ্চাতে আর একটি ভাব তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল, তা হল কবিতার প্রতি প্রেম। স্কুলে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতি উপলক্ষে একলব্যের ভূমিকায় প্রাণবন্ত আবৃত্তি এবং কয়েকবছর বাদে স্কুলে পুরস্কার বিতরণী সভায় 'King and the Miller'-এ 'King'-এর ভূমিকায় চমৎকার আবৃত্তি তাঁকে নিশ্চয়ই কবিতার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। রবীন্দ্র-প্রেরণার কথা ('কথা ও কাহিনী,' 'কণিকা'য় নতুন সুরের সন্ধান) তো আগেই বলেছি। চণ্ডীদাসের জন্মভূমি নান্নুরেও ইতিমধ্যে তিনি ঘুরে এসেছিলেন। তাছাড়া,

ছিল বাল্যবয়স থেকেই কাব্যরচনার সহজাত স্বাভাবিক প্রেরণা। একটি পাখির ছানার মৃত্যু উপলক্ষে অতি-শৈশবেই কবিতা লিখেছিলেন :

'পাখীর ছানা মরে গিয়েছে
মা ডেকে ফিরে গিয়েছে
মাটির তলায় দিলাম সমাধি
আমরাও সবাই মিলিয়া কাঁদি।'

এবং পর বৎসর আগমনী কবিতা রচনায় দু' লাইনের সন্ধান পাওয়া যায় :

'শারদীয়া পূজা যত নিকটে আইল,
তত সব লোকের আনন্দ বাড়িল।'

যা হোক, আটাশ বছর বয়সে প্রকাশিত প্রথম কবিতার বইকে তারাশঙ্কর নিজে সমালোচনা করেছেন 'মন্দ যশঃপ্রার্থীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ'[১] বলে। তাঁর এক শ্যালক স্বকীয় স্বাভাবিকগুণে তাঁর পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠেন এবং জোর করে তাঁর কাছ থেকে কবিতার খাতা নিয়ে লাল কালিতে কবিতার বই ছেপে বের করলেন। প্রকাশকের আকস্মিক মৃত্যুর সঙ্গে সেই বইয়েরও সর্বসন্ধান বিলুপ্ত হয়েছিল। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে 'মারাঠাতর্পণ' নাটক লেখার সময় 'দীনার দান' নামে তিনি একখানি উপন্যাসও রচনা করেছিলেন এবং সেটি প্রকাশিত হয়েছিল শিশির বসু-সম্পাদিত 'এক পয়সার শিশিরে'। বর্তমানে ঐ পত্রিকাটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। এই উপন্যাসটির উপস্থাপনার ক্ষেত্রে লেখক স্বীকার করেছেন, 'তখনও নূতন যুগের রচনা পড়ে পথ পাইনি, শরৎচন্দ্রকে অক্ষমভাবে অনুকরণ করেছিলাম।'[২]

এই পশ্চাৎপটকে রেখে তারাশঙ্করের প্রথম গল্প 'রসকলি' ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন মাসে 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত হয়। (তার আগে স্থানীয় 'পূর্ণিমা' নামে একটি মাসিক পত্রে তাঁর 'স্রোতের কুটো'

গল্পটি প্রকাশিত হয়)। এক নিবিড় পল্লীগ্রামের একটি ছায়ানিবিড় আখড়া, যাকে রসিক জনে রসান দিয়ে বলে কমলিনীর কুঞ্জ, এবং সেখানকার লাস্যময়ী বৈষ্ণবী কমলিনী ও বৈরাগী পুলিন দাস এই গল্পের বাস্তব-অংশ এবং প্রকৃত উৎস। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর যখন গল্পটি 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত হল, তখন দীনেশরঞ্জন তাঁকে জানালেন, রসিকমহলে গল্পটি সুখ্যাত হয়েছে এবং আবেদন জানালেন আর একটি গল্পের জন্য। পাঠালেন 'হারানো সুর' এবং ছাপা হল দু' মাস পরে ঐ পত্রিকাতেই। 'রসকলি' গল্পটিকে লেখক তাঁর প্রথম গল্প হিসেবে ধরে নিয়ে বলেন, 'আমার প্রথম গল্প আমার প্রথম সন্তানের মতই প্রিয়'। 'কালিকলমে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল, 'রসকলি' এবং 'হারানো সুরে'র মতো সৃষ্টি অধুনা সাহিত্যে বিরল। এই প্রশংসার ফলে তিনি 'কালিকলম' 'উপাসনা' ও 'ধূপছায়া' থেকে লেখা পাঠাবার আবেদন পেলেন এবং এই পত্রিকাগুলোর পৃষ্ঠায় তাঁর কয়েকটি গল্পও প্রকাশিত হল, 'কল্লোলে'র পাতায় একটি কবিতাও লিখলেন। 'কালিকলমে' প্রকাশিত 'শ্মশানের পথে' গল্পটি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং ঐ গল্পটিরই পরিবর্ধিত সংস্করণ হিসেবে 'চৈতালী ঘূর্ণি'র সূচনা ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে জেল-খানাতেই শুরু করেছিলেন। দুইটি অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ থেকে এই উপন্যাসের পরিকল্পনা: একদিকে, ছোটো জমিদার বংশে জন্ম বলেই তদানীন্তন জমিদারী অত্যাচারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, তৎসহ মাতৃদত্ত ন্যায়-অন্যায়বোধের বিচিত্র ধারণা, কংগ্রেসের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য থাকায় মুমূর্ষু শক্তিহীন সমাজের জন্য বেদনাবোধ তাঁকে ক্ষুব্ধ করেছে। তিনি বলেছেন, 'শরৎচন্দ্রের পল্লীজীবন নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে রমা, অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রীর জীবনের ব্যর্থতায় বেদনাহত হয়েছি, এবং দেখেছি সমাজ সর্বত্র দাঁড়িয়ে আছে ত্রিভুজের এক কোণে, বিপুল তার শক্তি, কঠিন তার আক্রোশ।'[৩] অন্যদিকে কয়লাখনির মালিক শ্বশুরকুলের কাছে 'জমিদার-ঘরের

অর্ধশিক্ষিত জামাইটি' বিব্রত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট হয়ে ওঠায় তাঁরা তাঁকে কয়লাকুঠিতে পাঠিয়ে কাজের লোক করে তুলতে চেয়েছিলেন, মাঝে মাঝে যেতে বাধ্য হলেও মাস ছয়েকের বেশি লেগে থাকতে পারলেন না—তবে সেখানকার অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনের পাথেয় হয়েছে। এই দুই অভিজ্ঞতার ফলে তিনি উপলব্ধি করলেন, 'সমাজের দেহে চাবুকের আঘাতে স্পন্দন জাগবে না, ওকে ভারি ধারালো অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করে সরিয়ে সংকার করতে হবে চিতা জ্বালাতে হবে। শবদেহটা আগলে আছে বৈদেশিক রাজশক্তি। একটাকে সরিয়ে আর একটাকে রাখলে চলবে না। দুটোকে একসঙ্গে সরাতে হবে। এক চিতায় দুটো যাবে।'[৪] শরৎচন্দ্রের অসহায় অথচ বিপুলায়তন ঘটোৎকচের মতো সমাজকে তারাশঙ্কর উৎখাত করতে চাইলেন। 'উপাসনা' প্রেস থেকে বইখানি ছাপা হয়ে প্রকাশিত হল ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে এবং উৎসর্গ করা হল বাংলার যৌবনশক্তির প্রতীক, নবযুগের অগ্রদূত, নেতাজি সুভাষচন্দ্রের নামে।

'পাষাণপুরী'রও পত্তন হয়েছিল কারাগারের অন্তরালে। পরে সরোজ রায়চৌধুরী-সম্পাদিত 'অভ্যুদয়' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ছাপা শুরু হলে কিছুদিন বাদে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায় এবং পরে সরোজবাবুর সম্পাদিত 'নবশক্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সিউড়ী আদালতে সমন অনুযায়ী আত্মসমর্পণ করতে গিয়ে কালী কর্মকার নামক জনৈক হত্যাপরাধীকে দেখে, তার কাহিনী শুনে, জেলে তার সঙ্গে আলাপ করে এবং ঐ সূত্রে কয়েদখানায় অবরুদ্ধ মানুষগুলির নিরুদ্ধ কামনার বিচিত্র-কুটিল এবং অসহায় প্রকাশ দেখে লেখক 'পাষাণপুরী' লিখতে উদ্বুদ্ধ হন। বর্মণ পাবলিশিং হাউস থেকে ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই জুলাই বইটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

প্রকাশের দিক থেকে তাঁর পরবর্তী বই, প্রথম গল্পগ্রন্থ, 'ছলনাময়ী'

—বরেন্দ্র লাইব্রেরী থেকে 'ছলনাময়ী' 'মেলা' 'সন্ধ্যামণি' এইরকম দশটি গল্পের সংকলন। তাঁর মেলায় যাওয়ার কথা আগেই বলেছি। জুয়াড়ি, পতিতা প্রভৃতি সর্বস্তরের মানুষের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে মাঘ মাসের শীতের মধ্যে দৈধার মেলায় গাছতলায় বসে 'মেলা' গল্পটি প্রথমবার লিখলেও পরে সে'টিকে দু'তিনবার সংশোধন করেন। ১৩৩৮ সালের বৈশাখ মাসেই 'বঙ্গশ্রী'তে 'মেলা' ছাপা হল। গল্পের শেষ অনুচ্ছেদটি সজনীকান্ত বাদ দিয়েছিলেন। ঐ মাসেই 'বঙ্গশ্রী'তে তাঁর আর একটি উৎকৃষ্ট গল্প 'ডাইনীর বাঁশী' ছাপা হল। লাভপুরের জনৈক গন্ধবণিকের নিঃসন্তান বিধবা মেয়ে স্বর্ণকে অবলম্বন করে এই আশ্চর্য গল্পটি লেখা হয়। এই গল্পটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। রবীন্দ্রনাথকে একজন বলেছিলেন,—'গল্পটি নিশ্চয় বিদেশী গল্প থেকে নিয়েছে।' রবীন্দ্রনাথ সে কথা বিশ্বাস করেননি। তিনি প্রত্যয়সিদ্ধ কণ্ঠে জানিয়েছিলেন, 'এ তারাশঙ্করের দেখা ডাইনী, সে তাকে দেখেছে।' লেখকও তাঁকে জানান 'ও আমার দেখা। আর আমি তো ইংরিজী ভাল জানি না, আমার গ্রামে ইংরিজী বই পড়ারও সুযোগ নেই। স্বর্ণ ডাইনী আমাদের বাইরের বাড়ীর পুকুরের ওপারে থাকত। তাকে আমি দেখেছি।' রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিজ্ঞতার তারিফ করে বলেন, 'আমাদের দেশের এঁরা ইউরোপের উইচক্র্যাফটের কথা অনেক পড়েছেন। শহরে থাকেন, গ্রামের ডাইন দেখেননি। তাই উইচ নিয়ে গল্প হলেই মনে করেন, বিদেশ থেকে না বলে ধার করেছে।' বুলুর মৃত্যুর জন্য কন্যাশোকার্ত পিতার অন্তরের বেদনাকে অবলম্বন করে লেখা 'সন্ধ্যামণি' গল্পটি ইতিমধ্যেই 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল এবং এই পত্রিকার পাতাতেই শুরু হয়েছিল তাঁর নতুন করে সাহিত্যপথে যাত্রা। তাই স্মৃতি ও ইতিহাসের দিক থেকে 'সন্ধ্যামণি' তাঁর সবচেয়ে প্রিয় গল্প। ঐ ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দেই তাঁর 'প্রেম ও প্রয়োজন' উপন্যাসখানি প্রকাশিত হয়।

পরবর্তী বছরে তাঁর দুইখানি বই প্রকাশিত হল : 'জলসাঘর', গল্পগ্রন্থ, 'আগুন', উপন্যাস। 'জলসাঘরে' এগারোটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল : জলসাঘর-রায়বাড়ি, পদ্ম-বউ, ডাক-হরকরা, প্রতীক্ষা, মধুমাস্টার, তারিণীমাঝি, খাজাঞ্চিবাবু, টহলদার, ট্যারা, রাখাল বাঁড়ুজ্জে, নারী ও নাগিনী। 'জলসাঘর' গল্পে তিনি ভাঙ্গনের কথা লিখেছেন বলে কেউ কেউ অনুযোগ জানিয়েছিলেন তাঁকে, এমন সময় পুরোনো আমলের কোন এক জমিদার বাড়ীর মহাসমারোহপূর্ণ শ্রাদ্ধের একটি বিরাট ফর্দ আবিষ্কৃত হয়ে তাঁর হাতে আসে। সেই ফর্দটিকে উপলক্ষ করে লিখলেন 'রায়বাড়ি'—'জলসাঘরের' ভাঙ্গনের কথা মনে রেখে, তার বাতিদানের বাতি নিবিয়ে দেওয়ার কথা মনে রেখেই। রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে 'জলসাঘর' বইটি তারাশঙ্করের কাছে স্মরণীয়তম। কলকাতায় নৃত্যনাট্যের পর্ব শেষ করে শান্তিনিকেতনে ফেরার পথে রবীন্দ্রনাথ ইরিসিপেলাসের আক্রমণে জ্ঞান হারান। সমগ্র দেশ গভীর উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগে কয়েকটি দিন অতিবাহিত করল। রবীন্দ্রনাথ জ্ঞান ফিরে পাবার তিন দিন পরে শান্তিনিকেতন থেকে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুধীর কর পৃথক চিঠি লিখে তারাশঙ্করকে জানিয়েছেন অবিলম্বে কবিকে একখানি 'জলসাঘর' পাঠিয়ে দিতে। পরবর্তী সাক্ষাতে সুধীরবাবু নাকি জানিয়েছিলেন, চেতনা ফিরে পেয়ে কবি তাঁর বিজ্ঞানের প্রুফ এবং 'জলসাঘর' বইখানি চেয়েছিলেন। 'জলসাঘর' বইটির প্রতি কবির এই আগ্রহের কারণও সুধীরবাবু জানিয়েছিলেন, 'ওই 'রায়বাড়ি' গল্পে গেরুয়া পরে সর্বস্বত্যাগ করে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে, গঙ্গার ঘাটে নৌকোয় উঠতে গিয়ে বিশ্বম্ভর রায় বারেক ফিরে তাকিয়ে যেই দেখলেন, অন্ধকার রায়বাড়ির জলসাঘরে আবার জ্বলে উঠেছে আধ-নেবানো বাতিগুলি এবং সেই আকর্ষণে যে আবার তিনি ফিরে এলেন, এরই মধ্যে অচৈতন্যের অন্ধকার থেকে চৈতন্যের দীপ্তির মধ্যে তাঁর নিজের ফিরে আসার একটি মিল পেয়েছেন বলে তাঁর মনে হয়েছে।'[৫] তাছাড়া, কবি নাকি জনৈক

খ্যাতনামা কবিকে (তারাশঙ্করকে ধারণা, ইনি সুরেন্দ্র মৈত্র) লেখা এক চিঠিতে ইউরোপের গল্পলেখকদের সঙ্গে তারাশঙ্করের তুলনা করেছিলেন।

পরবর্তী বছরে প্রকাশিত হল 'রসকলি' গল্প সংগ্রহ। বই পাঠালেন, রবীন্দ্রনাথ ও মোহিতলাল মজুমদারকে। মোহিতলাল জানালেন, 'রসকলি' সম্পর্কে আমার মতামত আমি ঘোষণা করিয়া বলিব স্থির করিয়াছি। তাহার সময় আসিয়াছে। কাগজে লিখিব। তাহা হইতেই জানিতে পারিবেন।' ১৩৪৬ সালের বৈশাখের 'প্রবাসী'তে তিনি সমালোচনা-প্রসঙ্গে উৎকৃষ্ট কবিদৃষ্টির সংজ্ঞা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে জীবনকে দেখবার জন্য যে দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করেছিলেন, তারাশঙ্করের মধ্যে তার সন্ধান পেয়েছিলেন। তারাশঙ্করের সাহিত্যের, বিশেষত তাঁর প্রথম পর্বের রচনার সর্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক মোহিতলাল সেই সংক্ষিপ্ত গল্পগ্রন্থটির আলোচনা করতে বসে লেখকের 'কবি মনোভাবে'র 'অভিনব মৌলিক ভঙ্গী' আবিষ্কার করেছিলেন। 'ইহা কবি মানসের সেই সবল ও সুস্থ অপক্ষপাত যাহা জীবনের বিচিত্রতম অভিব্যক্তিকে একটি কেন্দ্রস্থিত রসকল্পনার অধীন করিতে পারে, পশু ও মানুষ, বন্য ও সভ্য, সুরূপ ও কুরূপ, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত এবং রুক্ষ ও কোমল, মেধ্য ও অমেধ্য, আদিম দুর্নীতি ও শিক্ষিত সুনীতি এই সকলের মধ্যেই তিনি জীবনের সেই একই রস-রহস্যের সন্ধান পাইয়া থাকেন।........তাঁহার কবিশক্তির আর একটি উৎকৃষ্ট লক্ষণ এই যে, জীবনের যে রঙ্গভূমিতে এই সকল নটনটী অভিনয় করিতেছে তাহার দৃশ্যপটও কোথাও অবান্তর নহে—বাহ্য প্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি একই সুরে বাঁধা।' অতএব মোহিতলালের দুঃসাহসিক সিদ্ধান্তঃ 'বর্তমানে কাব্যের ক্ষেত্র আগাছায় ভরিয়া গিয়াছে, বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের পরে সাহিত্য-সম্রাটের পদ কোন কবির প্রাপ্য হয় নাই। গল্প-লেখকগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান কে, এই প্রশ্ন উত্থাপন ও তাহার সমাধান করিতে হইলে তারাশঙ্করের কৃতিত্ব যেরূপ উত্তরোত্তর

স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে শেষ পর্যন্ত তাঁহার দাবিই গ্রাহ্য হইতে পারে এমন ভবিষ্যদ্বাণী করিবার দুঃসাহস আমি করিতেছি।' এই গল্পগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করা হয়।

পুস্তকাকারে প্রকাশের ক্ষেত্রে, তারাশঙ্করের পরবর্তী রচনা, তাঁর সুবিখ্যাত আত্মজৈবনিক উপন্যাস 'ধাত্রীদেবতা'। এই উপন্যাসের পাতায় সেবা সমিতির সম্পাদক হিসেবে গ্রামে কলেরার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান চালানো এবং তৎকালীন মেয়েদের পান খাওয়ার মাত্রাধিক্যের বিবরণ হুবহু লিপিবদ্ধ হয়েছে, তৎসহ লেখকের বিবাহিত জীবনের ক্ষেত্রে দুই পরিবারের মধ্যে রেষারেষির প্রসঙ্গ ও গৌরদাস ও শ্রীপুরের বৌ চরিত্র দু'টি অত্যন্ত বাস্তবতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। পরবর্তী উপন্যাস হিসেবে 'কালিন্দী' প্রকাশিত হয়েছে ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে —অহিংস বিপ্লবের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ যেন এক নতুন পট পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে চলেছে, মানব সমাজের এক নতুন কূলে উত্তরণ ঘটছে।

এই সময় থেকে তারাশঙ্কর অবিশ্রান্তভাবে লেখনী চালনা করেছেন। তাঁর সর্বশেষ প্রকাশিত বইয়ের কথা ধরলে তিনি এযাবৎ একখানি কবিতার বই, গল্প উপন্যাস মিলিয়ে শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন, অবশ্য 'প্রিয় গল্প', 'শ্রেষ্ঠ গল্প', 'গল্প পঞ্চাশৎ' এবং 'স্বনির্বাচিত গল্প' নিয়ে; ছোটদের জন্য রচনা করেছেন পাঁচখানি গ্রন্থ, তৎসহ 'সন্দীপন পাঠশালা'র কিশোর সংস্করণ, নাটক রচনা করেছেন কয়েকখানি, 'সংঘাত', 'বিংশ শতাব্দী' এবং 'পথের ডাক' মৌলিক নাটক, 'কালিন্দী' ও 'আরোগ্য নিকেতনে'র নাট্যরূপ তিনিই দিয়েছেন। 'পিতাপুত্র' নামক বহু প্রশংসিত গল্পের নাট্যরূপ তাঁরই দেওয়া। প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণি' থেকে শুরু করে সুদীর্ঘ চুয়াল্লিশ বছরের মধ্যে ১৯২৯-৩২ (চার বছর), ১৯৩৪-৩৫ (দুই বছর) ১৯৫৫-৫৬ (দুই বছর) সর্বসাকুল্যে আট বছরে তাঁর কোন বই প্রকাশিত হয়নি। ১৯৪০ থেকে ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দ, চৌদ্দ বৎসর

তাঁর সৃষ্টির স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। যদিও ১৯৩৬ থেকে ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রত্যেক বছরেই গড়ে তার তিনখানা করে বই প্রকাশিত হয় এবং আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি তিনি একালের অন্যতম জনপ্রিয় লেখক তবু রচনার গুণগত শ্রেষ্ঠতায় এবং পরিমাণে প্রতিভার স্বর্ণযুগে তিনি রীতিমত বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন। এই পর্বের আগেই তাঁর যে সমস্ত উৎকৃষ্ট রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল, তার উল্লেখ করেছি। 'কালিন্দী'র পরের বছরে প্রকাশিত হলো 'তিনশূন্য' এবং 'কালিন্দী'র নাট্যরূপ। তারপর ক্রমশ প্রকাশিত হতে থাকল 'দুই পুরুষ' ও 'গণদেবতা' (১৯৪২) 'প্রতিধ্বনি' 'বেদেনী' 'পৌষলক্ষ্মী' 'রাইকমল' ও 'দিল্লীকা লাড্ডু' (১৯৪৩) 'মন্বন্তর', 'যাদুকরী' 'স্থলপদ্ম' 'পঞ্চগ্রাম' ও 'কবি' (১৯৪৪) '১৩৫০' 'বিংশ শতাব্দী' 'চকমকি' 'প্রসাদমালা' ও 'হারানো সুর' (১৯৪৫) 'দ্বীপান্তর' 'ইমারৎ' 'সন্দীপন পাঠশালা' ও 'ঝড় ও ঝরাপাতা' (১৯৪৬) 'অভিযান' ও 'রামধনু' (১৯৪৭) 'সন্দীপন পাঠশালা', কিশোর সংস্করণ (১৯৪৮) 'তামস তপস্যা' (১৯৪৯) 'মাটি' ও 'পদচিহ্ন' (১৯৫০) 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' 'শ্রেষ্ঠগল্প' ও 'আমার কালের কথা' (১৯৫১) এবং 'বিচিত্র' 'আরোগ্যনিকেতন' 'প্রিয় গল্প' 'আমার সাহিত্য জীবন, ১ম খণ্ড' ও 'কামধেনু' (১৯৫৩) —তাঁর বারো বছরের সুবিপুল রচনাসম্ভার। পরবর্তী বারো বছরেও তিনি প্রায় সমসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেছেন—তবে তাঁর এই কালের রচনাকে মূলত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা চলে, ১. নীতিবোধ ও অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা—'উত্তরায়ণ' 'বসন্তরাগ' 'বিচারক' প্রভৃতি। ২. ব্যক্তিগত স্মৃতিকথামূলক—'আমার সাহিত্যজীবন, ২য় খণ্ড' 'মহানগরী' 'সপ্তপদী' (মূল প্রশ্নের বিচারে এই উপন্যাসটিকে প্রথম পর্যায়েও অন্তর্ভুক্ত করা চলে)। ৩. আঞ্চলিক ও লোকসংস্কৃতিমূলক—'মঞ্জরী অপেরা' 'অভিনেত্রী'। ৪. ঐতিহাসিক—'গন্নাবেগম' 'অরণ্যবহ্নি' 'ছায়াপথ'। ৫. চরিত্রপ্রধান—'বিপাশা' 'যতিভঙ্গ' 'গুরুদক্ষিণা'

'হীরাপান্না'। ৬. যুগমানসের প্রতিফলনবিষয়ক—'যোগভ্রষ্ট' 'একটি চড়ুইপাখী ও কালো মেয়ে'। ৭. কয়েকটি গল্পসঙ্কলন—'আয়না' 'তমসা' 'চিরন্তনী' 'গল্পসঞ্চয়ন' 'প্রেমের গল্প' 'গল্প পঞ্চাশৎ'। ৮. প্রবন্ধ ও নিবন্ধমূলক—'মস্কোতে কয়েকদিন' 'সাহিত্যের সত্য'। ৯. কিশোরসাহিত্য—'ভূতপুরাণ' 'স্বর্গলোকে ভূমিকম্প' 'উত্তর কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড'। ১০. কালান্তরের ইতিহাসনিষ্ঠ বর্ণনামূলক—'জনপদ' 'শতাব্দীর মৃত্যু'। কোন্ মানসিক প্রবণতায় তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্যের উপকরণ খুঁজেছেন, ব্যক্তি পরিবার সমাজ বা রাষ্ট্রের কোন্ বৈশিষ্ট্য বা সংঘাত তাঁর চেতনায় ধরা পড়েছে, দেশ-কাল ও সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সমাজসচেতন শিল্পিসত্তা কোন্ বিশেষ বোধে উদ্দীপিত হয়েছিল—প্রসঙ্গান্তরে সেগুলো আলোচিত হবে বলে এখানে সংক্ষেপে তাঁর গ্রন্থতালিকাটি প্রকাশ করা গেল।

'রসকলি' পড়ে মোহিতলাল তারাশঙ্করের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'ঘাসের ফুল' পড়ে তিনি উল্লসিত হয়ে বলেছিলেন, এতো ভালো গল্প তারাশঙ্কর দু'টি চারটির বেশি লেখেননি। 'কবি' পড়েও তিনি উচ্ছ্বসিত হন এবং তাৎপর্যপূর্ণ সমালোচনা লিখেছিলেন ; শুধু তাই নয়, তাঁর পরামর্শে দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে তারাশঙ্কর কবির উপসংহার পরিবর্তিত করেন। সাহিত্য ছাড়াও জীবনের দিক থেকে মোহিতলালের প্রচুর উপদেশ ও পরামর্শে তারাশঙ্কর শ্রদ্ধাশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যজীবনের ক্ষেত্রে সজনীকান্ত দাসের সহায়তা, অফুরন্ত ভালবাসা ও বিভিন্ন ব্যাপারে পরামর্শ তাঁর পক্ষে অনেকক্ষেত্রে রক্ষাকবচের কাজ করেছে। 'মহানগরী' নামক তাঁর আত্মজৈবনিক উপন্যাসে বিমলের শিল্পীজীবনের অভাব-অনটন ও প্রতিষ্ঠা পাওয়ার দ্বন্দ্ব এবং সে ব্যাপারে বিজয়বাবুর সবপ্রকারের সহযোগিতা প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর ও সজনীকান্তকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

শুধু 'জলসাঘর' বা 'ডাইনীর বাঁশী' নয়, 'রাইকমল'-ও রবীন্দ্রনাথের

'মনোহরণ' করেছিল। 'রাইকমল' রবীন্দ্রনাথের মনোহরণ করলেও এই উপন্যাসটি তারাশঙ্করের দুর্বল রচনা হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত। বাঙালী সমাজের বৈচিত্র্যহীন গতানুগতিক জীবনযাত্রার মধ্যে বৈষ্ণবের স্বতঃস্ফূর্ত প্রণয়লীলার অবতারণা করে রোমান্সের সৃষ্টি করলেও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'ইহার প্রধান ত্রুটি ভাবাবেগমত্ততা, বিষয়ের সহিত সামঞ্জস্য না রাখিয়া উচ্ছ্বাসের অপব্যয়, জীবনের সত্যকে অতিক্রম করিয়া ইহার কাল্পনিক কাব্যসৌন্দর্য্যের প্রতি অসংযত প্রবণতা।'[৬]

'ত্রিপত্র'কে বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের আগে তাঁর মাত্র দশখানি গ্রন্থ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে যে রচনাগুলি তিনি পড়েছিলেন সেখানে অভিজ্ঞতার এক নতুন জগৎকে দেখে তিনি সানন্দে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। সে জগতের প্রতি তাঁর আকুলতা ছিল কিন্তু তাঁদের 'পতিত' করে রাখায় তিনি সে জগতের নিকটবর্তী অধিবাসী হয়েও অনাত্মীয়তার ফলে প্রবেশলাভ করতে পারেননি। তারাশঙ্কর কবির সমকালীন নন, তাই অনাগত যুগকে যেন অতীত যুগের বর্ষীয়ান সাহিত্যগুরু অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি কবির প্রতি আশৈশব অপরিসীম শ্রদ্ধাশীল। তারাশঙ্কর মনে করেন, 'এবার ফিরাও মোরে' তাঁর আত্মার বাণী, রবীন্দ্র-কাব্য থেকে তিনি জীবনে প্রথম সুরসন্ধান করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের পল্লী পুনর্গঠনের নির্দেশে তিনি রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে সেবাধর্মে ব্রতী হয়েছিলেন। অতীতাশ্রয়ী ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে রহস্যমূলক গল্প লিখতে গিয়ে তিনি 'ক্ষুধিত পাষাণে'র প্রভাবের কথা স্বীকার করেন। তারাশঙ্করের সমগ্র রচনায় রবীন্দ্র-বিরোধিতার কোন প্রমাণ নেই। গৌতম বুদ্ধ, মহাত্মা গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথ—এই তিন ব্যক্তিত্বের প্রতি তিনি একান্ত ভক্তিপরায়ণ। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণ ও অনুসরণ করলেও তারাশঙ্কর কখনো রবীন্দ্রসাহিত্য কর্তৃক প্রভাবিত হননি। যদিও জগদীশ ভট্টাচার্যের মতে তারাশঙ্কর

রবীন্দ্রনাথের মতো বলতে পারেন, 'আছে আছে প্রেম ধূলায় ধূলায়, আনন্দ আছে নিখিলে। / মিথ্যায় ঘেরে ছোট কণাটিরে তুচ্ছ করিয়া দেখিলে,' তবুও একথা অনস্বীকার্য যে কৃষ্টির নয়, দৃষ্টির তফাতে উভয়ের মধ্যে ঘটেছে মস্ত বড় ব্যবধান। তিনি শরৎচন্দ্রকে কখনো কখনো অনুকরণ বা 'চাঁপাডাঙ্গার বৌ', 'তাসের ঘর' প্রভৃতি রচনায় অনুসরণ করেছেন। স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধাশীলতা সত্ত্বেও তাঁর সৃষ্টির ঐতিহ্যকে স্বীকার না করার নির্মোহ ও নিরাসক্ত শিল্পিমানস তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবনের একটি প্রচণ্ড বিস্ময়কর ঘটনা।

দেশী ও বিদেশী ভাষায় তারাশঙ্করের বহু রচনা অনুবাদিত হয়েছে, লেখক নিজেও সবগুলির সন্ধান জানতেন না। তাঁর ব্যক্তিগত অনুরোধে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'মন্বন্তর' উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন, 'পঞ্চগ্রাম'ও শুরু করেছিলেন কিন্তু শেষ করতে পারেননি। 'তারিণী মাঝি' ও 'নারী ও নাগিনী' গল্প দু'টির ইংরেজি অনুবাদও করেছিলেন তিনি। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে সারা ভারত প্রগতি লেখক সম্মেলনের অধিবেশন বসেছিল কলকাতায়। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, ইংরেজিতে অনুবাদ করে কয়েকটি উল্লেখ্য বাংলা ছোটগল্পের একটি সঙ্কলন প্রকাশ করা হবে— রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, প্রমথ চৌধুরী থেকে শুরু করে সমসাময়িক-কাল পর্যন্ত সব খ্যাতনামা লেখকের গল্পই তাতে থাকবে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অনুবাদ করলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যাত্রাবদল' গল্পটি, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনুবাদ করলেন তারাশঙ্করের 'তারিণী মাঝি'। মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দ্‌ সমস্ত অনুবাদিত গল্পগুলো নিয়ে বিলেত যাত্রা করলেন এবং পরে জানা গেল তিনি ঐ পাণ্ডুলিপিগুলো হারিয়ে ফেলেছেন। অথচ আশ্চর্য, কিছুদিন বাদে লেখক এবং অনুবাদকের অনুমতি না নিয়ে প্রগতি লেখক-মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য আহ্‌মদ আলি বিলেত থেকে 'Tomorrow' নামে প্রকাশিত এক সঙ্কলনে 'তারিণী মাঝি'র অনুবাদ সম্পাদনা করে প্রকাশ করলেন। শুধু তাই নয়,

পুনশ্চ লেখক এবং অনুবাদকের অনুমতি না নিয়ে নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত এবং বিলেত থেকে প্রকাশিত আর একটি গল্প-সংগ্রহেও ঐ অনুবাদটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দিল্লী থেকে সাহিত্য আকাদেমি অবশ্য ঐ অনুবাদটি প্রকাশের পূর্বে লেখকের অনুমতি চেয়েছিলেন।

তারাশঙ্কর হীরেন্দ্রনাথকে 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' এবং 'সপ্তপদী' অনুবাদ করতে অনুরোধ জানান। কিন্তু প্রথম বইটির অনুবাদ করা 'প্রায় অসম্ভব' বলে হীরেনবাবু 'ভয়' পেয়েছিলেন যদিও তাঁর মতে 'যে-কোনো সাহিত্যিকের পক্ষে বরণীয় ঐ রচনা' এবং দ্বিতীয় বইটি তিনি তখন পর্যন্ত পড়েননি।

ডবলু. সি. বোনার্জির পৌত্র প্রতাপ বোনার্জির ইংরেজি ভাষায় প্রচুর ব্যুৎপত্তি ছিল এবং তিনি তারাশঙ্করের ধ্রুপদী রচনা 'কবি'র ইংরেজি অনুবাদ প্রস্তুত করেছিলেন কিন্তু তা প্রকাশিত হয়নি। দিল্লী থেকে একটি প্রকাশন প্রতিষ্ঠান 'বিচারক' উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের পর তারাশঙ্করের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক গল্প ও উপন্যাস হিন্দীতে অনুবাদ করা হয়েছে। দিল্লীর কনট্ সার্কাসের কফি হাউসের আড্ডায় 'তারাজী'র সপ্রশংস আলোচনা প্রায়ই শোনা যায়, রাজধানীর অনেক সেরা নাট্যমঞ্চে 'গণদেবতা'র হিন্দী নাট্যরূপায়ণ এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিন্দী নাটক বলে স্বীকৃত ও অভিনীত। ১৯৪৪-৪৫ খ্রীস্টাব্দে 'চা পানরত তারাশঙ্করে'র একটি বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করে তাঁর সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে ওঠেন হিন্দী উর্দু তামিল মারাঠী ও গুজরাটী সাহিত্যিকেরা। কয়েক মাসের মধ্যেই হিন্দীতে অনুবাদিত হল তাঁর কয়েকটি বিশিষ্ট ছোটগল্প। স্বাধীনতার পরে দিল্লীতে ভারত সরকারের প্রকাশন বিভাগ থেকে প্রকাশিত হিন্দী সাহিত্য মাসিক 'আজকাল'-এ তাঁর বহু উৎকৃষ্ট গল্পের হিন্দী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

তাঁর কয়েকটি উৎকৃষ্ট ছোটগল্প ও উপন্যাস ওড়িয়া ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে ; তাঁর প্রয়াণের অব্যবহিত পরে 'কালি ও কলম'-এর বিশেষ সংখ্যায় ওড়িশার শচী রাউত রায় অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেছেন, 'উড়িষ্যার লেখকদের উপরও তারাশঙ্করের প্রভাব ছিল অনেকখানি।' এবং ঐ পত্রিকাতেই প্রখ্যাত হিন্দী লেখক প্রভাকর মাচওয়ে স্বীকার করেছেন, তারাশঙ্করের লেখার মধ্যে মৈথিলীশরণ গুপ্তের সরলতা এবং প্রেমচাঁদের পরিশ্রমী আন্তরিকতা ও মানবিকতার সমন্বিত রূপ লক্ষ্য করা যায়। মারাঠী সাহিত্যের দিকপাল নাট্যকার মামা ওয়াড়েরকরের সঙ্গে তারাশঙ্করের সাদৃশ্য শুধুমাত্র পোষাকে এবং চেহারায় ছিল না, ওয়াড়েরকরের পড়ার ঘরে তারাশঙ্করের একটি ছবিও টাঙানো থাকত। মারাঠী সাহিত্যজগতের অন্যতম জনপ্রিয় লেখক সানে গুরুজি রাজনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের মতো গান্ধীবাদী ছিলেন এবং সাধারণ মানুষকে নিয়ে এঁর লেখা গল্পাবলীর সঙ্গে 'গণদেবতা'র আত্মিক সাদৃশ্য আছে। প্রেমচাঁদের 'গোদান', মৈথিলীশরণ গুপ্তের দীর্ঘ কবিতা 'কিষাণ' এবং মামা ওয়াড়েরকরের বিশিষ্ট উপন্যাস 'সাত লাখাটিল এক' এবং তারাশঙ্করের 'গণদেবতা'র মধ্যে এক নিখুঁত সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়।

তারাশঙ্করের কীর্তি ও খ্যাতির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর পক্ষে নোবেল পুরস্কার পাওয়া বিন্দুমাত্র অসমীচীন ছিল না। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য, একালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় লেখকের কালজয়ী রচনাগুলি অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বের সারস্বত সমাজের কাছে সমগ্রভাবে উপস্থাপন করা হয়নি। যদি তা সম্ভব হত, তাহলে নোবেল পুরস্কার পাওয়া তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হত না। এ-সম্পর্কে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সর্বজনশ্রদ্ধেয় মার্কিন-প্রবাসী কবি-সমালোচক-দার্শনিক অমিয় চক্রবর্তীকে জগদীশ ভট্টাচার্য একটি চিঠি লেখেন। পত্রোত্তরে (২৫শে জুন ১৯৭১) অমিয়বাবু জানান : 'নোবেল প্রাইজ তারাশঙ্কর বাবুকে দেওয়া হলে ধন্য বোধ করব। তাঁর চেয়ে যোগ্য লেখক ভারতবর্ষে বা

অন্যত্র কেউ আছেন বলে জানি না। কিন্তু উপযুক্ত ইংরেজি তর্জমা করানো, প্রকাশন ও যথাযুক্ত প্রচারের কাজ সহজ নয়। এ প্রসঙ্গে আমি অন্য কোনো লেখকের নাম তুলতেই চাই না। এ বিষয়ে আপনারা উদ্যোগী হয়ে তর্জমার প্রথম করণীয় আয়োজন সমবেতভাবে গ্রহণ করুন—তারাশঙ্করবাবুর লেখা বৃহত্তর সমাজে ছড়িয়ে দিন এই আমার প্রার্থনা।'

বিষয়বস্তু ও রচনারীতির দিক থেকে তারাশঙ্কর কখনো বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক প্রভাবিত হননি তবে বঙ্কিমচন্দ্র ও তারাশঙ্কর সামাজিক মানুষ হিসেবে দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড নীতিবোধে বিশ্বাসী, স্বভাবতই সাহিত্যে তার প্রতিফলন পড়েছে। শুধু তাই নয়, বঙ্কিমচন্দ্র ও তারাশঙ্কর জননী ও জন্মভূমিকে একাত্ম করে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন, রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা তাঁদের সাহিত্যকে অনেকক্ষেত্রেই প্রভাবিত করেছে। উপজীব্যের দিক থেকে তাঁরা উপন্যাসের পটভূমি নির্বাচনে বিশালতার দিকে আগ্রহী, অজস্র চরিত্র তাঁদের উপন্যাসে ভিড় করে আসে এবং উভয়েই নিজেদের রচনার অধিকাংশক্ষেত্রে পুরুষচরিত্রকে প্রাধান্য দিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' 'কপালকুণ্ডলা' 'মৃণালিনী' এবং 'দেবী চৌধুরানী'তে নারীর ভূমিকা মুখ্য কিন্তু অন্যান্য উপন্যাসে পুরুষপ্রাধান্য এবং তারাশঙ্করের প্রায় শতাধিক গ্রন্থের মধ্যে 'চাঁপাডাঙ্গার বৌ' 'বিপাশা' 'যতিভঙ্গ' 'গন্নাবেগম' 'মহাশ্বেতা' 'নারী রহস্যময়ী' 'অভিনেত্রী' 'রূপসী বিহঙ্গিনী' এবং 'ফরিয়াদ' ছাড়া অন্যান্য উপন্যাসে নারীচরিত্রের প্রাধান্য সূচিত হয়নি। শরৎসাহিত্যে সর্বত্র নারীর ভূমিকা মুখ্য, অরক্ষণীয়া পরিণীতা বিধবা বারবণিতা—নারীজীবনের এই সম্ভাব্য রূপের যাবতীয় সমস্যা তাঁর রচনায় যেন মিছিল করে এসেছে।

তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবনের আর একটি মাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গে ছেদ টানতে চাই। রাজনৈতিক মতবাদজনিত সংঘাতের ফলে তিনি জীবনে বহুবার বিরূপ সমালোচনার

সম্মুখীন হয়েছিলেন, সেকথা প্রসঙ্গত অন্যত্র আলোচিত হয়েছে কিন্তু তিনি একবার সাধারণ জনতা কর্তৃক প্রচণ্ডভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন।

ভ্রান্তির সূত্রপাত তিনি নিজেই করেছিলেন বলে স্বীকার করেছেন। বাংলার অন্যতম প্রগতিশীল মাহিষ্যসম্প্রদায় ও চাষী কৈবর্ত যে এক সম্প্রদায়ের লোক তা না জানার ফলে তাঁর উপন্যাস 'সন্দীপন পাঠশালা'য় যে ভ্রান্তি থেকে গিয়েছিল কাহিনীটিকে চিত্ররূপ দেওয়ার সময় চিত্রনির্মাতারাও সেই একই ভুল করে বসেছিলেন। তিনি কিন্তু কাহিনীর মধ্যে চাষী কৈবর্ত নায়কের প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণা প্রকাশ করেননি। বরং সমাজ যে অবজ্ঞা প্রকাশ করে তারই প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি। তাঁর ধারণা, জাতি ও জন্ম ইত্যাদির ভিত্তিতে মানুষের প্রতি মানুষের অবজ্ঞার মতো পাপ আর হয় না। যাহোক, প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি মুক্তি পেলে হাওড়া থেকে তিনি ক্রুদ্ধ অভিযোগপত্র পেতে থাকলেন। এরই মধ্যে হাওড়া ব্যায়াম সংঘের পঁচিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে তিনি সভাপতিত্ব করতে সেখানে যেদিন গেলেন, সেদিন গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথে একদল ক্ষুব্ধ মাহিষ্যসম্প্রদায়ের লোক তাঁর ওপর প্রচণ্ড হিংস্র আক্রমণ চালায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। এই জঘন্য আক্রমণকে প্রসন্নমনে গ্রহণ করে তারাশঙ্কর পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে যে কথাগুলো বলেছেন, সেই বক্তব্যকে উদ্ধৃত করে তাঁর সাহিত্যজীবনের আলোচনা শেষ করছি, 'আমার কোন অভিযোগ নেই, কারুর উপর নেই। কেন থাকবে? এরা তো কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের আক্রোশে আমাকে আক্রমণ করেনি। এরা তো কম ভাল আমাকে বাসত না। আমি নিশ্চয়ই এদের মর্মে আঘাত দিয়েছি। এ তারই প্রতিঘাত।' এই ক্ষমাসুন্দর প্রসন্নতাই তারাশঙ্করের শিল্পিজীবনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।

৪

শিল্পিমানস ও সামাজিকতা

একালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় লেখকের শিল্পিসত্তার ক্রম-উন্মোচন প্রসঙ্গে সামাজিক যে বিশেষ ঘটনাগুলি সক্রিয়ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল, সে কথা বলার আগে সমাজের সঙ্গে শিল্পের ও শিল্পীর সম্বন্ধ কী হওয়া উচিত, এ সম্পর্কে বিশ্বের বিভিন্ন মহলের মতামত এবং শিল্প-সৃষ্টির ক্ষেত্রে আনন্দ-মূল্য ও প্রভাব-মূল্যের মধ্যে কোনটা অধিকতর উপযোগী এবং অনিবারণীয়, তা বিচার-বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন। কারণ, একালের সর্বাপেক্ষা কীর্তিমান ভারতীয় লেখকের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ অধিকাংশ মহলে প্রায়ই শোনা যায়, তিনি নাকি সমকালের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে আগ্রহী ছিলেন না, স্ব-কালের বেদনা ও উল্লাসে তিনি উদাসীন এবং তাঁর এই স্বেচ্ছাচারিতাও উদ্দেশ্যমূলক। একথা ঠিকই স্ব-দেশের যে রাজনৈতিক ভাঙাগড়ার অবিরাম স্রোতে তাঁর জীবনের শেষ দশকে তিনি দেশের মানুষকে ভাসতে দেখেছেন— সে রাজনীতির উদ্দেশ্য ও পন্থায় তিনি বিশ্বাস করেননি, কিন্তু প্রতি-

পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য বিকল্প হাতিয়ার প্রস্তুত করায় তাঁর উৎসাহ ছিল না। এ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট রাইটার্স এ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে তাঁর সংস্রবকে তিনি যে দৃঢ় মানসিকতায় সংঘর্ষে পরিণত করেছিলেন, বা তারও পূর্বে কালিন্দী-গণদেবতা-ধাত্রীদেবতার আমলে তিনি যেভাবে সমকালীন সমাজমানসের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করেছিলেন, পরিণত বয়সে তাঁর সেই মানসিক দৃঢ়তা লক্ষ্য করা যায় না। বয়স অবশ্যই এর একটা কারণ এবং সেই বয়সের হাত ধরে এগিয়ে এসেছিল অধ্যাত্মপিপাসা—তাই তাঁর শেষ বয়সের অধিকাংশ রচনা স্মৃতিচারণা-মূলক যার প্রেক্ষাপটে তিনি যেন মাঝে মাঝে আত্মরূপ আস্বাদন করেছেন অথবা এমন সব নারীপুরুষ সৃষ্টি করেছিলেন যারা ভোগা-কাঙ্ক্ষায় নিবৃত্ত হয়ে বলতে চেয়েছে—আগে কহ আর। পূর্ব পাকিস্তান, অধুনা বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বাংলাকে কেন্দ্র করে তাঁর 'উনিশ শ একাত্তর' বিরল ব্যতিক্রম।

একালে নানারকম সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অভিঘাতে মানুষের মূল্যবোধ নিরন্তর পরিবর্তিত হচ্ছে। মানুষের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক এবং ব্যাপকতর অর্থে রাষ্ট্র এবং পৃথিবীর সম্পর্কের নতুন নতুন মূল্যায়নের সঙ্গে শিল্পীর দায়িত্ব অনেক বর্ধিত হয়েছে, ভিন্নতর হয়েছে। 'অপূর্ব-বস্তুনির্মাণক্ষমাপ্রজ্ঞা'-সম্পন্ন দৃষ্টি শিল্পীর অবশ্যই থাকা চাই এবং ধ্রুপদী শিল্পীর ক্ষেত্রে অঘটন-ঘটন-পটিয়সী প্রতিভার প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য কিন্তু শিল্পসৃষ্টির মৌল লক্ষণ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে রসিকমহলে দেখা দিয়েছে স্পষ্টত এক দ্বিধা। সঙ্কটে বিভক্ত দুই শিবিরের মধ্যে এই পরস্পর-বিরোধিতার কারণ শিল্পীর চেয়েও মানুষের, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের, অস্তিত্ব নিয়ে নবমূল্যায়নের প্রচেষ্টা। সমাজ বা রাষ্ট্রের উন্নতির ব্যাপারে সাধারণ মানুষের দায়িত্বের গুরুত্ব যাঁদের কাছে অপরিসীম বলে মনে হয়েছে, যাঁরা সমষ্টিগতভাবে জনমণ্ডলীকে দেশকালের উন্নতি-অবনতির মুখ্য শরিক হিসেবে দেখতে চেয়েছেন, তাঁদের কাছে শিল্পীর দায়িত্ব শুধু 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে'

শিল্পসৃষ্টি করলেই মেটে না। একটি ব্যক্তিগত বেদনার বিন্দু থেকে দেশকালাতীত মহাকাব্য সৃষ্টি করলেই সমাজের প্রতি সুষ্ঠু দায়িত্ব পালন করা হয়েছে বলে তাঁরা মনে করেন না।

কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে শিল্পীর নিশ্চয়ই একটা মূলগত পার্থক্য আছে। প্রথমত সাধারণ মানুষের ধরাবাঁধা জীবনচর্যা থেকে শিল্পী স্বতন্ত্র জগতে স্বেচ্ছানির্বাসন মেনে নেন, সেই জগতের তিনি দ্বিতীয় বিধাতা। তাঁর সেই স্ব-সৃষ্ট জগতের আনন্দ-বেদনার তিনি অংশীদার: সেখানে তিনি তাঁর জাগতিক পরিপার্শ্ব থেকে স্বতন্ত্র এবং বহির্জগৎ থেকে অন্তর্জগতে বিচরণেই তাঁর প্রচণ্ড প্রবণতা সুনিশ্চিত। সমাজের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ থাকলেও পরোক্ষে তিনি ভিন্নজগতের অধিবাসী—সেই সীমাহীন চৈতন্যলোকের একক, নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী তিনি, সামাজিক পরিপার্শ্বের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তখন নিশ্চয়ই উদাসীন। 'That other people are going to study it, and to receive experiences from it may seem to him a merely accidental, inessential circumstance. More modestly still, he may say that when he works he is merely amusing himself'.[১] এই 'merely amusing'-এর প্রবণতা বা বাসনাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া একজন শিল্পীর ওপর সামাজিক দায়িত্ব যতই থাকুক না কেন, তাঁর নিজস্ব মনোভঙ্গির ক্ষেত্রে তাঁর স্বাতন্ত্র্য থাকবেই। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমকালীন কথাসাহিত্যিক, একই রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিবেশে উভয়েই লালিত, পদ্মার সঙ্গে কোপাই বা ময়ূরাক্ষীর স্থানিক পরিবেশের পার্থক্য সত্ত্বেও। কিন্তু উভয়ে জগৎ ও জীবনকে দেখেছেন একটা স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে; তারাশঙ্কর প্রশান্ত, মানিক অস্থির, একজনের সমাজ-সংস্কার-চেতনা ঐতিহ্যকে স্বীকার করে, আর একজন বিপ্লবের বাণীবাহক। আবার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যুগলক্ষণে এঁদের সহযাত্রী হলেও মননে যেন এক

স্থিতপ্রজ্ঞ নিসর্গপ্রেমিক কবি, এক শুচিস্নিগ্ধ হৃদয়বান দার্শনিক। সুতরাং সমাজের সঙ্গে সাধারণের যে যোগ, শিল্পীর সঙ্গে সংযোগ কোনোমতেই সেরকম হতে পারে না, এখানেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে শিল্পীর পার্থক্য। তাঁর সৃষ্টি নিঃসন্দেহে 'social act' কারণ 'it is the act of' communicating ideas and emotions by the artist to other men through a specific art medium'.[২]
মার্কস, ডারউইন ও ফ্রয়েডের তিনটি বৈপ্লবিক ঘোষণার পরে মানুষের চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। তৎসহ প্রচুর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের আবিষ্কার, শিল্পবিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব ও রুশবিপ্লব এবং শিল্পীসাহিত্যিকদের প্রত্যক্ষ সহায়তা, উনিশ শতকের প্রারম্ভ থেকে বিশ শতকের মধ্যপাদ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে প্রচুর ভাঙ্গাগড়া, উপনিবেশবাদের প্রসার ও সঙ্কোচন, আফ্রো-এশীয় অনুন্নত দেশগুলির জাগরণ, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সংঘাত, দুইটি বিশ্বযুদ্ধ, অসংখ্য দেশের মধ্যে পারস্পরিক ঠাণ্ডা লড়াই, পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা প্রভৃতি প্রচণ্ড ঘটনাগুলির সংঘাত দেড়শো বছরের পৃথিবীতে শিল্প ও সাহিত্যকে প্রভাবিত, প্ররোচিত এবং নিয়ন্ত্রিত করেছে, অতঃপর শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা বিভিন্ন অভিঘাতে আন্দোলিত সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবর্তনশীলতায় কী পরিমাণ অংশগ্রহণ করবে তা নিয়ে সমালোচক মহলে তুমুল বাদ্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে। দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে তারাশঙ্করকে দেখতে গেলে এই সমালোচনার ঐতিহ্যকে স্মরণ করে এগিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে প্রয়োজন।

ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ মরুভূমিতে উট যেমন বালির মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে, তেমনি পরিপার্শ্বের আলোড়নে শিল্পী উদাসীন থেকে স্বীয় শিল্পসাধনায় নিরত থাকবেন—কলাকৈবল্যবাদীর অভিমত তাই। এ অভিমত প্রাচীন আমল থেকেই চলে আসছে। সক্রেটিসের সমকালীন আল্‌কিদামাস্ রসাত্মক বাক্য সম্পর্কে নির্দ্বিধ হয়ে জানিয়েছিলেন,

'We should reasonably have the same attitude towards them as towards statues of bronze and images of stone and painted protraits. For these are imitations of real bodies and when looked at are a source of delight, but are without utility in the life of men'.[৩] সাহিত্যতাত্ত্বিক অ্যারিস্টটল শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে কোন উদ্দেশ্য বা উপযোগিতাকে স্বীকার করেননি। শিল্পের শ্রেষ্ঠতা বা উৎকর্ষ নিরূপিত হবে সৃষ্টির মানদণ্ডে, তার উদ্দেশ্যের মূল্যায়নে নয়, একথা তিনি জানিয়েছেন।

উদ্দেশ্যবাদের আবির্ভাবের আগের পর্বের শিল্পীরাও যেমন সমাজ-চেতনার দায়িত্বপালন করতে পরাঙ্মুখ ছিলেন, শিল্পবিচারকেরাও তেমনি জানতেন শিল্পী বা সাহিত্যিকের আসল উদ্দেশ্য নয় সমাজচিত্রণ বা পরিবর্তনসাধনের প্রশ্নে সামাজিক দ্বন্দ্ব বা সংঘাতকে পরিবেশন করা। রচনার ক্ষেত্রে সমাজপ্রত্যক্ষতা অবশ্যম্ভাবী নয়, মানুষের আনন্দ-বেদনার রূপায়ণই তাঁর মূল লক্ষ্য হওয়া বিধেয়। শিল্পীকে হতে হবে রসসন্ধানী, তবেই তাঁর শিল্প হবে রসোত্তীর্ণ, তাতে আসবে সর্ব-জনীনতার স্বাদ, সত্তার গভীরে নেমে শিল্প সৃষ্টি করলে সে সৃষ্টি তখন আর স্রষ্টার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে থাকবে না।

কিন্তু আনন্দবাদীদেব এই মনোভঙ্গি ও শিল্পবিচারের পদ্ধতির সঙ্গে উদ্দেশ্যবাদীদের দ্বন্দ্ব শুরু হল উনিশ শতকী র‍্যন্যাসাঁসের যুগ থেকে। কলাকৈবল্যবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ইমান্যুয়েল কাণ্টের যুগ আঠারো শতকের সঙ্গেই অবসিত হল। অবশ্য শিল্পসৃষ্টির ঊষাকাল থেকে কাণ্টের যুগ পর্যন্ত শিল্পীরা নিছক আনন্দের জন্যই সকলে শিল্পরচনা করেননি, নানারকম প্রয়োজনের তাগিদেও অনেকে কলাসৃষ্টিতে উৎসাহিত হয়েছিলেন। 'From the most primitive to the next specialized, sophisticated order of society art has served numerous religions, political and social functions and was so intended by its creators.'[৪] এই ঐতিহ্যের সূত্র ধরেই কিন্তু

উদ্দেশ্যবাদের জন্ম হল। এই মতবাদ জন্ম থেকেই সাবালকত্ব অর্জন করতে পেরেছে, তার কারণ এর পরিপুষ্টি প্রাচীনকাল থেকেই। জীবনের স্থিতিস্থাপকতার গুরুত্বকে এবং সমাজের শ্রেণীভেদের প্রয়োজনীয়তাকে শিল্পের মাধ্যমে বহু শতাব্দীব্যাপী ইতস্তত প্রচার করা হচ্ছিল। অ্যারিস্টটল কলাকৈবল্যবাদের সমর্থক হলেও তিনিও ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্যকে 'সামাজিক' অভিধায় গণ্য করেছেন যেহেতু তদ্দ্বারা গ্রীক নাগরিকদের হৃদয়ে এক নবভাবের উদ্দীপন ঘটানো সম্ভব হয়েছিল। শুধু তাই নয়, সমগ্র 'christian art'-ই তো ঈশ্বরের মহত্ত্বর গৌরবগাথার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে নিয়োজিত থেকে মানুষের মনে আস্তিক্যচেতনার সঞ্চার করেছে, রঙ্গমঞ্চকে বহু শতাব্দী-ব্যাপী বলা হয়েছে 'জনগণের বিদ্যালয়', মহাকবি মিলটন 'প্যারাডাইস লস্ট' লিখেছিলেন 'মানুষকে ঈশ্বরাভিমুখী করার' প্রবণতায়। তাই 'Revue des Deux Mondes 1845' এ ভিক্টর কুঁজা 'L' art pour 'L'art শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করার দিন থেকে এবং ঐ ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে তেওফিল গোতিয়ের 'Mademoiselle de Maunpin' গ্রন্থের ভূমিকায় শিল্পের স্বাধীনতাকে স্বীকার করার পর থেকে এই দুই শিবিরের দ্বন্দ্ব হয়েছে প্রচুর, সংঘাত হয়েছে অবিরত। মাঝে মাঝে শিল্পীরা হয়েছেন দ্বিধাগ্রস্ত, কেউ কেউ পরিবর্তন করেছেন মনোভাব, আবার অনেকে সংঘাতমুখর দুই মনোভঙ্গির মাঝখানে তাঁদের শিল্পিসত্তাকে রেখেছেন একটা ঋজু ও অনমনীয় কঠোরতার আবরণে ঢেকে।

এই দ্বিধাগ্রস্ততার সবচেয়ে চমকপ্রদ উদাহরণ ফ্লোব্যার ও বোদলেয়ার, ভার্ল্যান ও ওয়াল্টার পেটার, এমন কি, অসকার ওয়াইল্ডও। যে গুস্তাফ্ ফ্লোব্যার একদা বললেন 'No great poet has ever drawn conclusion...... paint, paint without theories', তিনিই 'মাদাম বোভারি' সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই সত্যকে ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে গেলেন, এমনকি, তিনি কথাসাহিত্যিকদের দিলেন নতুন

শ্লেষাত্মক বিশেষণ, 'L' Education Sentimentale' বলে মৃত্যুর মাত্র এক বছর আগে লেখা একটা চিঠিতে তিনি যেন কলাকৈবল্যবাদের অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে স্পষ্টভাষায় নিজের মতামত জানিয়ে গেলেন, A'n aesthetico-moral theory—the heart is inseparable from the intelligence. Those, who have drawn a line between the two possessed neither.'

ফ্লোব্যার ও বোদলেয়ার একই দেশে, একই সালে জন্মেছেন, একই সাহিত্যিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে উভয়েই মানুষ, অবশ্য ব্যক্তিগত জীবনে ও রুচির দিক থেকে উভয়ের প্রচুর বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য থাকা সত্ত্বেও। শিল্পের ক্ষেত্রেও ফ্লোব্যারের মতো বোদলেয়ারেরও দ্বিধা ছিল। নৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে লিখতে গেলেই শিল্পসুষমা নষ্ট হবে— এই ধারণা যাঁর, সেই বোদলেয়ার পরবর্তীকালে Aucelle এর কাছে লেখা একটি চিঠিতে স্পষ্টত জানিয়েছেন, 'In that appalling book (Les Fleurs de Mal) I put my whole heart, all my most tender feelings, all my religion (in a disguised form) and all my hatred. Even were I to write to the contrary and swear by all the gods that it was only a composition of pure art of artistic jugglery with words ... I should only be lying like a trooper'.

ভ্যার্ল্যানও যখন কবিদের 'neurotics' অথবা দায়িত্বশীল, এই দুটোর মধ্যে একটা হতে বলেছেন, তখন স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তাঁর মানসিকতা দ্বিরাচারিত্বে পীড়িত, ফরাসী কবি-সাহিত্যিকদের মতো ইংলণ্ডের ওয়াল্টার পেটারও যেন বুঝে উঠতে পারেননি যে, শুধু আনন্দই শিল্পসৃষ্টির উদ্দেশ্য, না সামাজিক শিবচেতনার সঙ্কেত করে দেওয়াই তার লক্ষ্য। উনচল্লিশ বছর বয়সে লেখা 'She dies in the history of the Renaissance' এর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন 'Not the fruit of experience but the experience

itself is the end' এবং কাব্যের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে অন্যত্র জানালেন 'Not to teach lessons or enforce rules or even to stimulate us to noble ends ; but to withdraw the thought for a little while from the mere machinery of life, to fix them, with appropriate emotions, on those great facts in man's existence which no machinery affects'.

অথচ এই পেটারই তাঁর শিল্পচেতনা পরিবর্তন করলেন মাত্র পনের বছরের মধ্যেই। 'Essay on Style' লিখতে বসে তিনি যখন কাব্যের ফলশ্রুতি সম্পর্কে তার রূপান্তরিত ধারণার কথা শোনালেন, তখন মনে হয় তিনি যেন শেলীর সগোত্রীয়। বইটির পাতায় পাতায় যেন এক দূরাগত কণ্ঠস্বর শেষকথা জানিয়ে গেল কাব্যের সামাজিক উপযোগিতা-প্রসঙ্গে যেহেতু তাঁর মতে কাব্য নাকি সহানুভূতি-শক্তি বাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে, দুঃখ দুর্ভোগ দূর করার শক্তি সঞ্চার করে এবং মনুষ্যসমাজকে সেবা করার স্বাধীনতায় উদ্বোধিত করে। যে অস্কার ওয়াইলডের উদার কণ্ঠে একদা ধ্বনিত হয়েছিল, 'No artist has ethical sympathies. An ethical sympathy in an artist is an unpardonable mannerism', অসঙ্কোচে জানিয়েছিলেন, বইয়ের ক্ষেত্রে কোন সুনীতি-দুর্নীতির প্রশ্ন ওঠে না বরঞ্চ লক্ষ্য রাখা উচিত বইটি ভাল লেখা না মন্দ লেখা, সেই উদার শিল্পীও হাউসম্যানের 'A Rebour' বইখানাকে বিষাক্ত বলে বর্জন করেছিলেন। তদানীন্তন রাশিয়ার শিল্পতাত্ত্বিকদের প্রবণতা এ প্রসঙ্গে বিচার্য। অন্যান্য গণতন্ত্রীদের সঙ্গে চেরনিশেভস্কি এবং ডব্রল্যুবভের একটা পার্থক্য ছিল। গণতান্ত্রিক পরিবর্তন বলতে তাঁরা বুঝতেন শোষিত, দাসব্যবস্থার অত্যাচারে বিপর্যস্ত, দরিদ্র কৃষক-কুলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি। জমির মালিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং নির্যাতিত কৃষকসম্প্রদায়ের সুবিধা আদায়—এ দুটো একসঙ্গে কীভাবে করা যায়, তা নিয়ে অন্যান্য গণতন্ত্রীদের মতো

তাঁরা হিসেবের গোঁজামিল খুঁজতে চাননি। সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বৈরতন্ত্রের হাত থেকে সর্বহারাদের সামগ্রিক মুক্তিই ছিল তাঁদের লক্ষ্য, তাই তাঁরা তদানীন্তন গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে একটা নির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন। সমাজের নিম্নতম অর্থনৈতিক স্তর থেকে উচ্চতম আদর্শবাদের পরিধি পর্যন্ত সর্বস্তরে তাঁরা এমন একটি নতুন চেতনার সঞ্চার করেছিলেন যার ফলে প্রতিটি মানুষ যেন তার পারিপার্শ্বিক ও প্রতিবেশীকে নতুন করে চিনতে শুরু করল।

বেলিনস্কিও তাঁদের সঙ্গে একমত ছিলেন: বস্তুবাদী দর্শনভিত্তিক যে কোন নন্দনতত্ত্বের মূল কথা শিল্পমাত্রেই বাস্তবের দর্পণ, তাই সমকালীন বিপ্লবীচেতনার অন্যতম প্রধান প্রবক্তা বেলিনস্কি তাঁর দুই প্রিয় সহকর্মীর মতো বিশ্বাস করতেন: 'That every work of art must be regarded as a product of the social struggle and playing a more or less important part in it. The methodological consequence of this premise is that every work of art is considered as a reflection of social life' (Studies in European Realism, George Lucaks, p. 111) সাহিত্যে বিশ্বজনীনতার স্বাদ আমদানি করে দস্তয়েভস্কির অভিনন্দন পেলেও সমকালীন সমাজমানসকে 'রাশিয়ার বায়রণ' পুশকিন উপেক্ষা করতে পারেননি। পিটার্সবার্গ (বর্তমানে লেনিনগ্রাদ) তার অধিবাসীদের সমকালীন চেহারা নিয়ে সমকালীন অন্যান্য লেখকদের মতো তাঁরও হাতে ধরা পড়েছিল। গোগোলের 'দি ওভারকোট'-এর মুগ্ধ পাঠক দস্তয়েভস্কি 'পুওর ফোক'-এর পাতায় তীক্ষ্ণতর বৈদগ্ধ্যে যেন পূর্বসূরীকে অতিক্রম করে গেলেন, রাশিয়ার প্রথম সামাজিক উপন্যাসের লেখক হিসেবে অর্জন করলেন বেলিনস্কির সপ্রশংস শ্রদ্ধা, এমন কি, তাঁর একপক্ষকাল পরে প্রকাশিত 'দি ডাবল'কে দস্তয়েভস্কি তাঁর পূর্বতন গ্রন্থ থেকে দশগুণ উৎকৃষ্ট

বললেও সমকালীন সমালোচক কন্‌স্টান্‌টিন আক্‌সাকভ যখন বইটির মধ্যে আদ্যোপান্ত গোগোলের প্রভাব আবিষ্কার করেছিলেন তখনও বেলিনস্কি তাঁকে অভিনন্দন জানাতে এগিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁরই পরামর্শে পনর বছর বাদে লেখক বইটিকে সংশোধন করেছিলেন। বেলিনস্কির প্রতি দস্তয়েভস্কির এই সশ্রদ্ধ মনোভাবের কারণঃ 'Dostoevsky accepted Belinsky's injunction that it was the signal duty of Russian Fiction to be realistic and to portray authentically the social and philosophic dilemmas of Russian Life.' এবং এই মনোভাবের ফলেই তিনি সাহিত্য-সহযাত্রী তুর্গেনিভের মতো বিচিত্র উদ্ভট জীবনের চিত্রকর না হয়ে এবং তলস্তয়ের মতো অধ্যাত্মবাদের মধ্যে জীবনযন্ত্রণার প্রশমনে বিশ্বাসী না হয়ে রাশিয়ার তদানীন্তন সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজসচেতন লেখক হিসেবে পরিগণিত হতে পেরেছিলেন।

অতএব স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে শিল্পবিচারের ক্ষেত্রে একটা নতুন মানদণ্ড কলাকৈবল্যবাদের পরিপন্থী মনোভাবকে অবলম্বন করে আস্তে আস্তে রসের দেউলে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব করে নিয়েছে। ক্রমপরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে পা চালিয়ে শিল্পের ঔপযোগিক মূল্য যেন শৈল্পিক মূল্যবোধকে অনেকখানি পিছনে রেখে এসেছে, এবং বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এসে আজ যেন টি. এস. এলিঅটের মতো আমাদেরও মনে হয়, শিল্পবিচারের ক্ষেত্রে আনন্দবাদ বা কলাকৈবল্যবাদ 'more advertised than practised'.

শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যবাদের প্রয়োজনীয়তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছেন আর্নস্ট ফিশার তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ 'The Necessity of Art'-এর প্রথম অধ্যায়ে।* তিনি দেখেছেন, খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন সত্তার সমন্বয়ে হয় একটি পরিপূর্ণ মানুষ—অথচ কোন মানুষই এই পরিপূর্ণতার লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে পারে না। সে চায় তার অসম্পূর্ণতাকে যথাসাধ্য পরিপূর্ণ করে তুলতে, সামাজিক প্রতিবেশের

নিত্যনতুন অভিজ্ঞতায় নিজের চৈতন্যকে সমৃদ্ধ করে তুলতে। বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যা ও শিল্পকলায় সে যখনই আকৃষ্ট হতে যাচ্ছে, তখনই তার একান্ত নিজস্ব ব্যক্তিসত্তাকে বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী করতে গিয়ে তার নিজেকেই অভিজ্ঞতার সীমা বিস্তৃত করতে হচ্ছে। এবং ফিশারের মতে তখনই বৈজ্ঞানিক বা শিল্পীর সমাজ সচেতনতা অপরিহার্য হয়ে উঠছে, সামগ্রিকতার মধ্যে ব্যক্তির অবলোপের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান এবং শিল্পসৃষ্টির নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটছে। অতএব শিল্পের ক্ষেত্রে (বিজ্ঞানের প্রশ্ন আমাদের আলোচনায় অবান্তর) উদ্দেশ্যবাদে ফিশারের কোন সন্দেহ নেই, 'Art is necessary in order that man should be able to recognize and change the world'.[৫] সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক সম্বন্ধে ফিশারের মতো এমিল জোলাও বিশ্বাসী। জোলা অবশ্য উপমাটি অন্যভাবে ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন, মানবদেহের বিভিন্ন কোষ যেমন জীবন-প্রবাহের ক্ষেত্রে পরস্পরের পরিপূরক, সমাজকে গতিশীল করে রাখার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানুষের তেমনি পারস্পরিক সহযোগিতা অনিবার্য। অতএব, শিল্পী সমাজ-সচেতন না হলে মানুষের কথা বলায় তার অধিকার নেই।

শিল্পবিচারের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যবাদ সার্থক প্রতিষ্ঠা পাবার পর শিল্পীর সামাজিক দায়িত্ব পালনের প্রশ্ন যেন অবধারিত হয়ে উঠল। শিল্পে এল নবতন প্রত্যয়, 'Art cannot be separated from social forces in origin, in effect, and in its very nature'.

মার্কস স্পষ্ট ভাষায় জানালেন, রাজনীতি বিচার দর্শন ধর্ম সাহিত্য এবং শিল্প প্রভৃতির উন্নতি নির্ভর করে অর্থনৈতিক প্রগতির ওপর। একথাও তিনি জানালেন—এগুলো পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত, যার মূল ভিত্তি রয়েছে অর্থনৈতিক বনিয়াদের উপর। তলস্তয়ের শিল্পবোধ শিল্পবিচারের ক্ষেত্রে নতুন দিঙ্‌নির্ণয় করালো, 'সংক্রমণতত্ত্বে'র আবিষ্কার করে তিনি শিল্পীদের সামাজিক দায়িত্বপালনের নির্দেশ

দিলেন। স্বকীয় উপলব্ধিকে অন্যের হৃদয়ে সংক্রামিত করে দেওয়ার দায়িত্বই স্রষ্টার লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং এই উপলব্ধিকে তিনি দু'দিক থেকে দেখেছেন, 'the sensations which arise from the recognition of man's filial relation to God and of the brotherhood of men, and the simplest vital sensations which are accessible to all men without exception, such as the sensations of joy, meekness of spirit, alacrity, calm, etc'.[৮] তলস্তয়ের উদ্দেশ্য ও প্রবণতা থেকে যেন শিল্পের নতুন সংজ্ঞা নির্ধারিত হল: 'Art is a means of union among men, joining them together in the same feelings, and indispensable for the life and progress towards the well-being of individuals and of humanity'.[৯] শিল্পসৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে তলস্তয় দীর্ঘ পনের বছর ধরে নন্দনতত্ত্বের সমগ্র ইতিহাস অনুধাবন করে অবশেষে সমকালীন ফরাসী লেখক ভেরোঁর সঙ্গে একমত হয়ে সংক্রমণতত্ত্বের উদ্‌ভাবন করেন। প্রথম জীবনে সমাজবাদ গণতন্ত্র এবং যাবতীয় প্রগতিশীল আন্দোলনের বিরোধী ফ্লোব্যার যেমন পরবর্তীকালে শিল্পের উদ্দেশ্যবাদে আস্থাভাজন হন, তলস্তয়ের চেতনায় তেমন কোন অস্থিরতার পরিচয় নেই।

উদ্দেশ্যবাদের সমর্থকেরা স্বীকার করেছেন যে, বলিষ্ঠ শিল্পসৃষ্টি তখনই সম্ভব হয় যখন কোন শিল্পী সচেতনতার সঙ্গে সামাজিক ঘটনাগুলোর উদয়-বিলয়ের দিকে নজর রাখেন এবং আভ্যন্তরীণ ঘটনাগুলোর সংঘাতে যে পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়, তার সঙ্গে প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে সামঞ্জস্য করে চলেন। কারণ শিল্পীর সৃষ্টি জনসাধারণের সম্পত্তি, সমাজের গতিপ্রকৃতির নির্ণয়ে শিল্পের দায়িত্ব অসামান্য, যেহেতু তা সামাজিক মানুষকে নির্দেশ করে, সচেতন করে, তার বিশ্বাসের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করে। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময়ে দাসত্বপ্রথার বিরুদ্ধে পথে পথে কল্লোলিত জনসমুদ্রের কারণ 'জন

ব্রাউন্‌স বডি' ; রবার্ট ওয়ালপোলের বিরুদ্ধে শ্লেষাত্মক রচনা হিসেবে যে বইটি বাজেয়াপ্ত হয়, সেটির নাম জন গে'র 'বেগারস্‌ অপেরা' ; 'ডন কুইকসোট্‌' শুধুমাত্র উপন্যাসের প্রকরণের ক্ষেত্রেই বিপ্লব আনেনি—মধ্যযুগীয় মন থেকে আধুনিক মননে রূপান্তর ঘটানোয় এর অবদান অসামান্য, উপনিবেশবাদী ইংরেজের স্বপ্ন ও কামনার অভিব্যক্তি 'রবিনস্‌ন্‌ ক্রুশো' আঠারো শতকের বুর্জোয়া সচেতনতাকে পরিশুদ্ধ করেছে, একালে 'ইউলিসিস' এবং 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া মানসিকতার দিকে বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং তিরিশের যুগে শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের বামপন্থায় উদ্বুদ্ধ করে।

সামাজিক গতিপ্রকৃতি থেকে শিল্পীর সরে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। শিল্পীরা যদি নিজেদের ফরাসী নন্দনতাত্ত্বিকদের মতো সমাজ থেকে সরে গিয়ে 'departmentalized human being'[১০] বলে মনে করেন, তাহলে ক্রিস্টফার কড্‌ওয়েলের শাণিত যুক্তিতে তা হবে হাড় থেকে মাংসকে বিচ্ছিন্ন করার অপপ্রয়াসের মতো।[১১]

ক্লারা জেট্‌কিনের সঙ্গে আলোচনাকালে লেনিন শিল্পসম্বন্ধে স্পষ্টভাষায় জানালেন, শিল্পের কাজ হচ্ছে মানুষের অনুভূতি, চিন্তা এবং বাসনাকে সামগ্রিকভাবে রূপ দেওয়া এবং এইভাবে মানুষের উন্নতি করা। প্লেখানভ শিল্পকে দুদিক থেকে কাজ করতে উৎসাহিত করেছেন,—এঁর মতে শিল্প প্রথমত মানুষকে পরস্পরের কাছাকাছি টেনে নিয়ে আসতে পারে, দ্বিতীয়ত, এর দ্বারা একের বিরুদ্ধে অপরকে উত্তেজিত করে সামাজিক সংঘাতের সৃষ্টি করা চলতে পারে। প্লেখানভ-বাঞ্ছিত শিল্পের দ্বিমুখী কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে তলস্তয়ও একমত—'Non-christian art while uniting some people, makes that very union a cause of separation between these united people and others ; so that union of this kind is often a source, not merely of division but even of enmity towards others.'[১২]

তাছাড়া, তলস্তয় জানিয়েছেন, শিল্পের প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব হবে সেই যুগের ধর্মীয় চেতনার উপর। যে সমাজে মানবের পারস্পরিক মিলন এবং ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে একমাত্র সেখানেই ধর্মের মাধ্যমে জীবন একটা অর্থ খুঁজে পেয়েছে। এবং সেই ধরনের সমাজেই চিরায়ত শিল্পরচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে বলে তিনি মনে করেছিলেন।

উদ্দেশ্যবাদের অন্যতম সমর্থক হাক্সলি 'প্রপার স্টাডিজ'-এ সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্পর্কে যে মতামত জানিয়েছেন তাতে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, 'সুন্দর যদি শুধু সৌন্দর্যের জন্যই পূজিত হয়, কোন উচ্চতর নীতিবোধ বা দার্শনিক প্রেরণা এবং উদ্দেশ্য যদি তার ভিতর না থাকে, তাহলে সে সৃষ্টিকে আমরা অবশ্যই নিকৃষ্ট বলব এবং তাকে এড়িয়ে চলা উচিত।' হাক্সলির মতো টমাস মানও শিল্প সম্পর্কে একটি স্পষ্ট অভিমত পোষণ করেন। শিল্পীদের ক্ষেত্রে সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন অস্পৃশ্য নয়, বরঞ্চ তাতে যোগদান করে অভিজ্ঞ হওয়া প্রত্যেক সমাজসচেতন শিল্পীর অবশ্যপালনীয় কর্তব্য বলে তিনি মনে করেছেন এবং ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'দিস ওয়ার' নামক বক্তৃতামালার সংগ্রহে এই অভিমতকে লক্ষ্য করা যায়।[১৩] একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ব্রেখ্ট্‌ও বলেন—'Our theatre must encourage the thrill of comprehension and train people in the pleasure of changing reality. Our audiences must not only hear how Prometheus was set free, but also train themselves in the pleasure of freeing him. They must be tought to feel, in our theatre, all the satisfaction and enjoyment felt by the inventor and the discoverer, all the triumph felt by the liberator'.[১৪]

ফকনারের সাহিত্যাদর্শ একটু স্বতন্ত্র ধরনের। তিনি ঠিক সমকালীন সামাজিক সংঘাতের প্রত্যেকটি সূক্ষ্ম স্তরকে স্পর্শ করতে চান না বটে,

একাশি

কিন্তু অতীত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়ে স্বদেশ ও স্ব-কালের মানুষদের তিনি অনুপ্রাণিত করতে চান। নোবেল পুরস্কার গ্রহণের সময় তাঁর প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ এখানে প্রাসঙ্গিক হিসেবে স্মর্তব্য, 'সমস্ত কিছু অতিক্রম করে মানুষ নিশ্চয়ই পৃথিবীতে টিকে থাকবে, কারণ মানুষের মন আছে, আত্মা আছে, হৃদয় আছে, সে আত্মত্যাগ করতে কুণ্ঠিত নয়। কবি এবং সাহিত্যিকদের কর্তব্য হচ্ছে এই সমস্ত সম্পর্কে লেখা—যাতে এ যুগের মানুষ অতীত যুগের মানুষদের মতো কষ্ট স্বীকার করতে পারে, তার হৃদয় প্রশস্ত হয়, তার বুকে প্রাচীনদের মতো সাহস এবং শক্তি ফিরে আসে, যাতে উপযুক্ত ক্ষেত্রে সে হাসিমুখে আত্মত্যাগে এগিয়ে আসে এবং যে কোন অবস্থায়ই হোক না কেন নিজের মর্যাদা এবং গৌরবময় অতীতের কথা যাতে মানুষ মনে রাখতে পারে।'

সামাজিক ঘটনাবলীর দিকে নজর রাখতে যাওয়া অবশ্য একালের শিল্পী সাহিত্যিকদের পক্ষে একটি প্রবল সমস্যা। প্রাচীনকালের মন্থরতার যুগ আমরা পেরিয়ে এসেছি, রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নেই ধীরগতির কোনো চিহ্ন। জীবনে এসেছে প্রচণ্ড গতিবেগ—এই বেগের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হচ্ছে বর্তমান শিল্পীদের। একটা তীব্র আবর্তের মধ্যে তাঁদের শিল্পিসত্তা বিঘূর্ণিত হচ্ছে—এর সঙ্গে রয়েছে আবার নিজস্ব রাষ্ট্রব্যবস্থার দাবি, কখনো কখনো স্নায়ুবিদারক চাপ যার প্রবল পরাক্রমে শিল্পীর স্বাধীনতা সঙ্কুচিত, কখনো বা অপহৃত। যখনই কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থায় সমাজের বা ব্যক্তির কোনো স্বাতন্ত্র্য থাকে না, তখনই হয় স্বৈরাচারের জন্ম। রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় যদি সমাজের খানিকটা অধিকার স্বীকৃত না হয়, তখনই ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক হয় শিথিল। রাষ্ট্র সেখানে যন্ত্রদানব, সমাজ স্বাতন্ত্র্যহীন, ব্যক্তি অসহায়। সরকারের ওপর আসে পূর্ণ ক্ষমতা, ব্যক্তির অধিকার সেখানে খর্ব, সঙ্কুচিত। সর্বক্ষেত্রে সরকারের উপর পূর্ণ ক্ষমতা দিলে ব্যক্তিস্বাধীনতার আর বালাই থাকে না, অতএব শিল্পীর পক্ষে তা

দুঃসহ এবং ভয়াবহ। কারণ শিল্পসৃষ্টির মূলে স্বাধীনতার প্রয়োজন এবং স্বাধীনতার ব্যত্যয়ে শিল্পে রসহানি অবশ্যম্ভাবী।

হিটলারের আমলে জার্মানীর কথা ধরা যাক। হিটলার হুঙ্কার ছাড়লেন 'The intelligentsia are a useless refuse of the nation' এবং তৎক্ষণাৎ যেন তা প্রতিধ্বনিত হল গোয়েবল্‌সের স্বরচিত উপন্যাস 'মাইকেলে'র নায়কের মুখে 'Intellectual activity has poisoned our people'. অতএব বুদ্ধিজীবীদের সঙ্কট এলো ঘনিয়ে, শিল্পীর স্বাধীনতা হল সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত। হিটলারের শাসনে সমগ্র জার্মানীতে শিল্পীদের একটি মাত্র সংস্থা ছিলো, 'Reich Culture Chamber (Kulturkammer)' যার বাইরে গিয়ে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন চিন্তা করার কোন অবকাশ কারো ছিলো না, আলফ্রেড রোজেন-বার্গের নেতৃত্বে 'National Socialist Community of Culture' নামে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা থাকলেও পরে শ্রমিক-নিয়ন্ত্রিত 'Strength Through Joy' নামক একটি প্রতিষ্ঠান করায়ত্ত করে ফেলে এবং হাল্‌কা ধরনের প্রচারধর্মী নাটক পরিবেশন করে জনসাধারণকে ফ্যাসিষ্ট মনোভাবাপন্ন হতে উদ্বুদ্ধ করে।

নাৎসী-সাহিত্যের কয়েকটি প্রধান লক্ষণ : ১. সমকালীনতাকে অথবা সমকালীন সামাজিক সমস্যাগুলোকে এড়িয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাসে আশ্রয় গ্রহণ, ২. গ্রামীণ জীবনের দুঃখ-দারিদ্র্যের চিত্র না এঁকে নাৎসী কৃষিপ্রকল্পের অগ্রগতিসূচক বর্ণনা, ৩. প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গণ-তন্ত্রবাদীদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা উল্লেখ করে পরবর্তী যুদ্ধের প্ররোচনা এবং ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের প্রশংসায় জাতিকে উজ্জীবিত করে তোলা। নাটকের ক্ষেত্রে সমস্যাসম্পর্কিত বক্তব্য মুছে ফেলে অজস্র বাজে নাটকের সৃষ্টি হল। ১৯৩৬ সালেই ২৫০ খানা ঐতিহাসিক নাটক রচিত ও মঞ্চস্থ হল যেগুলো একেবারেই নাটক-পদবাচ্য নয়। সঙ্গীতের আসরেও পরিবর্তনের সুস্পষ্ট চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়—প্রতিটি সৈনিকের কাছে বোধগম্য করার জন্য কথা ও

সুরের দিক থেকে গানগুলোকে সরল ও সুবোধ্য করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। স্থাপত্যের ক্ষেত্রে বার্লক্ এবং লেম্‌ব্রুক হলেন প্রত্যাখ্যাত, বুর্জোয়া জার্মান জীবনচর্যার তীব্র সমালোচনার ফলে অটো ডিক্স এবং জর্জ গ্রৎস ব্যঙ্গবৈদগ্ধ্যে পারঙ্গম শিল্পী হয়েও নীরব হতে বাধ্য হলেন। সবচেয়ে আশ্চর্য উদাহরণ, বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পী রেমব্রান্টের হাতে যেহেতু ইহুদীরাও সহানুভূতিশীলতার সঙ্গে চিত্রিত হয়, অতএব তিনিও হলেন অপাংক্তেয়।

ছবির ক্যানভাসে শিল্পীদের তুলিতে ধরা পড়তে লাগলো অজস্র সন্তানসহ কৃষকদম্পতি, যুদ্ধের পোষাকপরিহিত কৃষকদের শোভাযাত্রা, শিরস্ত্রাণশোভিত সেনানীকুল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের লোমহর্ষক দৃশ্যাবলী, অশ্লীল ভঙ্গীতে উপবিষ্টা ও শায়িতা নগ্ন নারী, জার্মানীর কয়েকটি অংশের নিসর্গশোভা। উপকরণ ও প্রকরণের ক্ষেত্রে এই কালের চিত্রাবলীর প্রতিক্রিয়াশীলতা সম্পর্কে লিঙ্কন কার্স্টাইন বলেন, ...'literally representational on the most superficial illustrative love, anti-imaginative, anti-psychological, anti-fantastic, and essentially (while pro-natural) anti-realistic'.[১৫] বহিষ্কার, বিরতি বা স্বেচ্ছানির্বাসনে একালের জার্মান এবং জার্মানীস্থ ইহুদী শিল্পীদের নিয়তি নির্ধারিত হয়েছিল।

ইতালিরও একই অবস্থা। হার্বার্ট এল. ম্যাথুসের মতে 'In twenty-one years Fascism (in Italy) has not produced a single great scholar, author or artist. Indeed it has all but killed Italian scholarship and art.'[১৬] ১৯২৯ সালে বেনেদেত্তো ক্রোচে ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন, ইতালির সাহিত্যসৃষ্টির আলো নির্বাপিত।

নাৎসী আমলে শিল্পক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা ও রুচির অবনমনের জন্য শিল্পসৃষ্টির উৎকর্ষ ও পরিমাণ লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পায়। 'অনার্য' সঙ্গীতজ্ঞদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করলে বিশ্বখ্যাত ব্রিটিশ সঙ্গীততাত্ত্বিক

আর্নেস্ট নিউম্যান বলেছিলেন 'Already one is becoming painfully conscious that the standard of German (musical) performance, from conducting to fiddling, is sinking, to one of merely respectable mediocrity'.[১৭] ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে যেখানে ১৩২ খানা পূর্ণ দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল, মাত্র ছয় বৎসরের ব্যবধানে তার সংখ্যা নেমে এল ৯৫তে, লোকসংখ্যার অনুপাতে শতকরা ১২ জন মাত্র দর্শক এই সময়ে জার্মানীতে প্রেক্ষাগৃহে যেতেন, তুলনায় ব্রিটেনের অনুপাত ৪০ জন। ১৯৩২ সালের অর্থনৈতিক সঙ্কটে বার্লিনে ৩০টি রঙ্গমঞ্চ ও অপেরা থাকলেও মাত্র চার বছর বাদে চব্বিশটিতে পরিণত হল। উল্লেখ্য নাট্যকারদের মধ্যে একমাত্র হ্যান্স যোস্তই তখনও লিখছিলেন যাঁর হাত থেকে বেরিয়েছিল 'when I hear the word culture, I slip back the safety catch of my revolver'. স্তেফান জর্জকে নাৎসীরা নিজেদের কবি বলে দাবি করলেও তিনি তা অস্বীকার করেন এবং সুইট্জারল্যাণ্ডে পালিয়ে বেঁচেছিলেন।

১৯৩৬ সালের ২৬শে নভেম্বরে শিল্পবিচারের ক্ষেত্রে নাৎসী নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে গোয়েবল্‌সের ইশ্‌তাহার হিটলারের প্রতিধ্বনির মতো। কারণ হিটলার বলেছিলেন, 'A cultural renascence cannot spend its force in leading articles, in art criticism, in discussions and treatises on art : it must lead to a positive cultural achievement.'[১৮] সমালোচকদের নানারকম লাঞ্ছনার ভয় দেখিয়েছিলেন গোয়েবল্‌স। দমননীতি চালানোর জন্যই সম্ভবত বলা হয়েছিল 'Art discussion should be signed by the author', এই ভীতির কারণ সম্ভবত উনিশ শতকে বেলিনস্কি এবং পরবর্তীকালে চেরনিশেভস্কি, ডব্রল্যুবভ, পিসারেভ, এবং অন্যান্যদের বিপ্লবাত্মক সামাজিক চেতনার সাহায্যে রাশিয়ায় বিপ্লবের প্ররোচনার সৃষ্টি। অত্যাচার, লাঞ্ছনা, শিল্পীদের অধিকারহরণ, পরিমাণ এবং

উৎকর্ষের দিক থেকে শিল্পসৃষ্টিতে প্রভূত ক্ষতি সত্ত্বেও হিটলারের আত্মসন্তুষ্টি লক্ষণীয়—'German architecture, sculpture, painting drama and the rest bring to-day documentary proof of a creative period in art, which for richness and impetuosity has rarely been matched in the course of human history'.[১৯] এই গদ্‌গদভাষণের সময় অবশ্যই মনে রাখতে হবে রেমব্রাণ্টের প্রতি সরকারের বিরূপ মনোভাবের কথা। 'The Lovelie'র মতো বিখ্যাত সঙ্গীতের স্রষ্টা, জন্মসূত্রে ইহুদী, হাইনরিখ হাইনেকে সমকালীন জার্মানের আততায়ী বলতে বা তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করতে দ্বিধা করেনি।

এত বিরাট এবং ব্যাপক আকারে না হলেও সাম্যবাদভীতিগ্রস্ত আমেরিকাতেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অত্যাচারে কম চলেনি। 'Just as Hitler paralyzed the mind of the German people by his demagogy of big lies, so the ruling powers in the United States are trying to achieve the same by anticommunist hysteria'.[২০] রুজভেল্টের আগে আমেরিকার প্রগতিসাহিত্য প্রকাশনায় প্রকাশকদের অসম্মতি দেখা যায়। কিছুটা রাষ্ট্রীয় চাপে পড়ে এবং কিছুটা ব্যবসায়িক চাতুর্যে প্রকাশকবৃন্দ লেখকদের হালকা সাহিত্যরচনায় উৎসাহদান করেছিলেন। ফরাসী কম্যুনিস্ট নেতা রোজার গারুদির ভাষায় পুঁজিবাদী সমাজের লেখকেরা তখন 'কবরখানার সাহিত্য'[২১] তৈরী করছিল। শুধু শিল্পসাহিত্যে নয়, শিক্ষাক্ষেত্রে পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ হয়েছিল, যাতে পরিবর্তনশীল সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়ে মানুষ কোনরকম স্বতন্ত্র মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট না হয়, বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ না হয়। শুধু লিখিত ও অলিখিত আইনের সাহায্যে শিক্ষকদের উপর উৎপীড়ন করেই মার্কিন সরকার ক্ষান্ত হয়নি, কম্যুনিস্ট সদস্য এবং ১৯৪৮ সালের Wallace Presidential Campaign এর উদ্যোক্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের

ছাত্রদের উপর নৃশংস গুলীচালনা তাদের সাম্যবাদ-ভীতির জ্বলন্ত উদাহরণ। রুজভেল্টের যুগে আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা পরিবর্তিত হল। শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতা থেকে রাহুমুক্তি ঘটল, প্রশ্রয় পেল অবাধ স্বাধীনতা ও প্রগতিশীলতা। ফেডারেল থিয়েটারের দর্শক সংখ্যা অপরিসীম বৃদ্ধি পেয়ে দুকোটি থেকে আড়াই কোটিতে দাঁড়াল, ক্রুপদী ও সমকালীন শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি মঞ্চস্থ হল। বিভিন্ন স্থানে মঞ্চের সংস্থাপনা এবং সঙ্গীত ও শিল্পকলার অন্যান্য বিভাগে লক্ষণীয় উন্নতি আমেরিকায় প্রভূত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। যাটটি সম্প্রদায়ের মধ্যে শিল্পকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা, তৎসহ আড়াই কোটি প্রদর্শনী হল; যে দক্ষিণ আমেরিকায় শিল্পকর্মের প্রচলন ছিল না, সেখানেও পরীক্ষামূলক শিল্পপ্রদর্শনীতে প্রায় পাঁচ লক্ষ দর্শক সমবেত হতে লাগল।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু মনীষীর ও বহু রাষ্ট্রের চেষ্টা ও অপচেষ্টায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শিল্পীদের সামাজিক দায়িত্বপালনের পথে কখনো এসেছে প্রতিকূলতা, কখনো তাঁরা পেয়েছেন অনুকূল আবহাওয়া। কিন্তু শিল্পীদের শিল্পসৃষ্টির দায়িত্ব সম্পর্কে লেনিন প্রথম স্পষ্টভাষায় তাঁর অভিমত ব্যক্ত করলেন। ক্লারা জেট্‌কিনের স্মৃতিচারণার[২২] অনুসরণে আমরা শুনলাম লেনিনের উদাত্ত ঘোষণা: শিল্প জনসাধারণের সম্পত্তি। শ্রমিকশ্রেণীর গভীরে থাকবে এর শিকড়। তারা যেন একে বুঝতে পারে এবং এর রসগ্রহণ করতে পারে। তাদেরই অনুভূতি, চেতনা ও বাসনাকে কেন্দ্র করে শিল্পের অবশ্যই রূপায়িত হওয়া উচিত। তাদের মধ্যে যে শিল্পিসত্তা আছে তার জাগরণ এবং বিকাশে এর সহায়তা করা কর্তব্য। লেনিনের নবনিরীক্ষার সূত্র ধরে আমরা জানলাম, অতীতে যে সমস্ত প্রভাবশালী শিল্পীরা জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে যে বুদ্ধি ও কৌশল প্রয়োগ করেছেন, তা বোধগম্য হয়েছিল মাত্র কয়েকজন রসগ্রাহীর। সাধারণ জনতা ছিল অনেক দূরে। এমন কি, তাদের শিক্ষার ও

বুদ্ধিবিকাশের ন্যূনতম সুযোগটুকুও তাদের দেওয়া হয়নি। কিন্তু বিপ্লবোত্তর রাশিয়াতে শিল্পসংস্কৃতিতে জনগণের পূর্ণ অধিকার। লেনিন স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিলেন—'এখন থেকে মানুষের মন এবং প্রতিভার ওপর কোনপ্রকার জবরদস্তি বা কাজ আদায়ের ফন্দি খাটানো চলবে না।' শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে এই নতুন আন্দোলনকে রূপায়িত করতে হলে শিল্পীদের পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি সমাজ-সচেতন হওয়া দরকার, সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়োজন এবং বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার সমাজগঠনের ক্ষেত্রে লেনিন একে সবচেয়ে অগ্রাধিকার দিতে চেয়েছিলেন। এই ঘোষণার পর রাশিয়ায় 'Art for art's sake becomes obsolete, and is replaced by art for the people's sake........The artist becomes the expressive instrument of all the people.'[২৩]

শিক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মানুষের মর্যাদা স্বীকৃত হল—সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের ১১৯ ধারায় বিশ্রামগ্রহণ এবং অবকাশ-যাপনের অধিকার, ১২১ ধারায় শিক্ষার্জনের অধিকার এবং ১২২ ধারায় অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে প্রত্যেকটি নাগরিকের সম-অধিকার স্বীকৃত হল।

লেনিনের শুভ-কামনার ও সদিচ্ছার মূর্তি যেন জীবন্ত হয়ে উঠল গোর্কিতে। এর কারণ নিহিত ছিল গোর্কির জীবনে এবং তাঁর ব্যক্তিত্বে ও প্রবণতায়। লেনিন এবং স্ট্যালিনের ব্যক্তিগত বন্ধুতায় আবদ্ধ, কারাগার এবং নির্বাসনের দিক থেকেও তাঁর জীবনে লাঞ্ছনা হয়েছে প্রচুর। তবু ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের জন্মলগ্নে এবং ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি এবং অক্টোবর বিপ্লবের অগ্নিক্ষরা দিনে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান পুরোহিত, এমন কি, সেই যজ্ঞে সমিধ যোগানোর দায়িত্ব ছিল তাঁর। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না, কোনো দেশে বিপ্লব বা গৃহযুদ্ধ বা বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণের সময়ে সেই দেশের শিল্পী-সাহিত্যিকদের যে দায়িত্ব থাকে, অপেক্ষাকৃত শান্ত এবং ঋজু সামাজিক

পরিবেশে সে দায়িত্বের চেহারা যায় পরিবর্তিত হয়ে। তখন শিল্পীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঠিক একমুখিনতায় পর্যবসিত হয় না, স্বকীয় মানসিক প্রবণতায় ও দৃষ্টিভঙ্গিতে শিল্প বিভিন্ন রূপে বা চেহারায় ফুটে ওঠে। তাছাড়া, বিপ্লব বা যুদ্ধের পর অপেক্ষাকৃত শান্ত পরিবেশে সামাজিক মানুষ হিসেবে শিল্পী সামগ্রিকভাবে সমস্ত অতীত ঘটনাগুলোকে যুক্তি দিয়ে, বিচার ও বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারে। সেখানে সে প্রচলিত সামাজিক ন্যায়নীতির সমালোচনা করতে পারে, একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্নে জীবনের সমস্ত সমস্যাগুলোকে সামঞ্জস্য করে চলার গতানুগতিক রীতিকে বর্জন করতে পারে। সাধারণ নাগরিকেরা দেশের উন্নতির জন্যই হোক বা দেশনায়কের নির্দেশকে বা সরকারের শাসনক্ষমতাকে অমান্য করার অনীহাতেই হোক—একটা ছক-বাঁধা সামাজিক রীতিনীতিকে স্বীকার করে চলতে পারে, কিন্তু অসুবিধা হয় শিল্পীদের ক্ষেত্রে। কারণ প্রত্যেক শিল্পীর চিন্তাধারা জন্ম নেয় অভিনবত্বে, তাঁর বৈশিষ্ট্য বিদ্রোহী মনোভাবে, তাঁর অস্তিত্ব নিঃসঙ্গতায়, সার্থকতা জীবন ও জগতের গতানুগতিকতার জয়গানে নয়, নবতন মন্ত্রের উচ্চারণে।

এই দিক থেকে বিচার করলে, বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় শিল্পীদের স্বাধীনতা যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সাহিত্যে জনগণের অধিকার সর্বত্র স্বীকৃত কিন্তু জনগণের জন্য সাহিত্যরচনার দায়পালন স্বাধীনচেতা শিল্পীরা অবশ্যকৃত্য বলে মনে না-ও করতে পারেন। সামাজিক মানুষ হিসেবে শিল্পীদের দায়িত্বপালন কর্তব্য বলে বিবেচিত হতে পারে কিন্তু সামাজিক প্রগতির জন্য প্রচারমূলক সাহিত্যসৃষ্টি না করলে তিনি কোনোমতেই অপাংক্তেয় হতে পারেন না। রাষ্ট্রের মধ্যে বিশৃঙ্খলার প্ররোচনা সৃষ্টি করা কোনো সৎ শিল্পীর অবশ্যকৃত্য নয়, কিন্তু নাগরিক সততার দোহাই দিয়ে তাঁকে সমালোচনার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু রুশ সরকার শিল্পীদের স্বাধীনতা স্বীকার করেননি—প্রমাণ, মায়াকভস্কি,

এসেনিন এবং মারিনা স্‌ভেটাইয়েভার আত্মহত্যা, আইজাক বাবেল এবং বরিস পিলনাইয়িক-এর অন্তর্ধান, জিনাইডা হিপ্পিয়াস, মেরে-জকহ্‌ভস্কি এবং আইভান বুনিনের দেশত্যাগ, ইউজীন জামিয়াল্টীনের নির্বাসনে মৃত্যু, এলিঅট প্রমুখ পশ্চিমীদের রচনাকে যিনি বানর-হায়েনার চিৎকারের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন মাত্র কয়েক বছর আগে সেই ফাডাইয়েভ-ও আত্মহত্যা করেছেন ১৯৫৪ সালে। 'বিপ্লবের অব্যবহিত পরে মনে হয়েছিল, আধুনিক পশ্চিমী চিত্রকলায় মস্কো একটি পীঠস্থান হয়ে উঠবে, কিন্তু সে আশাও চুরমার হতে দেরি হয়নি। কান্ডিন্‌স্কি ও শাগাল দু'জনেই সোৎসাহে স্বদেশে ফিরে যান, সরকারী কর্মভারও গ্রহণ করেন, কিন্তু কিছুদিন পরে আবার আমরা তাঁদের দেশান্তরী দেখতে পাই।'[২৪] ঔপন্যাসিক ষ্ট্রেলনিকভকেও আত্মহত্যা করতে হয়েছিল এবং সর্বশেষে পাস্তেরনাক মৃত্যুর মাধ্যমে যেন শিল্পীর স্বাধীনতার মূল্য দিয়ে গেলেন। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত সল্‌ঝেনিৎসিনও নিজের দেশের সরকারের রোষানল থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেননি।

এই দীর্ঘ আলোচনায় দেখানো গেল, স্বেচ্ছায় হোক কিংবা রাষ্ট্রীয় শাসনপাশে আবদ্ধ হয়েই হোক, সামাজিক-সচেতনতার দায় থেকে কখনো শিল্পীরা মুক্তি পাননি। তাঁদের সৃষ্টি হয়তো কখনো কখনো বিশেষ দেশকালের গণ্ডীতে অনাদৃত বা লাঞ্ছিত হয়েছে, কিন্তু তাতে চিরায়ত শিল্পের অপমৃত্যু ঘটেনি। তাছাড়া কোনো বিশেষ রাষ্ট্র বা সংশ্লিষ্ট সামাজিক অবস্থার আনুকূল্যে কোনো শিল্পী যদি উৎসাহ-বোধ না করেন, তাহলেও তাঁকে পলায়নবাদী বলা চলে না কারণ তিনি সংশ্লিষ্ট দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির সমালোচনা করতে পারেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের গত একশো বছরের ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র উদ্ধৃতির সহায়তায় দেখান হল :

'উনিশ শতকে শিক্ষিত বাঙ্গালি এমন কেউ ছিলেন না যিনি দেশের

আয়ুষ্কাল উনিশ শতকের অন্তর্ভূ'ত' সেই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে 'ঐতিহ্য-রক্ষা অনিবারণীয় ছিলো।' কিন্তু তিনি বঙ্কিমের মতো মনোরঞ্জন-জনিত লোকশিক্ষার সূত্রকে সর্বান্তঃকরণে মানতে পারেননি, কারণ, 'তরুণ বয়সেই অন্য এক আদর্শের সন্ধান পেয়ে, সারা জীবনে তার আহ্বান ভুলতে পারেননি। ফলত, তাঁর রচনাস্রোত দুই ভিন্ন ধারায় নিঃসৃত হয়েছিল, তার একটিকে আমরা বলতে পারি পোশাকি, সরকারি, গণসম্মত, অন্যটি তাঁর আপন ও গোপন, তার অন্তঃসার'।[২৭]

রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই দ্বৈতরূপের একটি বিশেষ কারণ ছিল; বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়, একদিকে তিনি সাম্রাজ্যবাদের সক্রিয় ও প্রতিশ্রুত শত্রু, অন্যদিকে শিল্পী ও মরমী, একদিকে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারক অন্যদিকে সৌন্দর্যপ্রেমিক, একদিকে নব্যভারতীয় জাতীয়তাবাদের মুখপাত্র ও অন্যদিকে তিনি মহাকবি। কিন্তু আমাদের আলোচ্য লেখক তারাশঙ্কর? তাঁর সাহিত্যরচনার ভৌগোলিক পরিধি তো রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্বব্যাপ্ত নয়, তিনি তো রবীন্দ্রনাথের মতো পরাধীন বা স্বাধীন ভারতের সর্বজনমান্য দ্বিতীয়-রহিত মুখপাত্র নন। তবু শিল্পের ক্ষেত্রে প্রচারবাদে বিশ্বাসী না হয়েও তিনি সামাজিকতার দায়িত্ব সবদা এড়াতে পারেননি তার কারণ সমাজধর্মের মূল্য সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। দেশ-কাল-রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজব্যবস্থার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে এবং সমাজ-অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির যে এ-ব্যাপারে সক্রিয় সহযোগিতামূলক ভূমিকার দরকার আছে, একথা তিনি অস্বীকার করেননি।

প্রত্যেক সামাজিক মানুষকে তিন রকম শাসনপাশ আজীবন বহন করতে হয়। দেশাচার, নৈতিক-শাসন ও রাজ-শাসন। দেশাচার এবং নৈতিক শাসন মেনে চলার অর্থ সমাজনীতির প্রতি আনুগত্য এবং রাজশাসনের সংজ্ঞা হচ্ছে রাজনৈতিক সচেতনতা। প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে এই দুই নীতির একেবারে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। 'সাহিত্যের

সত্য' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত 'আধুনিক সাহিত্য ও সমাজ' প্রবন্ধে তারাশঙ্কর নির্দ্বিধায় এই মত পোষণ করেছেন, 'রাজনীতি সমাজ-নীতির সঙ্গে স্থান কালের যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সূর্য স্থির আছে, গতিশীল পৃথিবী বিবর্তিত হচ্ছে, চলছে, ফলে বর্ণে ও উত্তাপের বিভিন্নতায় প্রভাত ও সন্ধ্যার লীলা রূপান্তরিত হচ্ছে—কালো জলের বুকে পদ্মের পাপড়ি খুলে যাওয়া এবং মুদিত হওয়ার মধ্যে। মানুষের জীবনলীলাও তো তেমনি ধারা সাময়িক রাজনীতি, সমাজনীতির সঙ্গে আপেক্ষিক।'

প্রচারবাদে বিশ্বাসী না হয়েও তারাশঙ্কর এই আপেক্ষিকতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, পরিপার্শ্বের পরিপ্রেক্ষিতে যে বিশ্বস্ততা একান্ত স্বাভাবিক। তবে তিনি ওয়েল্‌সের মতো সামাজিক অর্থনৈতিক, নৈতিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে কোনো তাৎপর্যমূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিশ্বাসী, না গল্‌স্‌ওয়ার্দির মতো সমাজজীবনের ঐতিহ্যাশ্রয়ী সব কিছুকে সমস্ত শক্তিকে লালন করতে চেষ্টিত, তা অনুধাবন করা যাবে তাঁর সাহিত্যকর্মের বিশ্লেষণে। তার আগে তাঁর সমকালীন স্বদেশ ও সাহিত্যের পটভূমি অনুধাবন করা প্রয়োজন।

৫

সমকালীন স্বদেশ ও সাহিত্য

তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবনের আদিপর্বে বাংলার সাহিত্যমানসে ক্ষুৎপীড়িত নরনারীর যন্ত্রণাকাতর বাস্তব জীবনচিত্রণের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য বোয়ার ও হামস্থুন আমাদের দেশে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাহিত্য, বিশেষত স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান সাহিত্যের প্রতি তিরিশের যুগের বাঙালী লেখকেরা অসামান্য কৌতূহলী ছিলেন। কৌতূহলের প্রধান কারণ, এই কালের লেখকদের উপকরণ গতানুগতিক পথ থেকে সরে এসে সমাজের নিম্নতম স্তরে দৃষ্টিপাত করেছিল। এতদিন সাহিত্যে সাধারণত মধ্যবিত্ত সমাজকেই রূপায়িত করা হত কিন্তু এখন থেকেই শিল্পীর চোখে নতুন মহিমায় ধরা পড়ল অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরা, বিশ্বব্যাপী শিল্পীমহলে ধ্বনিত হয়ে উঠল জাগ্রত জনকল্লোল। বিয়ার্ণসন, লেগারলফ এবং হামস্থুনের শিল্পিসত্তাকে উদ্বোধিত করল সাধারণ মানুষ; জেলে, মুটে, মজুর ও কৃষক সম্প্রদায় তাদের সুখ দুঃখ, প্রেম ও প্রত্যয়, আশা ও হতাশা নিয়ে ধরা পড়ল এঁদের চোখে, নৃতাত্ত্বিক

দৃষ্টিকোণ থেকে এঁরা অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষকে বিশেষত কৃষক-সমাজকে বুঝতে চাইলেন। কৃষকদের ব্যক্তিগত তথা গোষ্ঠীগত জীবন নিয়ে উৎকৃষ্ট সাহিত্যরচনা করলেন ইতালিতে গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা, পোল্যাণ্ডে স্তাডিসলাস রেমণ্ট, রাশিয়ায় আইভান বুনিন ও ম্যাকসিম গোর্কি, আমেরিকায় পার্ল বাক, উইলা ক্যাথার এবং ষ্টাইনবেক। বাল্যবয়স থেকেই সুদূর চীনে থাকার ফলে পার্ল বাক চীনা কৃষকদের জীবনকথা লিখলেন 'দি গুড আর্থ'-এর পাতায়, শিল্পের ক্রমোন্নতির সঙ্কটে আক্রান্ত আমেরিকার কৃষক সমাজের অসহায়তা ফুটে উটেছে স্টাইনবেকের 'দি গ্রেপস অফ র‍্যাথ', 'ইন ডুবিয়াস ব্যাটল' এবং টু এ গড আননোন'-এ, বিংশ শতাব্দীর কৃষক সমাজের উৎকৃষ্ট দলিল লিপিবদ্ধ করলেন রেমণ্ট তাঁর বৃহত্তম রচনা 'দি পেজাণ্টস'-এর চার খণ্ডে। শুধু তাই নয়, কৃষক সমাজকে নিয়ে কালজয়ী রচনার স্বীকৃতি হিসেবে রেমণ্ট, বাক, বুনিন, দেলেদ্দা ও স্টাইনবেক পেলেন আন্তর্জাতিক অভিনন্দন, নোবেল পুরস্কার।

নরওয়ের যোয়ান বোয়ারের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তাঁর 'দি গ্রেট হাঙ্গার', 'লাষ্ট অফ দি ভাইকিংস' এবং 'দি এভারলাস্টিং ষ্ট্রাগল'-এর পাতায় তিনি কৃষক সমাজের সঙ্গে ধীবর সম্প্রদায়কে অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। একই দেশের ট্রিগবি গুলব্রানসেন চাষীদের সঙ্গে পাহাড়ী অঞ্চলের শিকারীদের কথাও বলেছেন 'বিয়ণ্ড সিং দি উড্স্' এবং 'দি উইণ্ডস্ ফ্রম দি মাউণ্টেন্স্'-এ। সুইডেনে উইলিয়ম মলবার্গ, ভার্নার ভন হাই-ডেনষ্ট্যাম ও গুস্তাভ হেলষ্টামের রচনাতেও একই ধারা গৃহীত হয়েছে; সিগ্রিড উনসেট ত্রয়োদশ শতাব্দীর কৃষক সম্প্রদায়ের চিত্র আঁকলেন 'দি একস্'-এ, ওঁর তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ সুবিশাল রচনা 'ক্রিস্টিন লাভরান্সডাটার' চতুর্দশ শতাব্দীর কৃষক সমাজের পটভূমিকায় রচিত, অসামান্য কৃতিত্বের জন্য তিনি আন্তর্জাতিক সম্মান নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন।

ফিন্‌ল্যাণ্ডের আনটো সেপানেস এই সম্মান না পেলেও ফ্রান্সে এমিল সিলান্‌পা নোবেল পুরস্কার পান ফিন্‌ল্যাণ্ডের কৃষক সমাজের উপর তাঁর লেখা অনবদ্য উপন্যাস 'মেড সিলজ্' এবং 'মিক হেরিটেজ'-এর জন্য। অপেক্ষাকৃত পূর্ববর্তী কালে রচিত হাউপট্‌ম্যানের 'দি উইভার্স' (১৮৯২ খ্রীস্টাব্দ) নাটকটির কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। হাউপট্‌ম্যানের পিতামহ ছিলেন তাঁতী। সাইলেসিয়ার তন্তুবায় সম্প্রদায়ের দুঃসহ দৈন্য ও বিদ্রোহের ঘটনাবলীকে আশ্রয় করে রচিত তাঁর এই চতুর্থ নাটকে এক ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। গোষ্ঠী ও সমাজ-চিত্রণের প্রথম বলিষ্ঠ ও সার্থক সৃষ্টি হিসেবে বিশ্বসাহিত্যে এই নাটকটি স্থায়ী সংযোজনরূপে চিহ্নিত।

সাহিত্যের এই ধারার সঙ্গে তারাশঙ্করের পরিচয় ছিল না, কিন্তু এই ধারার যোগসূত্রে বাংলা সাহিত্যকে গ্রথিত করেছিলেন তিরিশের দশকের লেখকেরা, বিশ্ব-সাহিত্যের মর্ম-মধুকর কল্লোলীয়েরা। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষপ্রভাবে এঁদের দ্বারা তারাশঙ্কর প্রভাবিত হয়েছিলেন। এর প্রকৃষ্টতম উদাহরণ, রবীন্দ্রনাথের ভক্ত এবং শরৎচন্দ্রের অনুরাগী তারাশঙ্করের শিল্পিসত্তায়—প্রথম যে রচনা দু'টি অনুরণনের সৃষ্টি করেছিল, তা হল প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পোনাঘাট পেরিয়ে' এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'জনি ও টনি' গল্প। সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সাহিত্যের প্রাঙ্গণে একই পংক্তিতে বসানোর আয়োজনের ক্ষেত্রে তাই তিনি সমকালীন বিশ্বসাহিত্যের ঐতিহ্য এবং বাংলাসাহিত্যের ঐকান্তিক আকুলতাকে হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া, কল্লোলীয়দের সঙ্গে তাঁর সহমর্মিতার নিগূঢ়তম কারণ তাঁর দুঃখচেতনার মধ্যে নিহিত ছিল; 'আসলে কল্লোলীয়দের রচনায় জীবনের যে নিষ্ঠুর কঠিনতার উদ্ঘাটন ছিল, মানুষের বিড়ম্বিত ব্যর্থতার যে পরিচর্যা ছিল, প্রকৃতিবাদী দৃষ্টিতে যে অনাবৃত আদিমতার উৎসসন্ধান ছিল, তারাশঙ্কর সেইখানেই সত্যিকারের আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন।'[১] তারাশঙ্কর তাঁর

সাহিত্যজীবনের প্রথমপর্বে এমন কয়েকখানি উপন্যাস রচনা করেছেন যেখানে সমকালীন রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রশ্নগুলিকে তিনি যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছেন। শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্করের মধ্যে একটা আশ্চর্য বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। শরৎচন্দ্র তাঁর জীবনের উত্তরার্ধে রচিত 'পথের দাবী' ও 'শেষ প্রশ্ন'তে মূলত রাজনীতি ও সমাজনীতির পটভূমিকায় কাহিনী সৃষ্টি করেছিলেন এবং তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির প্রথমপর্বের উপন্যাসগুলিতে রাজনীতি-অর্থনীতির প্রশ্নগুলিকে পরিবর্তনশীল সমাজের পটভূমিকায় বুঝতে চেয়েছিলেন। অতএব তিরিশ এবং চল্লিশের দশকে আমাদের সমাজ-জীবনে যে ঘটনাগুলি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, সেগুলি বিচার্য।

একদিকে শাসনের নামে ইংরেজ সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা অন্যদিকে কংগ্রেসের উপদলীয় কোন্দল এবং আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা চিন্তাশীল মানুষের মনে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। তৎসহ ছিল ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে শোচনীয় মন্দার ভাব, শিল্পের উৎপাদন প্রচণ্ড হ্রাস পেয়ে জাতীয় অর্থনীতিতে একটা গুরুতর বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছিল—কৃষিপ্রধান ভারতকে শিল্পায়নের পথে এগিয়ে নিতে গিয়ে এই প্রচণ্ড ধাক্কার ফলে পরবর্তী পাঁচবছর সরকার প্রায় কোন পরিকল্পনাতেই হাত দিতে পারেননি। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে জাতীয় প্রকল্প সমিতির প্রতিষ্ঠার ফলে শিল্পক্ষেত্রে আশার আলো দেখা গেলেও যুদ্ধের জন্য সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসের বিরোধিতায় মন্ত্রিসভার পদত্যাগের ফলে কাজ বিলম্বিত হল। যুদ্ধের পরে বম্বে প্ল্যান, পিপল্‌স প্ল্যান এবং গান্ধীয়ান প্ল্যান নামক তিনটি প্রকল্প গ্রহণ করে ভারতের অর্থ নৈতিক বনিয়াদকে এক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপনের প্রচেষ্টা চলে। যুদ্ধকালীন শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারত ক্রমশ এগিয়ে যেতে থাকে, তবে এই সময়ে ভারতীয় অর্থনীতিতে আঘাত হানে বস্ত্র ও খাদ্যসমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সরকারী

প্রশাসনের নিদারুণ ব্যর্থতা ভারতের পুঁজিবাদী শ্রেণীর অন্তর্গত শিল্পপতি জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচারের সঙ্গে একত্রিত হয়ে লক্ষ লক্ষ নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র মানুষের অবর্ণনীয় দুর্দশার সৃষ্টি করে। 'গণদেবতা' এবং 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'য় এই অত্যাচারের অতিবাস্তব চিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তারাশঙ্কর। ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে ভয়াবহ মন্বন্তরের ফলে বাংলাদেশে গুরুতর বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল, স্যার জন উডহেডের সভাপতিত্বে মাত্র দু বছরের মধ্যেই তার যে বিবরণী প্রকাশিত হয়, সেখানে দ্ব্যর্থহীনভাবে লিপিবদ্ধ আছে 'It has been for us a sad task to enquire into the course and causes of the Bengal famine. We have been haunted by a deep sense of tragedy. A million and a half of the poor of Bengal fell victim to circumstances for which they themselves were not responsible. Society, together with its organs, failed to protect its weaker members. Indeed, there was a moral and social breakdown, as well as an administrative breakdown.'

১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত 'মন্বন্তর' উপন্যাসে তারাশঙ্কর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন কলকাতার বিভীষিকাময় পরিবেশের রূপায়ণে প্রচুর বাস্তব তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কঙ্কালসার অগণিত নরনারীর খাদ্যের সন্ধানে কলকাতায় আগমন, খাদ্যবণ্টনের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণপ্রথার ফলে জনসাধারণের অপরিসীম দুর্দশা, গান্ধীজির একুশদিনব্যাপী অনশনের ফলে দেশব্যাপী রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা বাস্তবতার সাথে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তবে, 'লেখক দৈনিক সংবাদপত্র হইতে সংবাদ সংকলনে অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইয়া এই চমৎকার ঔপন্যাসিক সম্ভাবনাটির অকালমৃত্যু ঘটাইয়াছেন। তিনি সদ্য-জনপ্রিয়তার মোহে আত্মসমর্পণ করিয়া ঔপন্যাসিকের উচ্চ চূড়া

হইতে সাংবাদিকতার (journalism) সমতলভূমিতে অবতরণ করিয়াছেন।'[২]

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে যে সমস্ত সমস্যা আমাদের রাজনীতি ও সমাজ-নীতিকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করেছিল, হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা তার মধ্যে অন্যতম প্রধান বিষয়। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির মাত্র এক বছর আগে কলকাতার বুকে যে ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা হয়েছিল, তা তদানীন্তন প্রতিটি চিন্তাশীল নাগরিককে চিন্তিত করে তোলে। আমাদের সমাজগঠনে মুসলমান সম্প্রদায়ের ভূমিকা এবং ঐ সম্প্রদায়ের প্রতি তারাশঙ্করের মনোভাব বিশ্লেষণ করলে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার জটিলতা কিছুটা উপলব্ধি করা যেতে পারে।

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে নবাব সলিমুল্লা কর্তৃক ঢাকায় মুসলীম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। জন্মলগ্ন থেকেই লীগ শুরু করেছিল কংগ্রেসের বিরোধিতা। দেশের উত্তাল জনসমুদ্রের স্বদেশ-চেতনাকে উপেক্ষা করে তাঁরা অর্থাৎ মুসলীম লীগের সদস্যেরা বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব সমর্থন করলেন এবং ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্যবর্জনের বিরোধিতায় তাঁরা তদানীন্তন সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট হওয়ার সুযোগ পেলেন। এর পুরস্কার হিসেবে, বঙ্গভঙ্গ-প্রস্তাব সরকার রদ করতে বাধ্য হলেও মুসলীম প্রার্থীদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়েছিল। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির জন্য নানাবিধ রাজনৈতিক অপপ্রয়াস চলতে থাকে। ইতিপূর্বে মুসলীন নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে স্বায়ত্তশাসনের ধুয়ো তুলে আর একবার রাজনৈতিক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেন। কিন্তু এই সময় তুরস্কের সঙ্গে বৃটেনের যুদ্ধের ফলে এদেশীয় মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব দেখা দেয় এবং ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে লক্ষ্ণৌ-এর এক অধিবেশনে কংগ্রেস এবং লীগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে লক্ষ্ণৌ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটে।

সরকারের প্রচণ্ড দমননীতির ফলে পরবর্তী সাত বছরের মধ্যেই সমস্ত

রাজনৈতিক আন্দোলন সাময়িকভাবে থিতিয়ে আসে, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মধ্যে আবার অবনতি ঘটে। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে পুনরায় নানাস্থানে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হতে থাকে, মুসলীম লীগের বিরুদ্ধে মুসলীম জাতীয়তাবাদীদের নিয়ে কংগ্রেস একটি প্রতিরোধ সংস্থা গড়ার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। এরপর সাইমন কমিশন বর্জনের ফলে যদিও সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি কাছাকাছি এল, কিন্তু ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে সর্বদলীয় সম্মেলনে মিঃ মহম্মদ আলি জিন্না কর্তৃক মুসলীমদের জন্য স্বতন্ত্র অধিকার দাবী করায় পুনরায় বিরোধিতার সূত্রপাত ঘটে। এক বছরের মধ্যে মিঃ জিন্না সারাভারত মুসলীম অধিবেশন আহ্বান করেন স্বতন্ত্র অধিকার দাবীর জন্য এবং ঐ বছরের শেষেই চৌদ্দ দফা দাবী-সম্বলিত এক সনদ পেশ করা হল জরুরী প্রয়োজনে আহূত অন্য একটি অধিবেশনে। এই সময়ে মিঃ জিন্নার কণ্ঠে সাম্প্রদায়িকতার সুর স্পষ্টভাবে ধ্বনিত হয়: 'Muslims can expect neither justice nor fair play under Congress Government,' এবং এই কারণেই ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে কুখ্যাত ভারত আইন পাশ হওয়ার ঠিক অব্যবহিত পরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। হিন্দু মুসলমান—দুই সম্প্রদায়েরই অশিক্ষিত সরল ও নিরীহ জনসাধারণ রাজনৈতিক মৃগয়ার শিকার হন। এর পিছনে অবশ্য সরকারী প্ররোচনাও প্রচুর ছিল। অথচ এই নেতাই (মিঃ জিন্না) একদা গান্ধীজির দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন যখন গান্ধীজি খিলাফৎ আন্দোলনে মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

তারাশঙ্কর ইতিমধ্যেই আমাদের সাহিত্যজগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। 'ত্রিপত্র' ছাড়া ভারত-আইন পাশের পূর্বে তাঁর 'চৈতালী ঘূর্ণি', 'পাষাণপুরী', 'নীলকণ্ঠ', এবং 'রাইকমল' ব্যতীত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কয়েকটি গল্পও প্রকাশিত হয়। সেগুলিতে দু'একটি টাইপ চরিত্র সৃষ্টি

ছাড়া তিনি মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কে একান্ত নীরব। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা পঁয়ত্রিশ—অথচ এই বিপুল রচনার মধ্যে অতি সামান্য কয়েকটি চরিত্রসৃষ্টি ব্যতীত তারাশঙ্কর মুসলমান সমাজের প্রতি দৃক্‌পাত করেননি, 'হিন্দু মুসলমান সমস্যা' এবং 'কলকাতার দাঙ্গা ও আমি'র মতো দুটি বক্তব্যপ্রধান গল্প লিখলেও সেগুলি আবেগসর্বস্বতা এবং অগভীর চিন্তার পরিচয়বাহী। অথচ, ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে, মাঝে মাঝে, বিশেষত '৪৬, '৫০, '৫৪ ও '৬৪ সালে এই পশ্চিমবাংলা, এমন কি, কলকাতার বুকের উপর প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটেছে এবং অনবরত একটা পারস্পরিক অবিশ্বাস যেন এতে ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে। তৎসহ আছে দেশবিভাগের শোচনীয় কুফল। ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক চাপে সমাজ নিদারুণ বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। এইসব মর্মান্তিক এবং সুদূরপ্রসারী ঘটনা তারাশঙ্করকে গভীরভাবে ভাবিয়েছে বলে মনে হয় না।

তাছাড়া, স্বাধীনতার পর প্রায় ষোল বছর অতিক্রান্ত হল। অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষিপ্রধান দেশকে দ্রুত শিল্পায়নের পথে নিয়ে যাওয়া, ভাষাভিত্তিক প্রদেশ পুনর্গঠন, কংগ্রেসের আবাদী অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা, বৈদেশিক নীতির দিক থেকে জোটনিরপেক্ষতা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাস, আফ্রো-এশীয় দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সৌহার্দ্য, বান্দুং সম্মেলনের পর ভারতের জনপ্রিয়তা, রাজনৈতিক দৃঢ়চিত্ততার অভাবে জনপ্রিয়তা হ্রাস, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিশেষত রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব, চারটি সাধারণ ও একটি মধ্যবর্তী নির্বাচন এবং তজ্জনিত রাজনৈতিক ভাঙ্গাগড়া, একক বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ভাঙন, বাংলাদেশে মার্কসবাদী দলগুলির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং চৌদ্দটি বামপন্থী দলের মিলিত সংস্থা যুক্তফ্রন্ট কর্তৃক সরকারগঠন, যুক্তফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা ও

কংগ্রেসের পুনরাবির্ভাব, রাজনৈতিক দলাদলি ও পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক গণহত্যা এবং শিল্পে মন্দাভাব ও শ্রমিক আন্দোলন পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রী রাষ্ট্র ভারতবর্ষের কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা। কিন্তু স্মরণীয়তম ঘটনা বোধ হয় স্বাধীন ভারতবর্ষে তিনটি যুদ্ধ—প্রথমটি চীনের সঙ্গে ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দে ম্যাকমোহন লাইন-সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি পাকিস্তানের সঙ্গে যথাক্রমে ১৯৬৫ ও ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে—কাশ্মীরের অধিকার সম্পর্কিত বিরোধ ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করার ব্যাপারে। ঘটনাগুলি আমাদের দেশের অর্থনৈতিক চেহারাকে দিয়েছে আমূল পরিবর্তিত করে, জনজীবনে হেনেছে প্রচণ্ড আঘাত। দেশকে যেখানে খাদ্যে এবং শিল্পোৎপাদনে স্বয়ম্ভর করে তোলার অপরিসীম প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, সেখানে অর্থের একটা মোটা অংশ ব্যয় করতে হচ্ছে প্রতিরক্ষা-খাতে। কিন্তু 'ধাত্রীদেবতা' 'গণদেবতা' 'পঞ্চগ্রাম' ও 'কালিন্দী'র সমাজ-সচেতন লেখক স্বাধীন ভারতে গত দুই দশকে যে কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন সেখানে তিনি রাষ্ট্র বা সমাজের ক্রমপরিবর্তনশীলতার পারস্পর্য সম্পর্কে উদাসীন—সমকালীন পটভূমি তাঁর উপন্যাসে ও গল্পে সমকালীন রাজনীতি ও অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি নিরূপণের প্রয়োজন হিসেবে আসে না, আসে নিছক তথ্যনিষ্ঠার প্রয়োজনে। তাই স্বাধীনতার পর তিনি যতগুলি উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনা করেছেন সেগুলো প্রথমত, আঞ্চলিক সাহিত্য—যেখানকার পাত্রপাত্রীরা একটা বিশেষ ভৌগোলিক সীমায় বিশ্বাসী এবং স্থানিক সংস্কৃতিতে পরিপুষ্ট। দ্বিতীয়ত, প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের পটভূমি-সম্বলিত। তৃতীয়ত, প্রাক্-স্বাধীনতা-যুগের পটভূমিতে কাহিনীর সূত্রপাত কিন্তু পরিণতিতে স্বাধীনতার পরবর্তীকালসীমায় পরিব্যাপ্তি ঘটেছে: এই ধরনের কাহিনী চরিত্রমুখ্য ;—সামাজিক ঘাতপ্রতিঘাত, কালের দ্বন্দ্ব প্রভৃতি থাকলেও লেখকের লক্ষ্য-সচেতনতার ফলে কোনো রাষ্ট্রনৈতিক বা সামাজিক ঘটনা চরিত্রের উপর গুরুতর প্রতিফলন সৃষ্টি করতে

পারেনি। যেমন, 'আরোগ্য নিকেতনে'র জীবন মশায় বা 'যোগভ্রষ্টে'র সুদর্শন। চতুর্থত, সমগ্র কাহিনীটাই স্বাধীন ভারতের পটভূমিতে রচিত, সেখানে লেখক জীবনের ধ্রুবসত্যসন্ধানী, আস্তিক্যবুদ্ধির সঙ্গে হিউম্যানিজম এর সমন্বয়ে আগ্রহী, প্রখর নীতিবোধে উদ্দীপ্ত এবং অধ্যাত্মচেতনায় প্রশান্ত ও আবেগবান: 'বসন্তরাগ', 'বিপাশা' 'উত্তরায়ণ' ও 'গন্নাবেগম' এই মনোভঙ্গির দ্যোতক। এবং পঞ্চমত, স্মৃতিকথামূলক কিছু চরিত্রচিত্রণ।

৬

সমাজচেতনার ঐতিহ্য ও তারাশঙ্করের ভূমিকা

সচেতন ব্যক্তির পক্ষে সামাজিক সমস্যাগুলি-সম্পর্কে চিন্তা করা অনিবার্য, অতএব শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের পক্ষে সেগুলিকে রূপায়িত করা এবং কখনো কখনো সমাধানের পথনির্দেশ করা রীতিমতো স্বাভাবিক। উনিশ শতকী রন্যাস্যাসের আমল থেকে আমাদের সাহিত্যে যে ইতিহাসের সূচনা হয়েছিল গদ্যে ও পদ্যে, তাতে যাবতীয় সামাজিক সংস্কারে লেখকরা হয়েছিলেন অগ্রণী, কখনো বা রাজনৈতিক পথ-প্রদর্শক, কখনো সংস্কারান্দোলনের পুরোধা, কখনো অর্থনীতির সুষ্ঠু রূপায়ণের নির্দেশক। বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমের মধ্যে সেই ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায় এবং সমকালীন সমাজের প্রায় প্রতিটি বৃহৎ বা তুচ্ছ ঘটনা এঁদের দৃষ্টি অতিক্রম করতে পারেনি। রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে প্রায় একক যুদ্ধ ঘোষণা করে যিনি বিধবা-বিবাহের ব্যাপারে ঐতিহাসিক মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন সেই বিদ্যাসাগর-ই রঙ্গমঞ্চে স্ত্রী-ভূমিকায় নারীসমাজের অংশগ্রহণে

অপরিসীম বিরুদ্ধতা করেছেন, যে-মধুসূদন সমকালীন সমাজের দুই বিপরীতমুখী গতিবেগকে ব্যঙ্গ করে 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসন দু'খানি রচনা করেছেন তিনিই মাত্র সতেরো বছর বয়সে স্ত্রী-স্বাধীনতার সপক্ষে ইংরেজিভাষায় প্রবন্ধ রচনা করে স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে যুগ আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে বিপ্লবের সৃষ্টি করেছে, সেই সময়ের অন্তর্গত সকল প্রথিতযশা শিল্পীকেই ভাবতে হয়েছে পরাধীন দেশের কথা, অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন স্বদেশবাসীর কথা।

তারাশঙ্করের সামাজিক চেতনার বিচার করতে গেলে প্রথমেই মনে আসে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা। তারাশঙ্কর রবীন্দ্র-অনুরাগী, শৈশবে ও কৈশোরে রবীন্দ্ররচনা থেকে তিনি প্রেরণা পেয়েছেন, ভূগোলের বিচারে রবীন্দ্রনাথের সাধনক্ষেত্র এবং তাঁর জন্মস্থানও কাছাকাছি কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি— রবীন্দ্রনাথের কুশীলবেরা মেজাজের দিক থেকে সূক্ষ্ম, উদার, বিশ্বজনীন, তারাশঙ্করের সৃষ্ট চরিত্রেরা অপেক্ষাকৃত স্থূল, অসংস্কৃত, স্থানিক আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট। 'ঘরে বাইরে', 'চার অধ্যায়' বা শেষপর্যায়ের ছোটগল্পগুলিকে বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে সমকালীন পরিপার্শ্ব অপরিহার্য নয়, কিন্তু তারাশঙ্করের সাহিত্য-সৃজনের ক্ষেত্রে পটভূমির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ নিতান্তই অনিবারণীয়, প্রতিমাসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে চালচিত্রটিও তাঁর মনোযোগ প্রবলভাবে আকর্ষণ করে।

তারাশঙ্করের সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্রে যে চরিত্রেরা ভিড় করে রয়েছে, আভিজাত্যের পরিধিতে বন্দী রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাদের সঙ্গে প্রাণের যোগসূত্র রচনা করা সম্ভব হয়নি। সচ্ছল মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষেও তারাশঙ্করের মতো সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করা

ছিল অসম্ভব ব্যাপার। অবশ্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণ মানুষের জীবন সম্বন্ধে কিছু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন কিন্তু সমকালীন সাহিত্যে যেহেতু ছিল রাজা, জমিদার বা উচ্চবিত্তনির্ভর চরিত্রচিত্রণের প্রথা, তাই বঙ্কিমকেও আমরা মূলত সেই পথে অনুগত থাকতে দেখি। কিন্তু বঙ্কিম ও তারাশঙ্কর সাহিত্যের মধ্যে, নারী ও দেশমাতৃকার বন্দনা করেছেন প্রায় একই বন্ধনীব মধ্যে, পুরুষ চরিত্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন ক্ষাত্রতেজ ও বলদৃপ্ত পৌরুষ, ইংরেজের বিরুদ্ধতা করেছেন, গ্রামীণ সমাজ-ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা করেছেন, কৃষক সমস্যা উভয়কে আকুল করেছে, তথাকথিত সাম্যবাদের অসারতা নিয়ে উভয়েই প্রবন্ধ রচনা করেছেন এবং অর্থনৈতিক বণ্টন-বৈষম্যে যে সামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত হয় সে বিষয়ে উভয়ের মধ্যে ছিল না কোনো মতান্তর। সমকালীন সমস্ত সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়া যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পিসত্তাকে এড়িয়ে যেতে পারেনি, তেমনি অবিভক্ত ও বিভক্ত বাংলায় গত পাঁচ দশকব্যাপী যে উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাগুলি প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, তারাশঙ্করের শিল্পিমানসে তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলি লক্ষ্য করলে লেখকের প্রবণতা সহজেই ধরা পড়বে।

বাংলাসাহিত্যের বিভিন্ন সমালোচক তারাশঙ্করের সাহিত্য বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে প্রথমত এবং প্রধানত শরৎচন্দ্রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে থাকেন। কারণ, উভয় লেখকই গ্রামীণ জীবনের মুখ্য রূপকার, ব্যক্তিগত জীবনে এবং সাহিত্যের প্রকাশশৈলীতে উভয়েই অনাড়ম্বরতায় বিশ্বাসী, কখনো পরোক্ষভাবে আবার কখনো প্রত্যক্ষভাবে উভয়েই রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছেন এবং সেই রাজনীতির হাত ধরে মূলত তাঁরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী করে নিয়েছিলেন। অতএব উভয়ের লেখকতার প্রসঙ্গে সমালোচকদের কয়েকটি মতামত এখানে বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন।

জগদীশ ভট্টাচার্য তারাশঙ্করের 'শ্রেষ্ঠগল্পে'র ভূমিকায় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তারাশঙ্করের তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে কয়েকটি উক্তি করেছেন। হরপ্রসাদ মিত্র তাঁর 'তারাশঙ্কর' গ্রন্থে সেই উক্তিগুলির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নানাকারণে দ্বিমত পোষণ করেছেন। শ্রীভট্টাচার্য বলেছেন: 'যে প্রেমকে মহিমান্বিত করে শরৎচন্দ্রের জীবনকল্পনা, আধুনিক যুগ সে প্রেমেই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে খুঁজে পেলে মানুষের জৈব প্রবৃত্তিকে। যে দুটি আদিম প্রবৃত্তির বশে মানুষের জীব-জীবন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে—তার সমস্ত সুখ দুঃখ ও আচার আচরণের মূলে সেই প্রবৃত্তিদ্বয়ের বিশ্লেষণ মুখ্য হয়ে উঠল এ যুগের সাহিত্যে',[১] এই উক্তিতে শ্রীমিত্র 'প্রবৃত্তিদ্বয়' বলতে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন তা বুঝতে পারেননি, বিশেষত 'দুই' সংখ্যাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেননি বলে অনুযোগ জানিয়েছেন। শ্রীভট্টাচার্য বলেছেন, 'শরৎচন্দ্রের জীবনে রাধিকামূর্তিরই আরাধনা, তারাশঙ্করের আরাধ্য জীবনের বিভীষণা নগ্নিকা কালিকামূর্তি',[২] কিন্তু শ্রীমিত্র এই উক্তিতে 'চূড়ান্তভাবে একটি বিশেষ ঝোঁক' আবিষ্কার করেছেন কিন্তু ব্যাখ্যা করেননি কী সেই প্রবণতা। 'শরৎচন্দ্র কেবল কোমল, কেবল মধুর। জীবনের রসতীর্থে তিনি বৈষ্ণবপন্থী। তাই বাৎসল্য ও মধুর রসই তাঁর সাহিত্যের মুখ্যরস। তারাশঙ্করে চিত্তবৃত্তি নয়, মানুষের ধাতু-প্রবৃত্তিরই দুর্দমনীয় বিকাশ। তাই তাঁর রচনায় মধুর ও করুণ রসের সঙ্গে রৌদ্র, ভয়ানক এমন কি বীভৎস রসও সমান মর্যাদা পেয়েছে।'[৩] শরৎচন্দ্র সম্পর্কে শ্রীভট্টাচার্যের এ মন্তব্য মেনে নিতে শ্রীমিত্র জোর পাননি এবং তারাশঙ্কর সম্বন্ধে 'ধাতুপ্রবৃত্তি' শব্দটির স্ব-কৃত ব্যাখ্যায় তিনি কিঞ্চিৎ আলোকের সন্ধান পেয়েছেন। প্রসঙ্গত, ১৩৪১ সালের 'প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে' শরৎচন্দ্র তাঁর নিজস্ব 'সত্য-বোধে'র কথাপ্রসঙ্গে যা বলেছিলেন তাঁর অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছেন এবং জানিয়েছেন, 'তারাশঙ্করের কথাও সেই রকম'।[৪]

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে শ্রীভট্টাচার্যের উক্তিকে শ্রীমিত্র মেনে নিতে পারেননি, অথচ সে সম্পর্কে তাঁর মতামতকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশও করেননি। আমাদের ধারণা শরৎ-সাহিত্য বিশ্লেষণে শ্রীভট্টাচার্য সঠিক পথের নির্দেশ দিয়েছেন, কারণ শরৎসাহিত্যে নারী-চরিত্রের প্রাধান্যের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি এবং জননী ও প্রেমিকা মূর্তিতে তাদের রূপায়ণের প্রশ্নে লেখকের বিশিষ্ট মানসিক প্রবণতাও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অভয়া অচলা রাজলক্ষ্মী রমা সাবিত্রী—এই প্রধান মূর্তিগুলির রসরূপের প্রতিষ্ঠা হয়েছে প্রেমময়ী মূর্তিতে, সমাজ ও সংস্কারের বাধাবিপত্তি যতই হোক না কেন। তেমনি, হেমাঙ্গিনী গঙ্গামণি বা নারায়ণী একান্নবর্তী পরিবারের সাংসারিক বন্ধনপাশের নিবিড় কঠিনতাকে উপেক্ষা করেও মহিমময়ী জননীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। রৌদ্র ভয়ানক ও বীভৎস রস শরৎ-সাহিত্যে অনুপস্থিত। তাই, 'তারিণীমাঝি' গল্পের নায়ক বাচার উদগ্র আকুলতায় প্রেমিকাকে জলের নীচে হত্যা করলেও বা 'পদ্মবউ' গল্পের নায়িকা শরীরে কুষ্ঠরোগের লক্ষণ দেখা দিলে এক ক্রুদ্ধ আক্রোশে আত্মহননের পথ বেছে নিলেও এই ধরনের গল্পের পরিকল্পনা শরৎচন্দ্র কখনো করতে চাননি এবং রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষের আদিমপ্রবৃত্তিকে জান্তব স্থূলতায় প্রকাশের ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর আমাদের সাহিত্যে অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠ লেখক।

এখন, শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্করের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে শ্রীমিত্রের কয়েকটি মন্তব্য বিচার করে দেখা যাক। একথা আশ্চর্য হলেও সত্যি, উভয়ের তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে লেখক শরৎচন্দ্রের প্রতি সর্বত্র দুর্বল পক্ষপাতিত্বে আলোচনার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। তারাশঙ্করের রচনার ঐতিহ্য এবং বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রবণতার কথা বলতে গিয়ে 'শরৎচন্দ্রের অনুকরণ', সম্পর্কে হরপ্রসাদ বাবু নিঃসংশয়িত হয়েছেন। কিন্তু পারিবারিক সমস্যামূলক অত্যন্ত সামান্য কয়েকটি রচনার কথা বাদ দিলে তারাশঙ্করের

উপর শরৎচন্দ্রের প্রভাব নিতান্তই গৌণ। উভয়েই জীবনকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করেছেন, তারাশঙ্করের ধ্রুপদী রচনায় স্পষ্টত শরৎচন্দ্রের বিন্দুমাত্র প্রভাব নেই। কাজেই, ব্যাপকভাবে 'অনুকরণ' শব্দটির প্রয়োগ এখানে তাৎপর্যহীন বলেই মনে হয়। 'আগুন' উপন্যাসটির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি পুনরায় শরৎচন্দ্রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, 'বিশ্বাস্য বাস্তব উপন্যাস হিসেবে 'আগুন' সত্যিই তুচ্ছ রচনা'—মীরা, চন্দ্রনাথ এবং হীরুর তীব্র অন্তর্দাহের চিত্র ফোটাতে গিয়ে এই উপন্যাসে নাটকীয় ঘটনার ঘনঘটায় মাঝে মাঝে উপন্যাসখানি যেন সত্যিই 'বিশ্বাস্য বাস্তবতা'র সীমা অতিক্রম করেছে এবং লেখকের এই রচনাটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবে কোন সমালোচক দ্বারাই অভিনন্দিত হয়নি। তাছাড়া, প্রত্যেকটি প্রথমশ্রেণীর গল্প উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে স্রষ্টার আনন্দ ও অনুপ্রেরণাকে তারাশঙ্কর আত্মকথামূলক-গ্রন্থগুলির পাতায় যে পুলকে উচ্ছ্বসিত হয়ে আমাদের জানিয়েছেন, এই গ্রন্থটির কাহিনী ও পটভূমিকে নির্বাচন করার ক্ষেত্রে ঠিক সেই ধরনের পুলকিত হওয়ার কোন সংবাদ আমরা পাইনি। আমরা জানি 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর 'আগুন' প্রকাশের জন্য সম্পূর্ণ রচনাটি না পেয়েও পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় কারসাজি করে তারাশঙ্করকে অগ্রিম টাকা পাইয়ে দিয়েছিলেন, তার কারণ পবিত্রবাবুর মনে হয়েছিল, একটি পাবক অগ্নিশিখা তার দীপ্তিতে বাঙলাদেশের সাহিত্যাকাশ আলোকিত করার জন্য প্রকাশোন্মুখ; তার প্রকাশের মুখের সামান্য বাধাটুকু সরিয়ে দিতে না পারলে তাঁর প্রত্যবায় ঘটবে এবং উত্তরকালের দরবারে তিনি অপরাধী সাব্যস্ত হবেন। শুধু তাই নয়, 'আগুন' এর প্রথম সংস্করণের যে কপিটি ভবানী মুখোপাধ্যায়ের কাছে আছে তার পোস্তানীতে নীল রংয়ের পেনসিলে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মন্তব্য করেছিলেন, 'তারাশঙ্কর আগামী দিনের লেখক তাঁকে অভিনন্দিত করি'। কিন্তু 'আগুন'-এর ভাব-সাদৃশ্য-নির্বাচনের ক্ষেত্রে হরপ্রসাদ মিত্র

বললেন, 'শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' কাহিনীর মোহাবর্ষণে হয়তো তাঁর মন তখন আচ্ছন্ন ছিল'।[৬] এই বাক্যটিতে 'হয়তো' শব্দটি সম্পূর্ণভাবেই আলোচকের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা ব্যক্তিগত স্বাদ এনে দিয়েছে এবং মন্তব্যটি ইতি ও নেতির দ্বন্দ্বে দোলায়িত তবু 'মোহাকর্ষণে' আচ্ছন্ন হলে 'শ্রীকান্ত' কাহিনী কেন, তৎপূর্বেই অর্থাৎ 'আগুন' প্রকাশিত হওয়ার আগেই তো 'পথের দাবী' প্রকাশিত হয়েছিল। 'শ্রীকান্ত'-এর সঙ্গে 'আগুন'-এর সাদৃশ্য কোথায়? শ্রীকান্তের যাযাবরত্ব ও ইন্দ্রনাথের সুদৃঢ়, আপাতকঠোর বৈরাগ্য ও বোহেমিয়ানিজম কি হীরুর ছন্নছাড়া মনোবৃত্তি এবং চন্দ্রনাথের উৎকট জীবনবোধের সঙ্গে উপমিত হতে পারে? শ্রীকান্তের সঙ্গে নরেশের তুলনা শ্রীমিত্র নিশ্চয়ই দিতে চাননি, কারণ সেখানে 'মোহাকর্ষণে'র কোনোই সম্ভাবনা নেই। শ্রীকান্তের মোহে আকৃষ্ট হয়ে তারাশঙ্কর নরেশকে সৃষ্টি করেননি, তাহলে উপন্যাসটির নাম 'আগুন' হত না এবং চন্দ্রনাথ চরিত্রটি সর্বাপেক্ষা বেশি প্রাধান্য পেত না।

'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসটির গঠনরীতি সম্পর্কে মন্তব্যপ্রকাশের ক্ষেত্রে শ্রীমিত্র এটিকে যদিও 'অপেক্ষাকৃত পরিণত উপন্যাস' বলেছেন, তবু তিনি এর মধ্যে পেয়েছেন 'তাঁর স্বভাবের প্রায় সব লক্ষণই, যেমন, পদে পদে আকস্মিকতার দিকে ঝোঁক, একঘেয়ে বর্ণনা, একঘেয়ে কথকতা, জমিদারির কথা আর চাষবাসের কথা, নালিশ-মকদ্দমা প্রসঙ্গ, সন্ন্যাসী প্রসঙ্গ বা ঐ ধরনের অন্য কিছু কিছু ঘোষণা বা ইঙ্গিত।' এর পরেই অত্যন্ত আকস্মিকভাবেই তিনি শরৎচন্দ্রের প্রসঙ্গ অবতারণা করলেন, 'শরৎচন্দ্রের মতন কতকটা সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের সামর্থ্য থাকলেও তাঁর মতন সাবলীল ভঙ্গি পাননি তারাশঙ্কর'।[৭] মন্তব্যটি প্রাসঙ্গিক না হলেও তাৎপর্যপূর্ণ। উপজীব্যের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র মূলত একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীতে বিচরণ করেছেন—শহর এবং প্রধানত গ্রামাঞ্চলের মধ্যবিত্ত ও কয়েকটি গৌণ রচনায় দরিদ্র নরনারী তাঁর সাহিত্যে কুশীলব, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক নয়—তাদের

সমস্যা বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া একান্তভাবেই হৃদয়গত, মধুর ও বাৎসল্য রসই তাঁর সাহিত্যের মূল রস। কিন্তু তারাশঙ্করের গণ্ডী আরো ব্যাপক, চরিত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রে তিনি সমাজের সর্বস্তরে পদচারণা করেছেন, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রাবলীর সমস্যা নানাবিধ, রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিভাগেই তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন। তাই, পর্যবেক্ষণের শক্তির বিচারে তারাশঙ্কর পূর্বসূরীর চেয়ে অপেক্ষাকৃত সামর্থবান এবং ঠিক সেই কারণেই সাবলীলতা বজায় রাখা তাঁর পক্ষে ঠিক সম্ভব হয়নি। তবে একথাও ঠিক, গল্প বলার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের মতো লক্ষ্যাভিমুখী থাকতে তারাশঙ্কর পারেন না, তাঁর আবেগদীপ্ত অতিকথন-ভঙ্গী এবং প্রত্যেকটি অনুপুঙ্খের প্রতি ঝোঁক তাঁকে মাঝে মাঝে পথভ্রষ্ট করে। এই ত্রুটির ফলে তাঁর অনেক তির্যকধর্মী গল্প পরিণামে সংকেতময়তা হারিয়ে একটি নিটোল tale-এ পরিণত হয়েছে।

সাবলীল রচনারীতির ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের দুর্বলতা প্রসঙ্গে অন্যত্র পুনরায় আলোচনা সূত্রে শ্রীমিত্র ১৩৬১ সালের পৌষমাসে 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত সমসাময়িক-সাহিত্য আলোচনা-প্রসঙ্গে নলিনীকান্ত গুপ্তর একটি রচনা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছেন। নলিনীবাবু লিখেছিলেন, 'সমাজের নূতন নূতন সমস্যা, মানবপ্রাণের নূতন নূতন জিজ্ঞাসা ও কর্তব্যের আলোচনা যে সুকুমার সাহিত্যে নির্বাসিত করিতে হইবে, তাহা আমি বলিতেছি না। কিন্তু এই সকল বস্তু বা উপকরণ সাহিত্যের রূপে ও রসে রূপান্তরিত ও রূপায়িত করিয়া ধরিবার জন্য থাকা চাই একটা যাদুবিদ্যা, একটা মোহিনী শক্তি। আমাদের দেশে এই দিক দিয়া যে চেষ্টা হইতেছে তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বোধ হয় শরৎচন্দ্র।' নলিনীবাবুর এই মন্তব্যকে স্বীকার করে নিয়ে তিনি বলেছেন, 'শরৎচন্দ্রের কলমে এই মোহিনী শক্তি যে পরিমাণে দেখা দিয়েছিল, তারাশঙ্করের কলমে ততোটা ঘটেনি'। তবে তিনি কয়েকটি গল্পে 'মোহিনী শক্তি'র সন্ধান পেয়েছেন —'রসকলি' 'জলসাঘর' 'ইমারত' 'মাটি' 'শিলাসন' 'কামধেনু' 'স্থলপদ্ম' 'তিনশূন্য' ও 'মানুষের মন'-এ।

শরৎচন্দ্রের যে কোনো গল্প-উপন্যাসে নাটকীয় ঘটনা ও উপাদানের পরিমাণবাহুল্য দৃষ্টি এড়ায় না। 'পরিণীতা'র মত গৌণ রচনা থেকে শুরু করে 'গৃহদাহ' পর্যন্ত সর্বত্র আকস্মিক ঘটনার অজস্র সমাবেশ। 'বড়দিদি'র উপসংহারে মাধবীর সঙ্গে মৃত্যুপথযাত্রী সুরেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ, 'বিরাজ বৌ'-তে মুমূর্ষু বিরাজের পঙ্গু ও বিকৃতদেহে স্বামীর সঙ্গে ক্ষণিক মিলন, 'পরিণীতা'য় ললিতা ও শেখরের পরিবারের কয়েকটি মৃত্যু ঘটিয়ে তিন বছরের দীর্ঘ অদর্শনের পর পারস্পরিক মিলন ও ভুবনেশ্বরীর কাছে নাটকীয় ঘোষণা, 'পণ্ডিতমশাই'তে কুসুমের স্বামীগৃহে যাত্রার জন্য মত পরিবর্তন, 'চন্দ্রনাথ'-এ সরযূর জননী-সংক্রান্ত অপবাদের ফলে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেও অনুতপ্ত চন্দ্রনাথ কর্তৃক কয়েকবছর বাদে স-সন্তান সরযূকে পুনর্গ্রহণ, 'অরক্ষণীয়া'য় সর্বরিক্ত শ্মশানের পটভূমিকায় রূপহীন জ্ঞানদাকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি, 'দত্তা'য়-বিলাসের সঙ্গে বিজয়ার বিবাহের পূর্ব মূহূর্তে নরেনের সঙ্গে হিন্দুমতে বিবাহের আয়োজন, 'চরিত্রহীন'-এ দেওঘরে গুণ্ডাদের কবল থেকে সতীশ কর্তৃক সরোজিনীকে উদ্ধার এবং উপেনের প্রতি প্রতিহংসাপরায়ণা কিরণময়ী কর্তৃক সরোজিনীকে নিয়ে আরাকানে পলায়ন প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র নাটকীয় ঘটনার উদাহরণ দিলাম। শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ রচনাই আবেগদীপ্ত এবং নাট্যধর্মী, চিত্র ও মঞ্চজগতে তাঁর কাহিনীগুলোর সাফল্যের কথা পূর্বেই বলেছি। 'হঠাৎ' 'কি জানি' 'কী হইতে কী হইয়া গেল' 'কেন জানি না' প্রভৃতি তাঁর বহুল প্রচলিত শব্দ এবং বাক্যাংশ। শরৎচন্দ্রের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা এবং তারাশঙ্করের কয়েকটি প্রবণতাকে সাধারণ সূত্র হিসেবে গ্রহণ করে তাঁর সৃষ্টিকে সমগ্রভাবে বিশ্লেষণের প্রবণতার ফলে শ্রীমিত্র শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তারাশঙ্করের তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে সর্বক্ষেত্রেই শেষোক্ত লেখকের প্রতি অবিচার করেছেন। একথা ঠিকই, শেষ পর্বের রচনাগুলিতে তারাশঙ্কর রসপিপাসার চেয়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসায় আকুল হয়েছেন, বয়সের জন্যই

সম্ভবত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি যেন অধ্যাত্ম-লোকের প্রতি অপরিসীম আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন এবং এই কারণ-গুলোর সঙ্গে সামাজিক প্রতিষ্ঠার ফলে তিনি গ্রামীণ মানুষদের সঙ্গে আর ঘনিষ্ঠ হতে পারছিলেন না। ফলে, তাঁর সাহিত্যের রসমাধুর্য অনেকটা ম্লান হয়ে গেছে, 'বসন্তরাগ' 'গন্নাবেগম' 'ভুবনপুরের হাট' ও 'একটি চড়ুইপাখী ও কালো মেয়ে' তার প্রমাণ। একমাত্র 'মঞ্জরী অপেরা' ব্যতীত শেষ পর্বে তিনি কোনো কালজয়ী রচনার স্বাক্ষর রাখেননি। অথচ, শ্রীমিত্র তাঁর গ্রন্থে তারাশঙ্করের সম্বন্ধে 'চূড়ান্তভাবে কোন সিদ্ধান্ত প্রকাশ' করতে চাননি। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্করের স্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তিনি নির্দ্বিধায় জানিয়েছেন 'শরৎচন্দ্রের পরে, বাংলায় নাম করবার মতন তিনিই যে একমাত্র কথাসাহিত্যিক নন, তিনি যত তত্ত্বাগ্রহী ততো রসসৃষ্টিশীল যে নন, সেকথা মানতেই হয়।'[১১]

১৩৭১ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত 'তারাশঙ্করের দান ও স্থান' প্রবন্ধে গোপাল হালদার শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্করের মধ্যে একটি মৌল সম্বন্ধ-সূত্র নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন। সমাজ যাদের সম্মান দেয় না, বর্জন করে, দূরে ফেলে দেয় আবর্জনার স্তূপে, সেই মানুষদের সকরুণ মহিমা শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে বাস্তব রূপে ফুটিয়ে তুললেন। তিনি দেখালেন কীভাবে দুঃখ দৈন্য অন্যায় পীড়ন অপরাধ ও অপরাধবোধের এবং হীনমন্যতার মধ্যেও সমাজের নিপীড়িত মানুষের মানবীয় প্রাণ অনির্বাণ রেখেছে। কলঙ্কের কদর্যতার মধ্যেও স্নেহ প্রেম মমতার প্রবাহ শাশ্বত। কখনো তারা বিদ্রোহে দীপ্ত, কখনো বিনম্র ত্যাগে পবিত্র, কখনও আশ্চর্য মানবিকতায় ভাস্বর। নির্যাতিত সাধারণ মানুষের জন্য তাঁর সকরুণ মর্মবেদনা ও নিদারুণ ক্ষোভ তাঁকে অবজ্ঞাত পতিতের প্রতি সহমর্মিতা জাগিয়ে মানুষের মূল্যবোধ সম্বন্ধে আগ্রহী করে তুলল। তিনি যেন 'সমাজসত্য সম্বন্ধে বাঙালী সাহিত্যিককে আরও

সচেতন করে তুললেন'। ফলে, বাংলা উপন্যাসের সীমানা আরও বিস্তৃত হল, পরিচিত নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজ ও পরিচিত দাম্পত্য প্রেম ছাড়িয়ে তা উপকণ্ঠস্থ পতিত ও পতিতাদের জীবনকেও পাংক্তেয় করে তুলল। 'শ্রীকান্তের চতুর্থ পর্ব'তে বোষ্টমদের আখড়ার মধ্যে বাঙালী সমাজের প্রত্যন্তবাসীদের মধ্যে রোমান্টিক প্রেমের উৎসের সন্ধান দিল। এসব বিষয় এখন আমাদের কাছে যেন অনেক সুপরিচিত। তাই সমাজ-আবর্তনের সঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্য আমাদের নিকট আর তত আশ্চর্য বোধ হয় না, জীবন্ত বলে মনে হয় না। বাঙলাসাহিত্য যেন শরৎচন্দ্রের কথাকে আত্মসাৎ করে নিয়েছে। আর বাঙালী সমাজ তারপরে এতই বিপর্যস্ত হয়ে গেছে যে মনে হয় শরৎচন্দ্রের জগৎ যেন কত দূরের জগৎ, তাঁর কালের প্রশ্ন যেন আর একালের প্রশ্ন নয়, তাঁর কথার আর চমকপ্রদ সার্থকতা নেই।

শ্রীহালদারের মতে শরৎসাহিত্যের মূল্যহ্রাসের কারণ মানবিক মূল্যবোধের পরিবর্তন। গত তিরিশ বছরে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে যে সময়টা চলে গেল ঘটনাপ্রসারের দিক থেকে তা একটি শতাব্দীর সমতুল্য। দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব, দাঙ্গাহাঙ্গামা, দেশবিভাগ ইত্যাদির প্রশ্নে বাংলাদেশের সমগ্র সামাজিক কাঠামোটিই যেন ভেঙ্গে পড়েছে। মানুষের সৃষ্ট মন্বন্তরে শুধু ক্ষুধাখিন্ন মানুষেরই মৃত্যু হয়নি, মনুষ্যত্বেরও। কৌমার্যকে পণ্য করা হয়েছে, চটের থলে হাতে করে অন্ধকারে চলতে শিখেছি আমরা, সে অন্ধকার মনময় প্রসারিত হয়েছে, মানুষ অন্য মানুষকে পিটিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে স্বজাতি-প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে, ক্ষুধায় মানুষ আহার্য চেয়ে বিনিময়ে গুলি খেয়েছে, ভোট সংগ্রহের জন্য কী করে মিথ্যাচারকে একটা জাতীয় শিল্পে পরিণত করা যায় তার উচ্চমানের শিক্ষালাভ হয়েছে। আর এই দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব, শ্মশান এবং রাজদ্বারে যারা আমাদের বন্ধু হতে পারত তাদের হারিয়েছি। এ সবের যাতে কোন প্রতিবাদ না ঘটে সে

জন্যই যেন সুভাষচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ থেকে কালটা বিচ্যুত হল। কারো কারো পক্ষে অনুমান করা সম্ভব যে জাতিটা আমরা ছিলাম, এখন আর তা' নেই।

অন্য সব দেশের মতোই এ-দেশেও সাহিত্য ব্যাপারটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মধ্যবিত্তের, তা না-ধনীর, না-সর্বহারার। অধিকাংশ সাহিত্যের মত শরৎচন্দ্রের সাহিত্যও মধ্যবিত্তের সৃষ্টি মধ্যবিত্তের জন্য (সাহিত্য মধ্যবিত্তের সৃষ্টি হওয়া উচিত কি না অথবা সাহিত্য মধ্যবিত্ত-বিরোধী হলেও, অথবা শ্রেণীলোপ পেলে আমরা সবাই মধ্যবিত্ত হব কি না সে আলোচনা এখানে অবান্তর)। কিন্তু বাংলা দেশে গত তিরিশ বছরে মধ্যবিত্ত সমাজ চেনার অতীত বদলে গিয়েছে। এইটিই অনুমিত হয় শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের মূল্যহ্রাসের প্রধানতম কারণ। এখনো তিনি যে আমাদের সাহিত্যের অন্যতম বহুপঠিত লেখক হিসেবে আদৃত হয়ে আছেন তার কারণ তাঁর সাহিত্যের ভাবমূল্য, প্রভাবমূল্য নয়।

তারাশঙ্কর যখন উপন্যাস সৃষ্টিতে অগ্রসর হন তখন শরৎচন্দ্রের জগৎ অতীত হতে চলেছিল, কিন্তু অতীত হয়নি। সমাজ ভাঙ্গতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু বিদ্রোহের মূল্য তখনো তাকে দিতে হত। শ্রীহালদার মনে করেন, 'সামন্ততন্ত্রী সমাজের এই সন্ধিক্ষণটি তারাশঙ্কর প্রত্যক্ষ দেখেছেন, আর অভিজ্ঞতার দ্বারা তা উপলব্ধি করতেও পেরেছেন। তাই শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্যকে তিনি নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই আপনার করে নিতে পারলেন।'

শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাসের বৃহৎ অংশই গ্রামকেন্দ্রিক, তাঁরা উভয়েই পল্লীসমাজ ও তার আভ্যন্তরীণ রূপ ও রূপহীনতাকে মূর্ত করেছেন দক্ষ কারিগরের মত। তবু বিষয় উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে একটি মৌল পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। শরৎচন্দ্র পল্লীবাংলার পটভূমিতে নর-নারীর চিরন্তন প্রেম, ঈর্ষা, বাৎসল্য, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি ভালোমন্দ চিত্তবৃত্তিগুলির জট ছাড়ানোর জটিল খেলাতেই বেশিমাত্রায় প্রবণ, কিন্তু তারাশঙ্করের কাছে গ্রামের মানুষদের কথা

বলতে গেলে তাদের পটভূমির গুরুত্ব অপরিসীম, ছবি ফোটাতে গিয়ে ক্যানভাসটিতেও তিনি সমান আগ্রহ বোধ করেন। 'রাইকমল'-এর ভূমিকায় লেখক বলেছেন, 'চালচিত্র না হলে প্রতিমা মানায় না; স্থান ও কালের পটভূমি উপযোগী না হইলে পাত্র-পাত্রীর পূর্ণ অভিব্যক্তি হয় না। পাঠকেরও বুঝিতে কষ্ট হয়।' পল্লীর আকাশ-বাতাস, ছয়-ঋতুর বিচিত্রলীলা, বাংলার লোকসংস্কৃতির নানাবিধ অনুষ্ঠান, বিচিত্র অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষদের আচরিত আঞ্চলিক প্রথাগুলি, পরিবর্তমান কালপ্রবাহ প্রভৃতি তাঁর গ্রামভিত্তিক গল্প-উপন্যাসে ভিড় করে আসে, শরৎচন্দ্রের মত কেবলমাত্র নরনারীর বিচিত্র হৃদয়-রহস্যের উন্মোচনেই তিনি তৃপ্ত নন। উভয়ের এই বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'শরৎচন্দ্র একটি বিশেষ উদ্দেশ্য অনুসারে পল্লীসমাজের একটি খণ্ডাংশ নির্বাচন করিয়াছেন। ইহা প্রধানতঃ রমেশ ও রমার বিরোধ-তিক্ত, অথচ অস্বীকৃত প্রেমের ফল্গু প্রবাহে স্নিগ্ধ সম্পর্কের পটভূমিকা স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে, আর গৌণতঃ ইহা পল্লীজীবনের সংকীর্ণ স্বার্থপরতা ও হীন নৈতিক আদর্শের বাস্তব চিত্র। তারাশঙ্কর পল্লীজীবনের মূল প্রবাহ অনুসরণ করিয়াছেন—ইহার উৎসাহ অবসান, গৌরব গ্লানি, বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা ও মরণধর্মী জড়তা, নূতন ভাবের ও প্রয়োজনের সংঘাতে ও পুরাতন আদর্শের ভাঙ্গনে ইহার অসহায় কর্তব্যবিমূঢ়তা এই সমস্তই কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের কেন্দ্রানুগ না হইয়া তাঁহার রচনায় অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। ঘটনার সরল অগ্রগতি কোন বিশেষ জটিলতার ঘূর্ণাবর্তে পাক খায় নাই, কোন অতলস্পর্শ গভীরতার ইঙ্গিত বহন করে না, সূর্যকরোজ্জ্বল ক্ষুদ্র তরঙ্গভঙ্গের ন্যায় পথ চলার মধ্যেই হৃদয়াবেগের ক্ষণিক দীপ্তি ও দাহ বিকীরণ করিয়াছে।'[১৮]

তারাশঙ্করের উৎকৃষ্ট পঞ্চাশটি গল্প সঙ্কলিত করে মুকুন্দ পাবলিশার্স ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দের স্বাধীনতা দিবসে 'গল্প পঞ্চাশৎ' প্রকাশ করেন এবং

ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়ের—'গল্পকার তারাশঙ্কর' শীর্ষক একটি সুলিখিত ভূমিকা গ্রন্থটিতে সংযোজিত হয়। ঐ ভূমিকার দুই জায়গায় তিনি শরৎপ্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্করের উপকরণের পার্থক্য-নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 'শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পল্লীবাংলার জীবনযাত্রা ও পল্লীর মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার রসোজ্জ্বল পরিচয় পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু সমাজের সর্বনিম্নস্তরের জীবনযাত্রার রহস্যদ্বার সর্বপ্রথম উদ্ঘাটিত হয়েছে তারাশঙ্করের গল্পে।'[১৯] পারিবারিক গল্পগুলির বৈশিষ্ট্য নির্ণয় প্রসঙ্গে অন্যত্র তিনি পূর্বসূরীর কাছে তারাশঙ্করের ঋণ স্বীকার করেছেন, 'শরৎ-সাহিত্যে আমাদের পারিবারিক জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয় ও সম্পর্ক-বৈচিত্র্যের ছবি অসামান্য মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছে। তারাশঙ্কর এক্ষেত্রে ঐতিহ্যের অনুসরণ করেছেন।'[২০] এই মন্তব্য দুটি আমাদের পূর্ব আলোচনার সিদ্ধান্তই অনুমোদন করে, তাই এ-প্রসঙ্গে নতুন আলোচনায় বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়।

এই অধ্যায়ের পরিশেষে জানাই শরৎচন্দ্র সম্পর্কে তারাশঙ্করের সশ্রদ্ধ মনোভাবের কথা। তিনি চিরকাল শরৎ-অনুরাগী, অশ্বিনী দত্ত রোডে শরৎচন্দ্র থাকার সময় থেকেই তিনি দূর থেকে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির ফলে অর্জিত ঐশ্বর্য দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন এবং যৌবনে যখন পাটনায় ছিলেন, সেখানে বিহার ন্যাশন্যাল কলেজ হলে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে 'শনিবারের চিঠি'র দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্পাদক সজনীকান্ত আধুনিক সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে সুকঠোর মন্তব্য করলে তারাশঙ্কর আঘাত পান। সজনীকান্ত শরৎচন্দ্রের সেই সময়ের লেখা 'পথের দাবী', 'শেষ প্রশ্ন' প্রভৃতি রচনাসম্পর্কে শ্লেষাত্মক ভঙ্গীতে বলেছিলেন,—'পল্লীসমাজের দাদাঠাকুর মুদির দোকানে বসিয়া থেলো হুঁকোয় তামাক খাইতে খাইতে পল্লীজীবনের গল্পে আসর মাত করিয়াছেন, কিন্তু যেই তিনি থেলো হুঁকা ছাড়িয়া ও মুদির দোকান ফেলিয়া বালিগঞ্জের ড্রয়িংরূমে সোফা

সেটিতে হেলান দিয়া পাইপ টানিতে টানিতে গল্প বলিতে গিয়াছেন অমনি হাস্যাস্পদ হইয়াছেন, নাজেহাল হইয়াছেন, গল্প অল্প না হইয়াও মাঠে মারা গিয়াছে।'[২১] এই উক্তিতে সজনীকান্ত উপস্থিত জনমণ্ডলীর কাছ থেকে করতালির দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছিলেন, খুশি হয়েছিলেন, কিন্তু তারাশঙ্কর সুখী হননি, তার কারণ, দুশো বৎসরের সাহিত্যক্ষেত্রে বাঙালীর জীবনকাল যে কয়েকজন মানুষের দ্বারা চিহ্নিত, শরৎচন্দ্রকে তিনি তাঁদের শেষতম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বলে মনে করেন। 'রসকলি' বইটি প্রকাশিত হলে মতামতের জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথকে পাঠানোর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্যেও একখানা বই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাই শরৎচন্দ্রের সমালোচনায় সজনীকান্তের পরিহাসে তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের বর্তমানে শরৎচন্দ্রের তিরোভাব হলেও বাঙালীজীবনের সাহিত্যের ভাবধারায় শরৎচন্দ্রকে তিনি সাম্প্রতিককালের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ভাবধারার নিয়ামক বলে মনে করেন। যুক্তির সপক্ষে তিনি 'আধুনিক বাংলাসাহিত্য' থেকে মোহিতলাল মজুমদারের একটি স্মরণীয় উক্তিকে উদ্ধৃত করেন: 'বঙ্কিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথকে আমরা এখন কতকটা বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পরেই শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব যেন একটু অতর্কিত, অপ্রত্যাশিত—আমাদের সাহিত্যের ধারাটি যেন একটা ভিন্নমুখে প্রবাহিত হইতে চলিয়াছে।' রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ধারার ভিন্নমুখিতার পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, 'রবীন্দ্রসাহিত্য স্বর্গলোকের ধারা, শরৎচন্দ্রে সে ধারা ধরিত্রীবক্ষোবাহিনী হয়েছে।'[২২] এর কারণ কি? শরৎচন্দ্রের জন্ম নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে, প্রথম জীবন অতিবাহিত হয়েছে এককালের সমৃদ্ধ সপ্তগ্রামের ধ্বংসাবশেষ কয়েকখানি পল্লীর মধ্যে, মজে যাওয়া সরস্বতীর ক্ষীণ পঙ্কিল স্রোতের কূলে, ঘন জঙ্গলে ভরা চারিদিক, মহামারী ম্যালেরিয়া রূপে স্থায়ী বাসা গেড়েছে সেখানে, প্রাচীন সংস্কৃতির নামে অন্ধ সংস্কারে সমস্ত

আচ্ছন্ন, দারিদ্র্যের কালিতে পরিপার্শ্ব কালো হয়ে এসেছে, সেই হৃতসর্বস্বা নগ্নিকার বেদীর সামনে শরৎচন্দ্রের পরিচয় হয়েছিল পৃথিবীর সঙ্গে। ধরিত্রীর রূপের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন নিঃস্বতার উৎকট অভিব্যক্তি ; তাই তিনি আকাশের নীলে, গ্রহতারকার দীপ্তিতে, সূর্য চন্দ্রের রশ্মিজালে, ফুলের বর্ণসম্ভারের মধ্যে যে চিরন্তন অপরূপের বাস, তার অনুসন্ধানে উৎসাহ পাননি।

শরৎচন্দ্রের সামাজিক-চেতনায় তারাশঙ্কর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, 'পূর্ববর্তী জীবনধারা থেকে নতুন কালের জীবনধারায় প্রয়াণের কালে যে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী, জাগতিক জীবন ধারণ ব্যবস্থার বিপর্যয়ের ফলে যা আমাদের মধ্যেও সঞ্চরমান হয়েছিল অথচ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাচ্ছিল না, তার আবেগ এনেছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু তার প্রথম প্রকাশ হয়েছে শরৎসাহিত্যে। পৃথিবীর নবভাবের সংঘাতে পুরাতন সমাজে ধ্বংসের কম্পন তখন শুরু হয়েছে. বাঙলা-দেশের সমাজ-ব্যবস্থার তিন কোণ ভেঙ্গেছে—এক কোণ ঠেকে আছে বৈদেশিক শাসনশৃঙ্খলার ঠেকায়. অথচ শাসন এবং শোষণে মানুষ হয়েছে হৃতসর্বস্ব, ভ্রষ্টসর্বস্ব, দীনতায় হীনতায় মানুষ শীর্ণ, মানুষ কাঙাল, চোখে তার লুব্ধদৃষ্টি, তাদের কথাই শরৎসাহিত্যে মুখ্য।'[২৩]

এই মানুষের কথা বলতে গিয়ে, প্রত্যেকটি পাঠকের মতো, তারাশঙ্করের প্রথমেই মনে পড়ে যায়, শরৎ-সাহিত্যে নারীর বিশিষ্ট স্থানের কথা। শুধু সাবিত্রী, কিরণময়ী, রাজলক্ষ্মী বা চন্দ্রমুখী নয়, তিনি আরো কয়েকটি নারীর 'উত্তপ্ত অশ্রু'র তরঙ্গের মধ্যে 'বিপ্লবের আবেগ' উপলব্ধি করেন। অবশ্য, এ প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর পরবর্তী পর্যায়ে যে কয়েকটি নারী চরিত্রের উল্লেখ করেছেন সেখানে 'উত্তপ্ত অশ্রু'র সন্ধান পেলেও 'বিপ্লবের আবেগ' অনুভব করা যায় না। রমা সমাজের কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেছে, অন্নদাদিদি সমাজকে পাশ কাটিয়ে বা সমাজের কাছ থেকে পালিয়ে ধর্মান্তরিত ও পলায়িত স্বামীর কাছে চলে গেছেন, বামুনের মেয়ে সন্ধ্যা কুচক্রী

সমাজ-শিরোমণির লালসার কাছে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ না করায় জাতিবিচারে অপাংক্তেয় হয়ে বিয়ের পিঁড়ি থেকে উঠে প্রিয়তমের কাছে নিজের হৃদয় নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে পরিণামে পিতৃসহায়তায় কাশীবাসী হয়েছে, অচলা দোলাচলচিত্ততার ফলে দুই পুরুষের মধ্যে কাউকে স্বামীত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি, একাদশী বৈরাগীর বোন (তারাশঙ্কর ভুল করে 'ভাইঝি' বলেছেন) গৌরীর বৈধব্যের পর 'পদস্খলনে'র জন্য একাদশীকে কুলত্যাগ করে বোষ্টম হয়ে গ্রামত্যাগ করতে হয়েছে। এরা কেউ বিপ্লবী মনোভঙ্গিতে উদ্দীপ্ত হয়নি এবং প্রত্যেককেই নিজের কিংবা পরের ভুলের মাশুল হিসেবে গ্রাম কিংবা সমাজ ত্যাগ করতে হয়েছে। তারাশঙ্কর বিলাসীর কথা উল্লেখ করেছেন—যার মধ্যে একটা অপূর্ব মানসিক দৃঢ়তার সন্ধান পাওয়া যায়। তাই সে শত অত্যাচার ও লাঞ্ছনা সত্ত্বেও মৃত্যুঞ্জয়কে পেয়েছিল, কোন ভয় তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি।

যা হোক, তারাশঙ্কর লক্ষ্য করেছেন, শরৎসাহিত্যে সমাজের বিধি-বিধানের অনুশাসনকে অতিক্রম করে দেহের গণ্ডী ছাড়িয়ে নারীর আত্মিক মূল্য ঘোষিত হয়েছে, তার সত্তা স্বীকৃত হয়েছে। 'এ স্বীকৃতি তুচ্ছ নয়। এ এক বিপ্লবাত্মক স্বীকৃতি।'[২৪] আইনের সাহায্যে সতীদাহ নিবারিত হয়েছিল, আইনের সমর্থন থাকলেও বিধবা-বিবাহ সমাজ-স্বীকৃতি পায়নি। তাই, শুধু আইনের সাহায্যে নয়, সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষের প্রাণের কাছে সমাজে নারীর অবহেলিত দুঃখময় রূপের বার্তা পৌঁছে দিলেন শরৎচন্দ্র এবং গত তিনচার দশকের মধ্যে বাংলার নারী-আন্দোলন একটা সুস্পষ্ট চেহারা নিয়ে সমাজের মধ্যে যে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, তারাশঙ্করের মতে তার প্রধানতম কারণ দুটি হল: 'শরৎসাহিত্যে নারীর আত্মিক রূপ-মহিমার প্রকাশ, অপরটি হল ১৯২১ সালে রাজনৈতিক গণ-আন্দোলনে নারী-শক্তিকে গণ-শক্তির অংশ স্বীকার করে স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী গঠন।'[২৫]

শুধু নারী আন্দোলনের ক্ষেত্রেই নয়, শরৎচন্দ্রের সামাজিক চেতনার

প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধাশীল তারাশঙ্কর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আবেগদীপ্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন: 'তাঁর দৃষ্টি এই দেশের বিপর্যস্ত সমাজ জীবনের সর্বত্র প্রসারিত হয়েছিল—সর্বত্রই তিনি ঘোষণা করতে চেয়েছেন বিপ্লবী ভাবধারার বাণী। অজ্ঞান-তমসায় আচ্ছন্ন দেশ, কোটী কোটী মানুষ ভাষাহীন মূক, অন্নহীন অর্ধনগ্ন, জীর্ণ শতছিদ্র আশ্রয়ের তলদেশে তারা জলে ভেজে, রোদে পোড়ে, শীতে কাঁপে, একমাত্র সম্পত্তি গরু—সে গরুর খাবার ঘাস নাই, জল নাই, সমস্ত হারিয়ে সে চলে কন্যার হাত ধরে কলের পথে—সেই গফুরের কথা শরৎচন্দ্র বলেছেন। মহেশের প্রতি তার ভালবাসা, তার নিজের কষ্টকে উপেক্ষা করে মহেশের কষ্ট বড় করে দেখার মধ্যে নিরক্ষর দরিদ্র চাষীর অন্তরের যে সত্য, সর্বোত্তম সত্য, তাকে তিনি প্রকাশ করেছেন। তার মধ্যে ছিল যে মহাবিপ্লবের বীজ, সে বৈদেশিক ভাবধারা থেকে সংগৃহীত নয় সে তাঁর অন্তরোদ্ভূত সত্য। সে বিপ্লবের বীজ আজ অঙ্কুরিত।

নিষ্ঠুরসত্যকে কোনদিন অপ্রিয় বলে গোপন করেননি, তাই শরৎচন্দ্র নিজে বিপ্লবী, তাঁর সাহিত্য বিপ্লবাত্মক।

বর্তমানকে একমাত্র ব্যক্তিগত আক্রোশে ভাঙ্গবার প্রেরণায় তিনি কিছু করেননি, মানুষকে ভালবেসে বর্তমানের জীর্ণতাকে নিরাসক্ত-ভাবে বর্জন করে নব কল্যাণে পাবার কামনার যে আবেগ, শরৎচন্দ্রের মধ্যে সে আবেগে উদ্বুদ্ধ তাঁর সাহিত্য। তাই তিনি বিপ্লবী, তাঁর সাহিত্য বিপ্লবাত্মক।'[২৬]

৭

চিত্তবৃত্তির চিরন্তন সমস্যা

একমাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ বাদ দিলে সমকালীন অন্যান্য লেখকদের তুলনায় তারাশঙ্কর অনেক বেশী সমাজ-প্রভাবিত ও রাজনীতি-সচেতন, তৎসহ তিনি প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি অনুগত, পরিবর্তনশীল কালের দ্বন্দ্বে বেদনাবিহ্বল। স্বভাবতই তাঁর সৃষ্টির পটভূমিকা অনেক ব্যাপক, পাত্রপাত্রীর সামাজিক পরিচয়ের ভূগোল বহুব্যাপ্ত। তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথমার্ধ পরাধীন ভারতে অতিবাহিত হলেও তখনকার সামাজিক অবস্থা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তী কয়েকবছরের তুলনায় অনেক প্রগতিশীল ও বিপ্লবাত্মক হয়ে উঠেছিল। সমাজের মধ্যে শুরু হয়েছিল একটা স্পষ্ট ভাঙ্গন, পুরোনো কাল তার অনড় স্থবিরতা নিয়ে সরে যাচ্ছিল নতুন কালকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙ্গে ধূলিসাৎ হয়ে পড়ছিল শিল্পায়নের নিত্যনতুন আঘাতে। তারপর ভারতের স্বাধীনতা লাভের ফলে এক নতুন সমাজব্যবস্থা গঠিত হল, শাসনতন্ত্রে স্বীকৃত হয়েছে

সকলের সমান অধিকার। শরৎ-সমকালীন অনেকগুলো সামাজিক সমস্যা ক্রমশ বিবর্ণ হয়ে এল, জাতিভেদের নির্মম প্রচণ্ডতা এখন শহরে ও শিল্পাঞ্চলে তো বটেই, গ্রামীণ সমাজেও অনেক হ্রাস পেয়েছে। আমাদের ক্রমপরিবর্তনশীল সমাজ-ব্যবস্থা প্রসঙ্গে বিশ্ব-বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স ওয়েবার বলেছেন: 'To-day the Hinduist caste order is profoundly shaken. Especially in the district of Calcutta, old Europe's major gateway, many norms have practically lost their force. The railroads, the taverns, the changing occupational stratification, the concentration of labour through imported industry, colleges, etcetra, have all contributed their part. The 'commuters to London', that is those who studied in Europe and who freely maintained social intercourse with Europeans, used to become outcastes upto the last generation ; but more and more this pattern is disappearing. And it has been impossible to introduce caste coaches on the railroads in the fashion of the America railroad cars or waiting rooms which segregate 'White' from 'Black' in the southern states. All caste relations have been shaken, and the stratum of intellectuals bred by the English are here, as elsewhere, bearers of a specific nationalism.'[১]

তাই পূর্বসূরীদের তুলনায় তারাশঙ্করের সামনে এসেছিল আরো বৃহত্তর জটিলতা, গভীরতর দ্বন্দ্ব। শরৎ-সাহিত্য ব্যক্তিমুখ্য, এমন কি, যে রচনায় তিনি পরিপার্শ্বের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিকে বুঝতে চেয়েছেন, সেখানেও ব্যক্তির অনন্যতা তিনি ভুলতে পারেননি, সমাজের অত্যাচার-অবিচারের ফলে বেদনাহত চরিত্রকে রূপ দিতে গিয়ে তিনি প্রায়শ চরিত্রায়ণে এমন আবিষ্ট হয়ে পড়তেন যে সামাজিক সমস্যার

মৌল স্বরূপটি আশানুরূপ পরিস্ফুটিত হত না। তারাশঙ্কর এ বিষয়ে অধিকতর সচেতন—ইদানীন্তনের ভিত্তিতে তিনি চিরন্তনের সৌধনির্মাণ করলেও নানাবিধ সামাজিক অর্থনৈতিক ঘটনার উদয়বিলয়ের ক্যানভাসে তিনি যখন ব্যক্তিকে ধরেছেন তখন তার সমস্যাবিজড়িত রূপটিকে কখনো অস্বীকার করেননি—তাঁর আত্মজৈবনিক উপন্যাসগুলি, 'কালিন্দী' এবং বহু গল্প তাঁর প্রমাণ। 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' এবং 'আরোগ্য নিকেতনে'ও প্রবীণ-নবীনদের দ্বন্দ্ব ফোটাতে গিয়ে তিনি এই লক্ষ্যসচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে পূর্বসূরী শরৎচন্দ্রের মতো তারাশঙ্করও মাটির মমত্ব আর মানুষের মহিমাকে কেন্দ্র করে অজস্র সামাজিক-সমস্যারহিত, ব্যক্তিকেন্দ্রিক আনন্দ-বেদনাবিহ্বল চরিত্রসৃষ্টি করেছেন, সমাজসচেতন শিল্পিতার প্রমাণ সেগুলিতে না থাকলেও সার্থক রসসৃষ্টির প্রমাণ হিসেবে তার মধ্যে অনেক রচনা সাদরে গৃহীত হওয়ার যোগ্য।

শরৎচন্দ্রের মতোই তারাশঙ্কর জীবনে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন প্রচুর এবং সেই অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যে রূপ দিতে গিয়ে তাঁর কয়েকটি বিশেষ প্রবণতার কথা মনে পড়ে। পরিবর্তনশীল সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের রূপায়ণে তিনি আমাদের সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু তিনিও সমস্ত উর্মিলতা ও উত্তালতার গভীরে একটি শাশ্বত কল্যাণের স্থৈর্যের সন্ধান করেছেন, মানুষের ব্যক্তিস্বরূপের বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে বহুক্ষেত্রেই সমাজ বা রাষ্ট্রকে আমল দেননি, সেখানে তিনি চরমের কথা বলতে গিয়ে পরমের সন্ধানে তন্ময় হয়েছেন। জীবহিসেবে মানুষের হৃদয়ে কতকগুলি মৌল প্রবৃত্তি আছে, যেগুলো মানবহৃদয়ের নিত্যকালের সঙ্গী, তারাশঙ্কর এক আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক পিপাসায় এই প্রবৃত্তিগুলোর রহস্যময় রূপের সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছেন। মোহিতলাল এই প্রচণ্ড পিপাসাকে বলেছেন, 'তান্ত্রিক রস-দৃষ্টি।' মানুষের জৈবরূপের আদিমতম উৎসমুখে প্রবেশের জন্য তারাশঙ্কর বেপরোয়া অভিযাত্রীর মতো এগিয়ে চলেছেন, এক

অনাবিস্কৃত জগৎ আবিষ্কারের আনন্দে তিনি মশগুল। তাই, মানুষের বহুবিচিত্র জীবনের আশ্চর্য-সুন্দর অভিজ্ঞতার স্বাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে তিনি শিল্পের সুষমামণ্ডিত উপস্থাপনারীতির দিকে নজর রাখার আবশ্যিকতা পালন করেন না, 'এসব রচনায় তিনি ততটা আর্টিস্ট নহেন, যতটা জীবন রসের রসিক'।[২] সম্ভবত এই সূত্রেই কাজী আব্দুল ওদুদ বলেছেন 'তারাশঙ্করের হৃদয়টি বিশাল, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি সে তুলনায় কম পরিচ্ছন্ন।'[৩] সামগ্রিকভাবে অবশ্য এ অভিমত গ্রহণীয় নয়, কারণ তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বিশেষত স্থানিক সংস্কৃতির প্রতি লব্ধ পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানকে পরিশীলিত ও পরিমার্জিত করে তিনি বহু প্রথম শ্রেণীর গল্প ও কয়েকটি উচ্চাঙ্গের উপন্যাস রচনা করেছেন।

আমাদের সাহিত্যে অনাস্বাদিতপূর্ব অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে তারাশঙ্কর অনেক গল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন। এই রচনাগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা চলে ঃ ১. সম্পূর্ণভাবে দেশকাল-নিরপেক্ষ মানুষের চিরন্তন জৈবপ্রবৃত্তিভিত্তিক, ২. দেশকালের একটা শিথিল সম্বন্ধ-সূত্রে জড়িত মানুষের হৃদয়গত সমস্যাকেন্দ্রিক। আলোচনার সুবিধার জন্য এই দুই শ্রেণীর রচনাকে একই পর্যায়ে বিচার করে তারাশঙ্করের শিল্পিসত্তার প্রবণতা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

১৩৪৪ সালের শ্রাবণ মাসে রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত তাঁর 'জলসাঘর' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'তারিণী মাঝি' গল্পটি নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক। মানুষের আদিমতম প্রবৃত্তি যৌনাবেগ নয়, বাঁচার আকুল আকাঙ্ক্ষা—এই বক্তব্যটি এই গল্পে আশ্চর্য তির্যকময়তায় ফুটে উঠেছে। দারিদ্র্য আছে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসে, কিন্তু তারিণী মাঝি আর তার স্ত্রী সুখীর সুখনীড়ের পরম প্রশান্তিতে তা ব্যাহত হয়ে যায়। কিন্তু ময়ূরাক্ষীর প্রবল বানে তারা দু'জনে ভেসে গেল, ভাসমান অবস্থাতেও তারা আলিঙ্গনাবদ্ধ, তাই প্রবল ঘূর্ণীর মধ্যে পড়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হলে সুখী প্রাণভয়ে

সরোবরে মিলিত হলেন দু'জনে, লল্লা বলল তার নিঃসঙ্গ জীবনের ইতিহাস—কিন্তু তাঁরা পুনর্মিলিত হলেন না, বিরহের আগুনে তপঃক্লিষ্টা বৈরাগিনী লল্লা ফিরে গেল রঙ্গনাথনের বেদনাহত জীবনে প্রেমের অমৃতময় স্পর্শ দিয়ে। সে যেন এখন আর লৌকিক জগতের অধিবাসিনী নয়, যে প্রেমে সর্বপ্রেমতৃষা মিটে যায়, সে যেন সেই প্রেমরসের আস্বাদ পেয়েছে এবং তারই প্রসাদে রঙ্গনাথনের বীণায় নতুন করে বেজে উঠল বসন্তরাগ। আবার এই প্রেমেরই ভিন্নতর অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায় লেখকের 'রূপসী বিহঙ্গিনী' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত দু'টি বড় গল্পে। প্রথম গল্প 'রূপসী বিহঙ্গিনী'তে কোনো নতুনত্ব নেই। মূল চরিত্র বিভা ওরফে সুচন্দ্রা ওরফে বিহঙ্গিনী সুন্দরী ও সুকণ্ঠি কিন্তু খুনের আসামী। এইখানেই কাহিনীর নাটকীয়তা। পাঠকের অপরিসীম কৌতূহল জাগ্রত থাকে: কোন্ কারণে সে সুদেহী সুপুরুষ সাধককে হত্যা করে ফাঁসীর আসামী হল? অসংখ্য ঘটনাসমৃদ্ধ এই বড় গল্পে বিহঙ্গিনীর রহস্যময়তার কোনো কারণ জানা যায় না। তার বাবা-মা যে বিবাহিত দম্পতি ছিল না তা এই গল্পের ক্ষেত্রে আবশ্যিক নয় এবং এই ঘটনার দ্বারা বিহঙ্গিনীর কোনো মানসিক পরিবর্তন সূচিত হয়নি। পার্থ মুখার্জী বা সুরেন বা ভবেশ—তার জীবনের তিনজন ঘনিষ্ঠ পুরুষের সঙ্গে সাময়িকভাবে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ পাতিয়েও শেষপর্যন্ত বিহঙ্গিনীর বাসনার তৃপ্তি হয়নি। এই ধরনের ভোগবিমুখ চরিত্রগুলি পরিণামে সচরাচর আধ্যাত্মিক ছত্রচ্ছায়ায় বিশ্রাম নেয়, ঠাকুরের উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে বিহঙ্গিনীর ওই ধরনের একটা সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছিল কিন্তু তার অবচেতনে সম্ভবত ঠাকুরকে কেন্দ্র করে দেহের দেহলি দিয়ে মদনের দেউল রচনা করার বাসনা হল। তরুণ তাপসকে ছলাকলায় বিভ্রান্ত করে তাকে পথভ্রষ্ট করার ধৈর্য ও একাগ্রতা না থাকায় সে অতর্কিতে ঠাকুরের নির্মোহ উদাসীনতার নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নিল এবং তার ফলে বিহঙ্গিনীর এবং 'রূপসী বিহঙ্গিনী' কাহিনীর অকস্মাৎ যবনিকাপাত

ঘটল। এই কাহিনীটি তারাশঙ্করের দুর্বল রচনাগুলির মধ্যে একটি।

দ্বিতীয় কাহিনী 'প্রত্যাখ্যান'-এর পটভূমি যদিও স্বদেশী যুগের সঙ্গে যুক্ত এবং নায়ক সুকুমার চৌধুরী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে রাজ-দ্রোহিতার অভিযোগে রাজবন্দী, কিন্তু এই কাহিনী মূলত গ্রামের একটি মেয়ের, যে রাজবন্দী সুকুমার চৌধুরীর সংস্পর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল। শুধু কর্মসঙ্গিনী নয়, তার জীবনসঙ্গিনী হওয়ার সাধনায় গীতা পারিবারিক পরিবেশের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও লেখাপড়া শিখেছে, পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছে, 'স্বদেশী করতে গিয়ে' স্বদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছে, রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রবলভাবে সংশ্লিষ্ট হয়েও সে প্রতীক্ষা করে থেকেছে সুকুমার একদিন আসবে, তার তপস্যা ব্যর্থ হবে না। সুকুমার এসেছিল এম-এ পাশ করা রূপবতী স্ত্রী নিয়ে। ক্ষোভে ও আক্রোশে গীতা স্থানীয় বিদ্যালয়ের বিপত্নীক প্রৌঢ় পণ্ডিতকে বিয়ে করল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সুকুমার গীতাকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে এসে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এমন কি, সুকুমার কর্তৃক প্রদত্ত জমির দলিলটা নিতেও গীতা রাজী হয়নি।

তারাশঙ্করের প্রেম-চেতনা নায়ক-নায়িকার মিলনকাহিনীর রচনায় সার্থক হয়ে ওঠে না, পরন্তু বলিষ্ঠ প্রেমের ক্ষেত্রে মিলন অপেক্ষা বিচ্ছেদেই যেন তাঁর নায়ক-নায়িকাদের প্রেম সার্থক হয়ে ওঠে। 'বিপাশা' উপন্যাসে লাবণ্য নারীজীবনের সবচেয়ে বড় কলঙ্ক তার জীবনে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়ে শরদিন্দু চ্যাটার্জির জীবনটাকে সুখী করতে চেয়েছে, তার মিথ্যা সাক্ষ্যে শরদিন্দু যেন সত্যকে চিনতে পেরেছে। তাই এলিসের সান্নিধ্য ত্যাগ করে সে লাবণ্যকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার মানসে ছুটে এসেছে কিন্তু মস্তিষ্কবিকারগ্রস্তা লাবণ্য সে আহ্বানে সাড়া দেয়নি। শরদিন্দু আর তার পুরোনো জগতে ফিরে যায়নি, সে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে এলাহাবাদে খ্যাতনামা

মানবসেবী হিসেবে পরিচিত হয়েছে। অবশ্য তার পুত্র দিব্যেন্দু বিপাশার কাছ থেকে নিজের কলঙ্কজনক জীবনের জন্য পালিয়ে এসে আত্মহত্যার চেষ্টা করে গুরুতর আহত হলে প্রেমিকার সঙ্গে মিলিত হতে পারে। লাবণ্য স্ত্রী হয়েও স্ত্রীত্বের মর্যাদা দাবি না করে শরদিন্দুকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছে, বিপাশা স্ত্রী না হয়েও দিব্যেন্দুর স্ত্রী বলে নিজের পরিচয় দিয়ে আত্মহত্যার অপরাধে অপরাধী হওয়ার দায় থেকে তাকে মুক্ত করেছে।

'বিপাশা' উপন্যাসটি অত্যন্ত দুর্বল রচনা, এর কাহিনী-অংশে দু'টি অধ্যায় সংগ্রথিত, শরদিন্দু-লাবণ্য পর্ব এবং দিব্যেন্দু-বিপাশা পর্ব। 'নিশিপদ্ম' উপন্যাসটিও লেখকের একটি শিথিল, অগোছালো, দুর্বল রচনা এবং 'বিপাশা'র মতো এখানেও কাহিনী দ্বিধাবিভক্ত। বর্ধমানের নামকরা কীর্তনওয়ালী কাঞ্চনমালা রূপ যৌবন ও সঙ্গীতের আশ্চর্য ক্ষমতা নিয়েও শুধু জীবনের ঘাটে ঘাটে ফিরেছে, ভালবাসার বিনিময়ে পেয়েছে প্রতারণা প্রবঞ্চনা ও নিগ্রহ, জীবনের অপরাহ্নবেলায় ক্যান্সাররোগাক্রান্ত প্রিয়তমকে সেবার মাধ্যমে সে পেয়েছে প্রেমের 'অমৃতফল', কাহিনীর দ্বিতীয় পর্বে কাঞ্চনমালার মেয়ে মুক্তামালা তার স্বল্প জীবনে নানারকম বিরূপ পরিবেশে প্রতিকূল অবস্থা সহ্য করতে করতে ক্লান্ত হয়ে ডাঃ গাঙ্গুলীর কাছে বোধ হয় প্রেমের স্বাদ পেতে চেয়েছিল। কিন্তু সে প্রতারিত হল, তার সন্তানের কোন পিতৃপরিচয় থাকল না। সন্তানকে সম্ভ্রান্ত আশ্রমে পাঠিয়ে সে নৃত্যকলায় পারদর্শিনী হয়ে উঠল এবং গুরু শ্রীনারায়ণের নির্দেশে পুত্রকে পরে ডাঃ গাঙ্গুলীর কাছে ক্যালিফোর্ণিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া মনস্থ করে। মুক্তামালার জীবনে আর কোন ক্ষোভ নেই, সে যেন জীবনে পরমসত্যের সন্ধান পেয়েছে, লৌকিক জগতের কোনো দয়িতের সঙ্গে মিলনের জন্য তার কোন আকূতি নেই, সে তার সাধনার মাধ্যমে জীবনের পূর্ণতাপ্রত্যাশী ; 'মীরা গানে ভজনা করে জীবন পূর্ণ করেছিল। সে হয়তো সেকাল। একালেও আমি আনন্দের মধ্যে পবিত্র পুণ্যের মধ্যে এই

সাধনাতেই জীবন পূর্ণ করব।' তারাশঙ্করের শেষ পর্বের অধিকাংশ রচনাতেই নায়ক-নায়িকারা যেন তত্ত্বজিজ্ঞাসায় আকুল, সত্যসন্ধানে আগ্রহী, জীবনের আপাত-লাভ-ক্ষতির প্রতি উদাসীন হয়ে 'অমৃতফল' প্রত্যাশী।

'সপ্তপদী'র কৃষ্ণেন্দুও ঠিক তাই। তারাশঙ্করের সাম্প্রতিককালের অন্যতম প্রতিনিধিত্বমূলক রচনা 'সপ্তপদী'র নায়ক কৃষ্ণেন্দু লেখকের চোখে-দেখা চরিত্র, তাই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আস্বাদে চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এককালের উচ্ছল, বেপরোয়া, প্রাণপ্রাচুর্যে চঞ্চল তরুণ কৃষ্ণেন্দু ধর্মত্যাগ করেও রিণাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান রিণা তাকে প্রতিহত করেছে। সে কৃষ্ণেন্দুকে প্রশ্ন করেছিল, 'তুমি আমার জন্যে, আই মীন একটি মেয়ের জন্যে তোমার ধর্ম ত্যাগ করলে?' উৎসাহের সঙ্গে হেসে কৃষ্ণেন্দু উত্তর দিয়েছিল—'আমার জীবন দিতে পারি তোমার জন্যে।' রিণা কিন্তু তাতে খুশি হল না, স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিল, 'মাফ কর আমাকে। আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারব না। তুমি আমার জন্যে এতকালের ঈশ্বরকে ত্যাগ করলে। কাল আমার থেকে কোন সুন্দরী মেয়ে তোমার ভাল লাগলে আমাকে ত্যাগ করবে না কে বললে?' কৃষ্ণেন্দুর মনে এল এক নতুন প্রশ্ন, ঈশ্বর এত বড়ো? এত প্রিয়? যার জন্য সংসারের প্রিয়তম জনকে উপেক্ষা করা যায়। তাহলে সে তাঁকেই খুঁজবে, তাঁর সেবাতেই জীবন নিয়োগ করবে। মানবসেবায় আত্মোৎসর্গীকৃত এই চরিত্রটির সঙ্গে পরিণত বয়সে তারাশঙ্করের দেখা হয়েছিল, ভারতবর্ষের এক প্রান্তসীমায়, ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে, আদিবাসীদের গ্রামে। তখনকার কৃষ্ণেন্দু লেখকের সামনে এসে দাঁড়ালে মনে হল, সে যেন লেখকের 'অন্তর্লোকের সকল স্তর ভেদ করে এক অতি সাধারণ-অসাধারণ মহিমায় মণ্ডিত হয়ে উঠে এসে' সামনে দাঁড়িয়েছে। 'অট্টহাস্যের বদলে প্রসন্ন নীরব হাস্যে সুপ্রসন্ন,

দুর্দান্তপনার পরিবর্তে পরম প্রশান্ত, উল্লাস চঞ্চলতার অধীরতার পরিবর্তে ধীর।'[৬] তার কাছে তারাশঙ্কর শুনেছিলেন ঈশ্বর-প্রাপ্তির কথা। তাঁর সমগ্র সৃষ্টি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁর সাহিত্যের পাত্র-পাত্রীরা যে বিশেষ প্রবৃত্তিতে আত্যন্তিক প্রবণতা-বোধ করে সেই প্রবৃত্তিকে তারা যেন জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পৃক্ত করে তোলে। এজন্য প্রেমে সার্থকতা না পেলেই তাদের জীবন যেন শুধু কক্ষচ্যুতই হয় না, লক্ষ্যভ্রষ্টও হয়, তবে সবক্ষেত্রেই জীবনকে নিঃশেষে হারিয়ে না ফেলে সেবা কিংবা সাধনার মধ্য দিয়ে তারা যেন পরিণতিতে একটা অখণ্ড অমৃতত্বের অধিকারী হয়, প্রশান্তি ও প্রসন্নতায় প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

'নিশিপদ্মে'র কাঞ্চনমালা যেমন জীবনে প্রেমের সন্ধান করে পদে পদে প্রতারিত হয়ে অবশেষে এক ক্যান্সার-রোগাক্রান্ত পুরুষের সেবার মধ্যে 'অমৃতফলে'র সন্ধান পেয়েছিল, ঠিক তেমনি 'ভুবনপুরের হাট'-এর মালতী যক্ষ্মারোগগ্রস্ত নবু ঠাকুরকে সেবার মধ্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করে পরমসুখের সন্ধান করেছে।

প্রেম-চিত্রণের ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর বর্ণচ্ছটায় বিলসিত ইন্দ্রধনুর বিচিত্রলীলা দেখাতে চাননি, গভীর প্রেমকে তিনি যেন নরনারীর বাঞ্ছিতলক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার সোপান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাই তাঁর সাহিত্যে জীবনে যারা দেহাতীত প্রেমের সন্ধান করেছে তারা আঘাত পেয়েছে, দুঃখ পেয়েছে এবং পরিণামে পরমসত্যের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেছে, কিন্তু দেহগত প্রেমে অথবা অপ্রেমে বিশ্বাসী, নরনারীর আদিম যৌনলীলায় মত্ত, দেহসুখসর্বস্ব চরিত্র-গুলিকে তিনি উপস্থিত করেছেন তাদের সমস্ত স্থূলতা পাশবিকতা ও নগ্নতার পরিপ্রেক্ষিতে। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন: 'Another respect I find Tarashankar lacking in is what our sanskrit aestheticians called the adirasa or the primary feeling (though 'feeling' is not quite the word, *rasa*

being untranslatable): I mean the mutual attraction of the two sexes, capable of infinite forms, but invariable in substance: the subject totally or partly of so large, so overwhelmingly large a body of the world's literature'.[১]

বুদ্ধদেব বসুর অভিমত সর্বাংশে সত্য, কারণ তারাশঙ্কর প্রেমের তিনটিমাত্র রূপ তাঁর সাহিত্যে চিত্রিত করেছেন; প্রথমটি আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি অর্থাৎ পরমসত্যাভিমুখী প্রেমের কথা, দ্বিতীয়টি হল নরনারীর দেহগত নির্লজ্জ দেহার্তির প্রসঙ্গ যেখানে তারাশঙ্কর দক্ষ রূপশিল্পী আর তৃতীয়টি হল, দাম্পত্যপ্রেমপ্রসঙ্গ, সেখানে তারাশঙ্কর বৈচিত্র্যহীনতাকে কাটিয়ে উঠতে পারেননি, স্বামী স্ত্রীর মিলিত-মধুর জীবনের ছবি তাঁর তুলিতে নানারঙ্গে মনোহর হয়ে ওঠেনি।

বাহ্যত শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্যকে সম্প্রসারিত করলেও এবং উপন্যাসের এলাকাকে প্রসারিত করে সমগ্রভাবে পল্লীসমাজের চিত্রাঙ্কনে উদ্বুদ্ধ হলেও তারাশঙ্করের মূল যে ভূমিতে নিহিত তা সমাজভূমি নয়, সমাজের কাছে অপাংক্তেয় কোন অসামাজিক ভূমিও নয়। একটা অন্ধ জীবনবাদের থেকে তারাশঙ্করের প্রতিভা আপনার রস সঞ্চয় করেই সজীব। সে জীবনবাদ স্বভাবতই যুক্তিবিমুখ, নীতিনিরঙ্কুশ, এমন কি স্নেহ প্রেম মমতা ও যৌনকামনারও অতীত এক অদম্য প্রাণপিপাসা, জীবনপরায়ণতা—'তারিণী মাঝি'র মতো বাঁচার অপেক্ষা ছাড়া আর কোনও সত্য তা গ্রাহ্য করে না। এই জীবধর্মের আর একার্ধ—প্রাণপিপাসার আর এক অঙ্গ—আদিম যৌনপ্রবৃত্তির দুর্নিবার আবেগ তারাশঙ্করের সৃষ্টিপ্রেরণার অন্য এক অফুরন্ত উৎস। জীবনবাদ ও যৌনাবেগ—জীবনসত্যের বিশিষ্ট দুই স্বাক্ষররূপে তিনি বাংলা সাহিত্যে উপস্থাপিত করেছেন। তবে, জৈব সত্য তারাশঙ্করের রসচেতনাকে মথিত করলেও, বিকৃতিতে তা বিভ্রান্ত হয়নি। তিনি যেন বলতে

চেয়েছেন, প্রকৃতি আগ্রাশক্তি ; বুদ্ধিতে, যুক্তিতে, এমন কি মানবীয় হিতাহিতের সে কতটুকু মূল্য দেয় ? এই দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য বৈজ্ঞানিক-বোধে ও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় বিশ্বাস রাখে না। সমাজসত্যেও যথার্থ আস্থা রাখবার কথা নয়। প্রথম যুগেও তারাশঙ্কর যখন সমাজসত্য প্রকাশে সচেষ্ট, তখনও দেখি 'পঞ্চগ্রাম' অপেক্ষাও 'কবি'র সেই রহস্যঘন প্রবৃত্তির লীলা রূপায়ণে তিনি সার্থক। সেখানেই তাঁর শক্তি জয়ী ও তাঁর প্রত্যয় সুদৃঢ়।

দেহগত প্রেমের ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর কয়েকটি চরিত্রকে আদিরসাত্মক চেতনায় আবিষ্ট করে রেখেছেন, 'রাখাল বাঁড়ুজ্জে'র নায়ক ও 'প্রসাদমালা'র হরি মোড়ল ভাবী বেয়ানের দেহের প্রতি নির্লজ্জ লুব্ধতায় নিজেদের সন্তানের জীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছে। 'দেবতার ব্যাধি' গল্পে ডাক্তার গড়গড়ির আত্মসমীক্ষায় এক আশ্চর্য রোগের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল যার কোনো প্রতিষেধক তিনি জীবনে খুঁজে পাননি। যৌবনে তাঁর মনের অবচেতনে পরোপকারপ্রবৃত্তির ছদ্মবেশে আকস্মিকভাবে জেগে উঠেছিল যৌনপিপাসা, প্রৌঢ়ত্বের সীমানা অতিক্রম করে গেলেও সেই পিপাসার আবেগকে অবদমিত করে রাখা যেন তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তার এই অসহায়তা প্রায় চার-পাঁচ দশক পরে হেডমাস্টার মশাইকে লেখা একটি চিঠি থেকে জানা গেল। 'বোবা কান্না'য় ডাক্তার মিহির গাঙ্গুলী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, ত্রিপুরা ভট্টাচার্য প্রাচীনপন্থী তান্ত্রিক, শশী ডোম সামাজিক নানারকম পাপের সঙ্গে জড়িত জেল-ফেরতা আসামী—আন্নুঠাকুরের নাবালক পুত্রের অসুস্থতায় এরা সকলেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে নানারকম সাহায্য করা সত্ত্বেও ছেলেটি মারা গেল। আন্নুঠাকুরের বৌ সুন্দরী হলেও মূক, তাই তার পুত্রশোকের বিলাপ মুখর হয়ে উঠতে পারেনি, আর এরা তিনজন বোবাকান্নায় ভেঙ্গে পড়ল কেন ? তার কারণ, আন্নুঠাকুরের বৌ-এর সৌন্দর্য, তার প্রতি অপ্রকাশ্য দুর্বোধ্য আকর্ষণ। তাই তার শোকের শরিক হতে গিয়ে রুচিশীল

এবং শিক্ষিত মিহির বিষপান না করে সংযত হয়েছে, ত্রিপুরা কালীর খড়্গো আত্মহত্যার সঙ্কল্প করলেও নিরস্ত হয়ে মন্দিরের দায়িত্ব ছেলেকে দিয়ে দেশত্যাগ করেছে, আর শশী এদের তুলনায় অশিক্ষিত গ্রাম্য এবং বন্য, হৃদয়াবেগ ও অনুভূতিকে সংযত করার শিক্ষা তার কোনো কালে ছিল না, তাই সে আত্মহত্যার মধ্যেই মুক্তির সন্ধান পেয়েছে। 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা'য় কুৎসিতদর্শন গোবিন্দ রূপবতী সতীকে টাকার জোরে বিয়ে করলে সতী জীবনসম্ভোগের পিপাসায় স্বামী ত্যাগ করে নানাচারিত্বে আনন্দ পেলেও তার সন্তানকে বিগ্রহের সেবায়েত করে দিয়ে গোবিন্দ যেন তার প্রেমকে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। 'পিঞ্জর' গল্পে প্রৌঢ় ম্যাজিকওয়ালার সঙ্গে সহবাসরতা পাহাড়িনীকে দেখে ভ্রাম্যমান বাজীকর দলের পাহাড়ী গুর্খা যুবক সেই ম্যাজিকওয়ালাকে হত্যা করতে গিয়ে নিজেদের মৃত্যু ঘটায়। 'ইমারত' গল্পের রাজমিস্ত্রী জনাব শেখ আলি উদ্দাম যৌনাবেগে তাড়িত এক পুরুষ, নারীদেহ যার কাছে বিলাসের বস্তু। তার নিজের জীবন যেন ইমারতের প্রতীক যা কালের কবলে ধ্বংসোন্মুখ হলেও এতকাল শ্যামাদাসবাবুর মন্দিরের মতই মাথা তুলেছিল। জীবনে সে একের পর এক নারীদেহ সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছে এবং প্রয়োজন মিটে গেলে জীর্ণবস্ত্রের মতো তাকে পরিত্যাগ করেছে। তার প্রৌঢ়বয়সের দেহসঙ্গিনী মতিবালা বিশ্বাসঘাতকতা করলে সে বলে, 'যা তুকে আর কিছু বুলব না। তুদের জাতটাই এমনি।' স্ত্রীজাতির প্রতি এই বিশ্বাসহীনতা 'নারী ও নাগিনী'র খোঁড়া শেখের কথা মনে করিয়ে দেয়। শেখ আলি এক উদয়নাগিনী ধরে নিয়ে পুষতে আরম্ভ করল, সে তাকে আদর ও চুম্বনে পত্নীত্বের মর্যাদা দিয়েছে—নাকে ছোট মিনি পরায়, কপালে দেয় সিঁদুর। জোবেদা সত্যিসত্যিই নাগিনীর প্রতি ঈর্ষা পোষণ করে। নাগের সঙ্গে তার সহবাসের ঋতুতে তাকে ছেড়ে দিলে সে একদা ফিরে এসেছিল (সে কি খোঁড়ার মায়ায়?)। জোবেদা তাকে ইট ছুঁড়ে মারলে সেই

রাত্রেই সে জোবেদাকে কামড়াল। জোবেদা মারা গেল আর 'বিবিকে খোঁড়া বধ করতে পারে নাই। তাহাকে সে ছাড়িয়া দিয়াছিল। বলিয়াছিল, শুধু তোর দোষ কি, মেয়েজাতের স্বভাবই ওই। জোবেদাও তোকে দেখতে পারতো না।'

'রাঙ্গাদিদি' ও 'নারী' বুভুক্ষু নারী-হৃদয়ের জৈবিক কামনাকে দুটি বিভিন্ন পথে প্রবাহিত করার গল্প। প্রথম গল্পটির নায়িকা রসিকা পটোনী সরস্বতী, বৃদ্ধ গণপতি পটুয়ার স্ত্রী। সম্ভবত বার্ধক্যের ফলে তার স্বামীর সঙ্গে যুবতী সরস্বতীর যৌন সম্পর্ক ছিল অসুস্থ এবং অস্বাভাবিক, তাই স্বামীর উপস্থিতিতেই সে পাড়ার যুবকবৃন্দের কাছে রঙ্গিনী লাস্যময়ী হয়ে প্রতিবেশীমহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল এবং স্বামীর মৃত্যুর পরে গ্রামের বিবাহিত যুবকদের তালাক দিতে প্রলুব্ধ করতে থাকে। কিন্তু সেই রহস্যময়ী কারো ঘর ভাঙ্গেনি, নিজেই ঘরের মায়া ত্যাগ করে পথে হারিয়ে গেছে। সরস্বতী কারো কাছে ভোগের সামগ্রী হয়ে ওঠেনি, সকলকে প্রলুব্ধ করেছে, বিভ্রান্ত করেছে। কিন্তু 'নারী' গল্পের নির্মলার দেহের পিপাসা সুতীব্র ভোগাকাঙ্ক্ষার মধ্যে তৃপ্ত হতে চেয়েছে। আশ্রয়দাতার পুত্র রমেনের সান্নিধ্যে বালবিধবা নির্মলা অন্তঃসত্ত্বা হল। রমেন তাকে সত্যিই ভালবাসত, ফলে সে তাকে এক বস্তীতে এনে রাখে। যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হলে এবং নবজাত শিশুকন্যার মৃত্যুতে শোকাহত হলে এক সদাশয় ধনী তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার সহায়তায় সুস্থ করে তুলল এবং ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করতে লাগল। সেখানে সে যদিও থাকেনি কিন্তু পালিয়ে হাসপাতালে এলেও সে যেন সারা-অঙ্গে দেহ-সম্ভোগ-পিপাসার সুতীব্র আকুলতা বহন করে এনেছে। তাই, হাসপাতালে নার্সিং শিখতে শুরু করলেও সে ডাক্তারদের সঙ্গে রসিকতা করত, তাদের প্রশ্রয় দিত, অবশেষে আত্মহত্যার মাধ্যমে সে মুক্তি পেয়েছে। 'নারী' গল্পের নির্মলা চরিত্রটিকে যেন পরবর্তীকালে লেখক 'যতিভঙ্গ' উপন্যাসের নায়িকা

রৌশন-এ রূপান্তরিত করেছেন। লেখককে তাঁর এক বন্ধু অনুরোধ করেছিলেন, 'একেবারে মডার্ণ মেয়ে নিয়ে কিছু লেখ। তুমি লেখনি। অবশ্য দেখে থাক তো লেখ নইলে লিখো না।' এই অনুরোধের বশবর্তী হয়ে লেখক 'যতিভঙ্গ' উপন্যাস লিখলেও ঐ তিনটি বাক্যে তিনটি প্রশ্ন থেকে যায়। মডার্ণ মেয়ের সংজ্ঞা কি? সেই সংজ্ঞাসম্পর্কে লেখকের মনে কোন্ ধারণা কাজ করেছে যার ফলে তিনি স্বীকার করেছেন তাঁর অক্ষমতার কথা? এবং অভিজ্ঞতার পরিধির বাইরে পদচারণার প্রবৃত্তি না থাকলেও তাঁকে সতর্ক করে দেওয়ার আবশ্যকতা কি? 'যতিভঙ্গ' উপন্যাসের মধ্যে এই তিনটি প্রশ্নের কোনো সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে না, তবে না দেখে লেখার নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তিনি যখন রৌশনের জীবনকাহিনী আমাদের শুনিয়েছেন তখন অভিজ্ঞতার সঞ্চয় তাঁর ছিল। লেখক নিজের জীবনের কিছু ঘটনা এমন কৌশলে এই কাহিনীতে সন্নিবেশিত করেছেন, যা এই উপন্যাসের ঘটনাবলীতে একটা বিশ্বাসগ্রাহ্য পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। তবে রৌশন কতখানি মডার্ণ হয়েছে তা অবশ্য বিচারসাপেক্ষ। সে জীবনে অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে এলেও তার রুচিতে আধুনিকতার সমার্থবোধক প্রগতিশীলতা ছিল না, ছিল না কোনো আধুনিক সংগ্রামী মেয়ের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও প্রতিকূল পরিবেশে লড়াই করার মতো আশ্চর্য প্রাণশক্তি। সে আধুনিককালের প্রতিনিধিত্ব দাবি করতে পারে না, তার বাসনা ও বিভ্রম একান্তভাবেই তার ব্যক্তিগত, রূপযৌবনের পসরা সাজিয়ে বিদেশী ট্যুরিস্ট থেকে শুরু করে দিল্লীর অভিজাতমহল পর্যন্ত সকলের মনোরঞ্জনের প্রবৃত্তি ততটা পারি-পার্শ্বিকতার চাপে পড়ে তার হৃদয়ে জাগেনি যতটা ব্যক্তিগত দেহার্তি তাকে আকৈশোর পুরুষের দিকে আকৃষ্ট করেছে। তার মানসিক দ্বন্দ্ব ও তজ্জনিত আত্মহত্যা দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো আধুনিক সংগ্রামী মেয়ের পরাজয় ও পতন নয়, মনে হয় যেন, তারাশঙ্করের অজস্র টাইপ চরিত্রের মতো আর একটি টাইপ-চরিত্রের পরিণতি।

দেহাতীত প্রেমের সর্বক্ষেত্রেই লেখক যেমন নায়ক অথবা নায়িকার হৃদয়ে অমৃতত্বের সন্ধান দিয়েছেন, দেহগত প্রেমের ক্ষেত্রেও কখনো কখনো পরিণতিতে নায়ক-নায়িকার মোহমুক্তি ঘটিয়েছেন। 'প্রতীক্ষা'য় বিলাসিনী যৌবনোচ্ছলা পরী বিবাহিত জীবনে নৈতিক পবিত্রতার বন্ধনকে অস্বীকার করে দেহার্তির জ্বালায় জীবনটাকে যখন প্রায় নিঃশেষ করে এনেছিল, তখন আখনার সঙ্গে দেখা হলে সে পরীকে মাত্র একটি পয়সা দিয়ে অন্যত্র চলে গেছে। পরীর মতো 'প্রসাদমালা'র ললিতাও প্রেমিক স্বামীর সান্নিধ্যে তৃপ্তি পায় না,—সঙ্গীতের মাধুর্যে, ঈশ্বরের উপাসনায় ভাববিহ্বল গোপাল ললিতাকে রাধার মতো আবেগতপ্ত করে রাখতে চায়, কিন্তু যৌবনের স্বভাব-ধর্মে ললিতা চায় বিলাসিনী হতে। স্বামীগৃহত্যাগের পর বিলাসিনী ললিতা বৈরাগিণীতে রূপান্তরিত হয়েছিল বলেই তাদের পুনর্মিলন হয়েছে নতুবা পরীর মতো পরিণতি হওয়া আশ্চর্য ছিল না।

স্বামীর দেহধর্মের প্রতি উদাসীনতায় পরী বা ললিতা বিক্ষুব্ধ হয়ে পতিসান্নিধ্য ত্যাগ করেছিল, কিন্তু 'কন্যা কাময়তে রূপম্' মতবাদের উপর ভিত্তি করে তারাশঙ্কর এমন কয়েকটি গল্প লিখেছেন যেখানে স্বামীর রূপহীনতাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্যজীবনে নেমে এসেছে অশান্তি। 'জায়া' গল্পের নায়ক শিবনাথের রূপহীনতার জন্য তার স্ত্রী গৌরীর আক্ষেপোক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, 'তোমার খ্যাতিতে আমার তৃপ্তি হয় না। তোমার স্বাস্থ্য, তোমার শ্রীতে আমার বেশি তৃপ্তি।' পুরুষের রূপ ও স্বাস্থ্যের প্রতি নারীর চিরন্তন লোভ 'বেদেনী' গল্পে বৃদ্ধ ও সবল দুটি বাঘের প্রতীকে আশ্চর্য সঙ্কেতময়তায় রূপায়িত হয়েছে। রাধিকা বেদেনী শিবপদকে ত্যাগ করে শম্ভু বাজীকরের সান্নিধ্যে এসে উঠেছিল, আবার সবল সুন্দর বলিষ্ঠ পুরুষ কিষ্টো তাকে আকৃষ্ট করলে সে শম্ভুর প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতায় দ্বিধাবোধ করেনি।

রূপকেন্দ্রিক সংঘাতের আলোচিত উদাহরণগুলি ব্যতিরেকে তারাশঙ্করের সাহিত্যে দাম্পত্য জীবনচর্যার পরিচয় খুবই সীমিত। প্রগাঢ় দাম্পত্যপ্রেমের সামান্য কয়েকটি উদাহরণের মধ্যে 'শ্রীনাথ ডাক্তার' 'শ্যামাদাসের মৃত্যু' ও 'সংসার' গল্প তিনটি স্মরণীয়। নতুন ওষুধ আবিষ্কারের তাগিদে প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যু ঘটিয়ে শ্রীনাথ ডাক্তার পাগল হয়ে গেছে ; স্ত্রীর সঙ্গে আদর্শের সংঘাতে জীবনের সুখশান্তি বিপর্যস্ত হয়ে গেলেও তার মৃত্যুর পর বৈজ্ঞানিক শ্যামাদাস মুমূর্ষু অবস্থায় যুক্তিকে বিসর্জন দিয়ে সংস্কারের বশবর্তী হয়ে স্ত্রীর আগমন প্রতীক্ষা করেছে ; বৃদ্ধা স্ত্রীর সঙ্গে দাম্পত্য মান-অভিমানে বৃদ্ধবয়সের দিনগুলোকে নানা রঙ্গে ভরিয়ে তুললেও স্ত্রীর মৃত্যুর পর সরকার যেন জীবনের অর্থ হারিয়ে ফেলেছে। এই তিনটি ক্ষেত্রেই দাম্পত্যজীবনের প্রগাঢ়তাকে চিহ্নিত করতে গিয়ে লেখক মৃত্যুকে আশ্রয় করেছেন।

অসুখী দাম্পত্যজীবনের চিত্রণের ক্ষেত্রে স্বামীর রূপহীনতা, কিংবা স্ত্রীর দেহ-বিলাস ছাড়াও লেখক কয়েকটি গল্পে অন্যান্য বিষয়েরও অবতারণা করেছেন। 'হারানো সুর' গল্পে স্বামীর শিল্পভাবনার শরিক না হয়ে তাকে গৃহীতে পরিণত করার পর গিরি নিজেই সঙ্গীতশিল্পের প্রতি আসক্ত হয়ে ওঠে। এই সংঘাতের ফলে উভয়ের জীবনে তীব্র বেদনা-বিধুরতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে গিরির শিল্পভাবনার কাছে ননীর আত্ম-সমর্পণে। 'শাপমোচন'-এ দেবীচরণ নিজের কুৎসিত চেহারার জন্য আত্ম-হত্যা করল, 'চৌকিদার' গল্পে বনোয়ারি সন্দেহবাতিকগ্রস্ততায় নিজের ভুলের জন্য স্ত্রীকে ত্যাগ করল, 'পদ্মবউ' গল্পে পতিব্রতা, সেবাপরায়ণা পদ্ম স্বামীর কুষ্ঠরোগে সংক্রামিত হওয়ার মিথ্যা সন্দেহে আত্মহত্যার মাধ্যমে জীবনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেল, 'সুখনীড়' গল্পে দুই বান্ধবীর স্বামী পরনারীগত হয়েও তাদের উভয়ের জীবনে মিলিতমধুর সুখনীড়টিকে যেন একটা তথাকথিত প্রেমের আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখেছে, 'মাটি' গল্পে 'মুসরদের সাপিন-কন্যা পাঞ্জাবের রহনেওয়ালীর

মতো৷ লম্বা' লছমনিয়া মেওয়ালালকে প্রতারিত করে 'কোম্পানীর এক অপসর, এক কালো সাহেবের' কাছে চলে যায়। 'মানুষের মন' গল্পে ভবেন্দ্র ও সুভাষিণী স্বামী-স্ত্রী হলেও তুই বিপরীত চিন্তা-ধারার নরনারী। যখন ত্যাগের, মহত্বের, প্রাণের ঐশ্বর্যে ভবেন্দ্র মহান তখন সঙ্কীর্ণতায়, নীচতায়, বেঁচে থাকার আবশ্যিক প্রয়োজনে সুভাষিণী মুখরা, অগ্নিক্ষরা, জ্বালাময়ী। এমন কি, আত্মহননেও তার প্রচণ্ড স্পৃহা স্ব-কৃত রক্তক্ষরণে প্রমাণিত। কিন্তু ঘটনা ঘটে গেল বিপরীত। ভবেন্দ্র আশি লক্ষ টাকার মালিক, প্রচণ্ড মদ্যপ, আদর্শের কোনো বালাই নেই এবং সুভাষিণী শিক্ষিকা ও সংযত। সুভাষিণী যা চেয়েছিল তার বিকট রূপ দেখে সহ্য করতে না পেরে তারাশঙ্করের অসংখ্য চরিত্রের মতো সে-ও আত্মহত্যার মাধ্যমে নিষ্কৃতি পেল। অনেকক্ষেত্রে সন্তানহীনতার জন্য নর-নারীর জীবনে আত্যন্তিক শোক, বুভুক্ষু ও তজ্জনিত বিপর্যয় নেমে এসেছে। 'জুয়াড়ী' গল্পে কন্যার মৃত্যুতে উদভ্রান্ত রাখাল স্ত্রীর গহনা চুরি করে মেলায় এসে মদে ও জুয়ায় জীবনটাকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে, 'সন্তান' গল্পে বিকলাঙ্গ, গোবিন্দ সন্তানের মধ্যে নিজের প্রতিমূর্তিকে দেখতে পেয়ে তাকে হত্যা করে সে উন্মাদ হয়ে গেল, 'গল্প নয়' গল্পে চন্দ্রশেখর বাবু আদরের মেয়ে বুলুর মৃত্যুতে (এটি আত্মজৈবনিক গল্প) তুঃখে-শোকে ভেঙ্গে পড়েন, 'স্মৃতি ও ইতিহাসের দিক থেকে লেখকের সবচেয়ে প্রিয় গল্প' 'সন্ধ্যামণি'তে একমাত্র মেয়ের মৃত্যুতে কেনারাম বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়ায়, 'চোরের মা' গল্পে চৌর্যবৃত্তিতে নিরত পুত্রের অকাল মৃত্যুতে ভয়ে ও লজ্জায় বুক ফাটা কান্নায় ভেঙ্গে না পড়লেও সত্যোমৃত দশ বছরের ছেলের বুকের উপর পড়ে থাকা অসাড়, নিঃস্পন্দ, শবদেহের মতো চৌধুরীর স্ত্রীকে দেখে জনৈক মহিলা নিরুদ্ধ শোকের বাঁধ ভেঙ্গে আকুল কান্নায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, 'মেলা' গল্পে হারিয়ে যাওয়া একটি ছোট মেয়েকে বুকের মধ্যে পেয়ে দেহপসারিণী কমলি তার উপ-জীবিকা ত্যাগ করে পালিয়ে এসেছে, 'তপোভঙ্গ' গল্পে নানা প্রক্রিয়া

সত্ত্বেও হৈমবতীর বন্ধ্যাত্ব না ঘুচলে তিনি যখন সংযতভাবে দিন যাপন করছিলেন তখন ভোলানাথবাবুর মেয়ের বিয়ের দিন রোশনচৌকী ও হৈ-চৈ শুনে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না, তাঁর যেন তপোভঙ্গ ঘটল, 'বাবুরামের বাবুয়া'য় সন্তানহীনতার জন্য বাবুরাম উন্মাদ হয়ে যায়। 'হৈমবতীর প্রত্যাবর্তন'-এ খাণ্ডারণী, ঝাঁসীর রাণী, হৈমবতী নিঃসন্তান হলেও ভালবাসতেন সপত্নীপুত্র নীলুকে কিন্তু নানা ঘটনায় তিনি হয়ে উঠলেন রূঢ় রুক্ষ নির্মম মেজাজী ও পাথরের মতো শক্ত। তারপর, তিরিশ বছর বাদে বৃন্দাবনে যাবার পথে নীলুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে নীলুর পৌত্রকে পেয়ে তিনি যেন নতুন বন্ধনে বাঁধা পড়ে যান। 'স্থলপদ্ম' গল্পে বেলে সন্তানের জন্য পতি পরিবর্তন করতে দ্বিধাবোধ করেনি এবং গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যুর কারণ হওয়ায় উন্মাদ হয়ে গেছে, 'মতিলাল' গল্পে কুৎসিতদর্শন মতিলালের সন্তান-হীনতা তাদের জীবনে গভীরতম বেদনার সৃষ্টি করলে মাতুলি ধারণ করে মতিলাল পিতৃত্ব কামনা করেছিল, কিন্তু তার কদর্য রূপের জন্য সে লাঞ্ছিত হয়ে মাতুলি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে, 'অহেতুক' গল্পের ঘোষ-গিন্নীও বন্ধ্যানারীর অন্তর্জ্বালায় প্রতিনিয়ত জ্বলে-পুড়ে মরছে,— তার ব্যবহারে বাড়ীওয়ালা অতিষ্ঠ, ভাড়াটে অধ্যাপক-দম্পতি নাজেহাল, স্বামী বিব্রত বিচলিত ও লজ্জিত। ভিখারির সানুনয় প্রার্থনা থেকে শুরু করে বেতারের সুললিত অনুষ্ঠান—সবকিছুতেই তার বিরক্তি। তবু সে এক নবপরিচিত মেয়ের অশান্ত, ডাকাত ছেলেটাকে কেন যে মাথার চুল ধরে টানতে দিয়েছিল, (যাতে অসহ্য বেদনা হতে থাকে এবং পরের দিন রগের শিরা ছিঁড়ে যেতে থাকে) তা রীতিমতো বিস্ময়ের ঘটনা হলেও বন্ধ্যানারীর অবচেতন হৃদয়ের বাসনাকে তির্যকভাবে প্রকাশ করেছে। 'পুত্রেষ্টি' গল্পে সন্তানহীনতার বেদনাকে তীব্রতমরূপে অভিব্যক্ত করা হয়েছে—নিজের সন্তানের জন্য পরের সন্তানকে বলি দেওয়ার বাসনায় মেজকর্তা রাত্রির অন্ধকারে নিদ্রিতা মেজগিন্নির কাছ থেকে চাটুজ্জেদের ছোট ছেলেটিকে চুরি

ও দেশপ্রেম ('মধুমাস্টার' গল্প), বিকৃতচরিত্র কিশোরের জান্তব প্রবৃত্তি ও উদ্‌ভ্রান্ত জীবনযাত্রা ('ট্যারা' গল্প), গোহত্যাকারীকে হত্যা করে মনুষ্যেতর প্রাণীর প্রতি চূড়ান্ত মমতা প্রদর্শন ('কামধেনু' গল্প), মানবতার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে সংস্কারের জয়ঘোষণা ('পাটনী' গল্প), কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হিংস্র মানুষের ভয়ালতা ('বরমলাগের মাঠ' গল্প), পারিবারিক প্রভাবে আচ্ছন্ন স্বাভাবিক মানুষের চিত্তবিকার ('প্রতিধ্বনি' গল্প) আর্থিক অসচ্ছলতার ফলে বনেদী বংশের ছেলের হীন বৃত্তি অবলম্বন ('রাজপুত্র' গল্প), পাঠশালার পণ্ডিতের ছাত্রপ্রীতি ও মনোবেদনা ('হরিপণ্ডিতের কাহিনী' গল্প)' ভয়াল পরিবেশে জান্তব বিভীষিকার মতো আততায়ী কর্তৃক নিজের একমাত্র পুত্রকে হত্যা ('আখড়াইয়ের দীঘি' গল্প), একটি স্নেহপ্রবণা হৃদয়বতী কিশোরীর প্রেম ও বাসনার উপর ডাকিনীর অপবাদ ও অলৌকিক উপায়ে চরিত্রভ্রষ্ট করে দেওয়ার ফলে তার আমৃত্যু সুতীব্র অন্তর্দহন ('ডাইনী' গল্প), স্বামীর আততায়ীর প্রতি ক্ষমাসুন্দর প্রসন্নতা ('না' গল্প), একান্নবর্তী পরিবারে গৃহস্থবধুর হৃদয়বত্তা ('চাঁপাডাঙার বৌ' উপন্যাস এবং এই উপন্যাসেরই সংক্ষিপ্তরূপ 'বড় বৌ' গল্প) একান্নবর্তী পরিবার থেকে স্বামীগৃহে যাত্রার প্রাক্‌কালে সকলের বিচ্ছেদবেদনার আলোকে ক্ষণকালের জন্য উদ্ভাসিত মহিমময় স্নেহ ('রাণুর বিবাহ' গল্প) অপুত্রক, সংসারত্যাগিনী নারীর অপরের সন্তানের জন্য মধুর মাতৃত্ব ('স্বর্গমর্ত্য' উপন্যাস), রহস্যময়ী যাদুকরীর কৃপায় কয়েকটি সমস্যার সমাধান ('যাদুকরী' গল্প), শ্বশুরালয় ও পিত্রালয়ের মর্যাদাবৃদ্ধির জন্য অকারণ মিথ্যাভাষণ ('তাসের ঘর' গল্প) একান্নবর্তী পরিবারের নির্লজ্জ স্বার্থপরতা ('কাঁটা' গল্প), অতৃপ্ত নারী জীবনে নীতিহীনতার প্রবণতা ('মরা মাটি' গল্প), মিথ্যাভাষণের মাধ্যমে জীবিকানির্বাহের ফন্দী ('ব্যাঘ্রচর্ম' গল্প), এক চূড়ান্ত নৈরাজ্যের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল জীবনের অবসান ('ইস্কাপন' গল্প), পথভ্রষ্ট জীবনে প্রেমের সন্ধান এবং প্রেমিকার মৃত্যুতে পুনরায় নিরুদ্দেশ

যাত্রা ('প্রত্যাবর্তন' গল্প), সংবেদনশীল শিল্পী কর্তৃক প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সম্ভ্রান্ত পরিবারের নির্যাতিতা তরুণী বধূর রূপ প্রতিফলন এবং বধূটির আত্মহত্যা ('প্রতিমা' গল্প), আদর্শচ্যুত বাউলের আত্যন্তিক আসক্তিজনিত মৃত্যু ('বাউল' গল্প), দীর্ঘায়ু মানুষের অনাসক্ত জীবনচর্যা ('সনাতন' গল্প), একটি পাথরকে কেন্দ্র করে হিসেবী, সুদখোর লোকের স্বপ্ন দেখা ও তজ্জনিত মৃত্যু ('বিষপাথর' গল্প), উদাসীন, বাউণ্ডুলে ও নেশাখোর মানুষের সম্পত্তিতে আসক্তি ('চণ্ডীরায়ের সন্ন্যাস' গল্প), জীবনধর্ম সমাজধর্ম ও মানবধর্মের একটা চূড়ান্ত নেতিবাদী শূন্যতায় মিলিয়ে যাওয়া ও মন্বন্তরের ফলে সমগ্র দেশের একটা ন্যক্কারজনক নগ্নমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ ('তিনশূন্য' গল্প), সমাজ-লাঞ্ছিত এবং স্বজন-কর্তৃক প্রবঞ্চিত মানুষের হৃদয়বেদনা ('সংকেত' উপন্যাস) তারাশঙ্করের সাহিত্যের কয়েকটি অবলম্বিত বিষয়বস্তু। বৈচিত্র্যের দিক থেকে নিঃসন্দেহে সমকালীন লেখকদের তুলনায় তাঁর উপজীব্যের পরিধি যথেষ্ট প্রসারিত, তিনি যেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের হৃদয়বেদনার শরিক হতে চেয়েছেন। চরিত্র ও চরিত্রসঞ্জাত উপলব্ধির এতখানি বিষয়বৈচিত্র্য তারাশঙ্কর ব্যতীত আমাদের সাহিত্যে আর কারো নেই। পটভূমি কিংবা পরিবেশ হিসেবে বিরল বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া এই সকল রচনায় তাঁর সামাজিক চেতনার কোনো বিশেষ পরিচয় নেই, হৃদয়গত চিরন্তন চিত্তবৃত্তির সমস্যাই এখানে মুখ্যত স্বীকৃত।

'আগুন' ও 'পদচিহ্ন' উপন্যাস দু'টিতেও লেখক সমাজ-চেতনা-নিরপেক্ষ দুটি স্বতন্ত্র স্বাদের বিষয়বস্তুকে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রথম উপন্যাসটির নায়ক চন্দ্রনাথ আজন্ম একগুঁয়ে তেজী দৃঢ়চেতা ও আদর্শবাদী। সে কোনো কিছুর সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে পারে না। অমিত সম্ভাবনা-সত্ত্বেও সে স্কুলের শিক্ষকের সঙ্গে, পরিবারের শ্রদ্ধাভাজন অগ্রজের সঙ্গে একমত হতে না পারলে তাদের সংস্রব ত্যাগ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয়নি। অতঃপর সবকিছু ত্যাগ করে যুদ্ধে যোগদান

করল—সেখানে মৃত্যুর ভয়াবহতা, মনুষ্যত্বের নিদারুণ অপমান ও পৈশাচিকতা তাকে ব্যথিত করে, ক্ষুব্ধ করে। যুদ্ধ থেকে পালিয়ে সন্ন্যাসীর বেশে সারা ভারত পরিভ্রমণ করার সময় একদা একটি মেলায় তার প্রিয় লাঠিটিকে কেন্দ্র করে পাঞ্জাবী মেয়ে মীরার সঙ্গে সাক্ষাৎ, প্রেম, বিবাহ। আবার জীবনে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নামতে হল, গড়ে উঠল কারখানা, রাতদিনের পরিশ্রমে কারখানার উন্নতি শুরু হল কিন্তু নেশাগ্রস্ত মাতালের মতো সে মীরাকে ভুলে, ছেলেকে ভুলে কেবল কারখানার কথাই ভাবতে লাগল। নিঃসীম নিঃসঙ্গতায় মীরা ক্রমশ হাঁপিয়ে ওঠে, এমন সময় ছেলেটি মারা গেল। ফলে, মীরার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটল। কারখানার অবস্থা অবনতির দিকে চলে যাওয়ায় সে কারখানাটি বেচে দেয়। চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে আসার পথে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় মীরা আত্মহত্যা করে এবং চন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ অসহায়ের মতো দুঃসহ একাকিত্বে কলকাতার পথে পথে চাকরির সন্ধান করে বেড়ায়। চন্দ্রনাথের পরই 'আগুন' উপন্যাসে হীরুর চরিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। হীরু ধনীর সন্তান, তাছাড়া অন্যান্য আত্মীয়দের বহু সম্পত্তির সে অধিকারী। তাই যৌবনের নেশায় মশগুল, চন্দ্রনাথের মতো কোনো উচ্চাভিলাষ ছিল না তার মনে। সে বুঝত জীবনটাকে উপভোগ করাই হল বেঁচে থাকার মূলধর্ম। একদা এক উৎসবের রাত্রিতে সুযৌবনা যাযাবরীর চটুল নৃত্যছন্দে, চপল হাসিতে ও বিলোল কটাক্ষে বশীভূত হল। ঘনিষ্ঠতর হল পাখি-শিকারের সূত্রে। যাযাবরীকে, তার সাধের চিত্রাঙ্গদাকে, সে বিয়ে করে পত্নীত্বের মর্যাদা দিল। নারীর চিরন্তন ধর্ম সন্তানাকাঙ্ক্ষা, আর সেই আকাঙ্ক্ষার ফলে তার গর্ভে এল হীরুর সন্তান, কিন্তু হীরু হয়ে উঠল তার অজাত সন্তানের প্রতিদ্বন্দ্বী। যাযাবরী তা জানতে পেরে পালিয়ে যায় এবং শোকে ক্ষোভে অনুশোচনায় হীরু উচ্ছৃঙ্খল অমিতাচারী হয়ে ওঠে। পরিণামে মারাত্মক যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় ইউরোপ যাত্রার সঙ্কল্প করে।

চন্দ্রনাথ ও হীরু—এই দুই বন্ধুর আবর্তে তুলেছে তাদের বন্ধু নরু, সাহিত্যিক নরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সে সংযমী মিতবাক্ আদর্শবাদী ভদ্র এবং পরোপকারী। এই দুই বন্ধুর মনের আগুন প্রশমিত করতে সে তীব্রভাবে, সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করেছে। চন্দ্রনাথের দাদার সংসারে অনাসক্তি এবং তজ্জনিত বৌদির প্রচণ্ড মানসিক ক্ষোভ নরুকে বেদনাহত করেছে। পরিণামে সে চন্দ্রনাথের ভাইঝিকে বিয়ে করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তার মধ্যে যতো না আছে প্রেম, তদপেক্ষা বেশি আছে যে-কোনো প্রকারে বৌদির মনে কিছুটা শান্তি ও সান্ত্বনার সৃষ্টি করা।

মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্রগুলি আলোড়িত ও আবর্তিত হলেও তাদের মধ্যে বিশেষ কোনো বৈপরীত্য নেই—চন্দ্রনাথের দাদার সংসারে অনাসক্তি, চন্দ্রনাথের উচ্চাশা, হীরুর অমিতচারিতা, অনেকটা যেন সরলরেখায় অঙ্কিত। এই উপন্যাসের ঘটনাবলীর দ্রষ্টা ও কথক নরুর অভিজ্ঞতার অংশীদার হয়ে পাঠকেরা জানতে পারে, চন্দ্রনাথের বৌদির সামান্যতম দাবি তার স্বামী মেটায়নি, মীরার আকাঙ্ক্ষাকে চন্দ্রনাথ প্রতি মুহূর্তে ডিঙ্গিয়ে যেতে চেয়েছে এবং যাযাবরীর সযত্নলালিত স্পৃহায় হীরুর সুনিশ্চিত বিরোধিতার সঙ্কেতে তাদের দাম্পত্যজীবনে বিচ্ছেদ দেখা দিল অথচ ভাঙ্গনের মুখে দাঁড়িয়েও পুরুষ চরিত্রগুলি হৃদয়ের মধ্যে একবারও দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব অনুভব করেনি।

'আগুনে'র তুলনায় 'পদচিহ্ন' উপন্যাসে একটু সমাজ জীবনের ছাপ আছে, যদিও তা বহিরঙ্গিক। 'পদচিহ্নে'র পটভূমি বীরভূমস্থিত নবগ্রাম এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অভিঘাতে আন্দোলিত গ্রাম। ঠিক যেন তারাশঙ্করের কৈশোরের জন্মস্থান, লাভপুর। একদিকে শাসকশক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার প্রয়াস, অন্যদিকে স্বদেশী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগণের উন্নতিসাধন-প্রচেষ্টা। তদানীন্তন বাংলার গ্রামীণ আবহাওয়ায় পুষ্ট মানুষেরা

রক্ষণশীলতা পছন্দ করে, পারস্পরিক কলহ-কোন্দলে নিয়ত ক্লান্তিহীন, এদেশে তখনো শিল্পযুগের আবির্ভাব হয়নি বলে মানুষের জীবনে ব্যস্ততা আসেনি, ধর্ম ও পরচর্চা নিয়ে বিলম্বিত লয়ে তারা দিনগুলো কোনোরকমে অতিবাহিত করে। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন বাংলা দেশের সমাজচেতনা মানুষের রুচি, নীতিবোধ, সংস্কারপ্রবণতা, ইংরেজভীতি ও তোষণ, বিবেকানন্দের দরিদ্রনারায়ণের ডাক, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের প্রভাবের মাধ্যমে লেখক ফুটিয়ে তুললেও এই উপন্যাসের চরিত্রায়নের ক্ষেত্রে কোনো সামাজিক চেতনাকে প্রস্ফুটিত করা হয়নি, অতএব 'পদচিহ্ন' বক্তব্যবাহী উপন্যাস হয়ে ওঠেনি।

এই উপন্যাসের নায়ক গোপীচন্দ্র তরুণ বয়সে ভাগ্যের অন্বেষণে সামান্যতম জীবিকা অবলম্বন করে দেশত্যাগ করেন এবং পরিণত বয়সে বিত্তশালী হয়ে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন। নানারকম জনহিতকর কার্য যথা, হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা, দেবালয়-স্থাপনা, জলাশয় খনন, ছাত্রাবাস নির্মাণ, বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির পরিকল্পনা তাঁর আছে। অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব এবং অমায়িক ব্যবহার ও মনোহর দৈহিক সৌন্দর্যে তিনি গ্রামবাসীর চিত্তজয় করেছিলেন। সমস্ত রকম মানুষের সঙ্গেই তাঁর প্রাণখোলা ব্যবহারে তিনি অপরিসীম জনপ্রিয়তা অর্জন করে-ছিলেন—কাঠের দোকানের কর্মচারীর কাছেও তিনি বিনীত, যুবক অধ্যাপক অমরের কাছে তিনি নম্র, আবার উদ্ধত ও কোপনস্বভাব জ্যেষ্ঠপুত্র কান্তিচন্দ্রের কাছেও তিনি কঠোর হতে পারেন না, খলচরিত্র মদ্যপ স্বর্ণভূষণের বিরুদ্ধতা করাও তাঁর ধর্ম নয়। কনিষ্ঠ পুত্র পবিত্র বিদ্যাশিক্ষায় অমনোযোগী হয়ে থিয়েটার করার আয়োজন করলে তাতে সায় দেন আবার কিশোর ও ডাক্তারের দরিদ্রনারায়ণের সেবাধর্মে সহায়ক হয়ে এগিয়ে আসেন। গোপীচন্দ্র ভদ্র ও ক্ষমতা-শালী ব্যক্তি কিন্তু আদর্শপ্রাণ শিক্ষিত ও ত্যাগী নন—এই দ্বিমুখী বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই চরিত্রাঙ্কনে তারাশঙ্কর পারদর্শিতা

দেখিয়েছেন। যে শিক্ষা থাকলে তিনি কীর্তিচন্দ্রের দুর্বিনীত ব্যবহারের প্রতিবাদ করতে পারতেন, ষোড়শীকে সুস্থ জীবনযাত্রায় পুনর্বাসিত করতে পারতেন, গ্রামীণ যুবকদের বেলেল্লাপনা দমন করতে পারতেন, মহাপ্রাণ রাধাকান্তকে চূড়ান্ত অপমানের হাত থেকে বাঁচাতে পারতেন, সে শিক্ষা ও আদর্শ তাঁর ছিল না। তাই তিনি সুস্থ চেতনার অভাবে যে সমাজ গড়ে তুললেন, সেখান থেকে ক্ষোভে, অপমানে আহত হয়ে রাধাকান্তকে স্বেচ্ছানির্বাসন মেনে নিতে হয়েছে।

সততা, বিশ্বাস ও নীতিবোধে উদ্দীপ্ত কয়েকটি চরিত্র অঙ্কন করে তারাশঙ্কর তাঁর এক বিশেষ মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন সাহিত্য-জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে। তিনি আবাল্য পারিবারিক প্রভাবে এক প্রচণ্ড নীতিবোধে বিশ্বাসী, সম্ভবত সেই নৈতিকতা তাঁর পরিণত বয়সে সত্যজিজ্ঞাসায় রূপান্তরিত হয়ে আধ্যাত্মিকতায় পরিণত হয়েছে; এর ফলে তাঁর শেষ পর্যায়ের রচনাবলী (ঐতিহাসিক উপন্যাস 'গন্নাবেগম' সহ) বিষয়বৈচিত্র্যে বহুধাবিস্তৃত হলেও চরিত্র-গুলির মানসিক প্রবণতার ক্ষেত্রে যেন একই লক্ষ্যাভিমুখীনতার পরিচয় দেয়। শরৎচন্দ্রের উত্তরণ হয়েছিল গ্রামীণ পটভূমি থেকে নাগরিক পরিবেশে, হৃদয়গত সমস্যা থেকে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যায়। ফলে তিনি স্বভাবসিদ্ধ প্রাঞ্জলতা হারিয়েছিলেন বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে, সাবলীলতা হারিয়েছিলেন চরিত্রায়নের, সুক্ষ্মদর্শিতার। তারাশঙ্করের বিবর্তন হয়েছে আঞ্চলিকতা থেকে নাগরিকতায়, রাঢ়ের রুক্ষ রিক্ত নির্মম হৃদয়জ্বালা থেকে বিশ্বজনীন প্রশান্ত প্রসন্ন উদার মানবিকতায়। তিনি ছিলেন রাঢ়ের লোকসংস্কৃতির নিপুণ রূপশিল্পী, তাঁর রচনায় পাওয়া যেত লালমাটির গন্ধ। উত্তরকালে তিনি উপন্যাসের পরিধিকে পরিব্যাপ্ত করেন সারা ভারতবর্ষে, কোনো চরিত্রকে পরিস্ফুটনের প্রয়োজনে নয়, অহেতুক কারণে—বিপাশার হৃদয়বেদনা বা রঙ্গনাথনের বিহ্বল প্রেমের উপাখ্যান কিংবা রৌশনের জ্বালাময়

যৌবনের ইতিহাস বলার জন্য ভিন্ন প্রাদেশিক পটভূমিকা অপরিহার্য ছিল না।

নীতিবোধের দিক থেকে তারাশঙ্কর শরৎচন্দ্রকে অনুসরণ করেন নি। এ ব্যাপারে তিনি বঙ্কিম-প্রভাবিত। সমাজ গড়ে ওঠে ব্যক্তির সমন্বয়ে, অতএব ব্যক্তি যদি নীতিবোধে উদ্দীপিত হয়, তাহলে আদর্শ সমাজগঠনের বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌছনো সম্ভব হতে পারে—তারাশঙ্কর মনে প্রাণে তা বিশ্বাস করেন। এই নৈতিকতাই তাঁর সাহিত্য-জীবনের উত্তরার্ধে অজস্র চরিত্রের মধ্যে অমৃতপিপাসা ও অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার আকুলতার সৃষ্টি করেছে। সততা, বিশ্বাস ও নীতিবোধে উজ্জীবিত কয়েকটি চরিত্রের কথা আলোচনা করা যাক। তাঁর গল্প-উপন্যাসে কেউ বৃদ্ধ বয়সে নিজ সম্প্রদায়ের মেয়ে-বৌদের ইজ্জত রক্ষার জন্য চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত হয় ('চোর' গল্প), কেউ কর্তব্যপালনের দায়িত্বে নিজের ছেলের শাস্তিকামনায় বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না ('ডাকহরকরা' গল্প), কেউ সাময়িক লোভে চুরি করলেও বিবেকের দংশনে অবিরত ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে ('টহলদার'গল্প), কেউ সমাজে অপাংক্তেয় বলে গণ্য হলেও স্নেহশীল ব্যক্তির ঋণ স্বীকার করে নিজের জীবনের বিনিময়ে ('জটায়ু' গল্প), কেউ ঠাকুরের গয়না চুরি করলেও পরিণামে এক অপরিসীম আত্মযন্ত্রণার মধ্যে মারা যায় ('ব্যাধি' গল্প), কেউ দুশ্চরিত্র স্বামীর সঙ্গে সহবাসের ফলে চরিত্রভ্রষ্টতায় গয়না চুরি করে বিবেকের জ্বালায় আত্মহত্যা করে ('কুলীনের মেয়ে' গল্প), স্বামীর মৃত্যুর পর চৌর্যবৃত্তি পরিত্যাগ করলেও তাকে পুনরায় প্রলুব্ধ করায় কেউ বা আত্মহত্যা করে ('সুরতহাল রিপোর্ট' গল্প), কেউ আবার জীবনে কৃতী পুরুষ হিসেবে সার্থকতা না পেলেও শিল্পের ক্ষেত্রে নিয়মনিষ্ঠার অভাব সহ্য করে না ('চন্দ্রজামাইয়ের জীবন কথা' গল্প), কেউ গণিকালয়ে বীভৎস পরিবেশে আসক্ত হয়েও একটি শিশুকন্যার গলা থেকে সোনার হার চুরি করে জীবনটাকে নীতিনিষ্ঠ করে গড়ে তোলার প্রেরণা পায় ('মালাকার' গল্প), কেউ

পেশায় নিযুক্ত হয়ে অপরিসীম দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেওয়ার ফলে পরিণত বয়সে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কিছু সুখ সুবিধা পেয়েছে ('চারহাটীর ষ্টেশনমাস্টার' গল্প)। জীবনে বিভিন্ন পর্যায়ে লেখা এই গল্পগুলিতে তারাশঙ্কর নীতিবোধে উদ্দীপ্ত ও বিবেকের দ্বারা চালিত কয়েকটি চরিত্র সৃষ্টি করে যেন এই কথা বলতে চেয়েছেন, সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিশেষত দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্ত মহলে আর্থিক বা পারিবারিক অসুবিধার ফলে অনেক জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও মানুষ আসলে অসৎ বা নীতিভ্রষ্ট নয়, তার মনের গভীরে অনির্বাণ শিখার মতো প্রদীপ্ত রয়েছে ন্যায়, সততা ও বিশ্বাসের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধামিশ্রিত আকুলতা। সাময়িকভাবে হয়তো সে আবেগের তাড়নায় বা জৈবিক প্রয়োজনে অথবা অর্থনৈতিক চাপে নিষ্পেষিত হয়ে অন্যায় করতে পারে, কিন্তু তার সত্তার গভীরে থাকে সেই অন্যায়ের জন্য পাপবোধ—জীবনে সে তার মনের অবচেতন থেকে সেই পাপবোধকে উন্মূলিত করতে পারে না। তাঁর এই বোধের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপায়ণ 'বিচারক' উপন্যাস।

'বিচারক' উপন্যাসের নায়ক জ্ঞানেন্দ্রনাথ একজন নিপুণ ও অভিজ্ঞ বিচারক, কিন্তু এমন একটি খুনের মামলা তাঁর হাতে এসে পড়ল যার সঙ্গে তাঁর নিজের জীবনের একটা আশ্চর্য সাদৃশ্য; খগেনের মৃত্যুর জন্য যদি নগেনকে দায়ী করা হয়, তাহলে তাঁর স্ত্রী সুমতির অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় মৃত্যুর জন্যও তিনি দায়ী। নগেন সম্পত্তির লোভে এবং রূপবতী বিধবা চাঁপার মোহে খগেনকে মুমূর্ষু অবস্থায় বাঁচানোর চেষ্টা না করার অপরাধে অপরাধী, সমান্তরালভাবে জ্ঞানেন্দ্রনাথও সুরমার প্রতি প্রেমমুগ্ধতার ফলে নিজের স্ত্রীকে সময়মতো আগুনের হাত থেকে বাঁচাতে পারেননি। মোহমুক্ত বিচারকের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল যেন একটি নিষ্ঠুর সত্য এবং তিনি সেই সত্যকে প্রকাশ করার সৎসাহসে উদ্বুদ্ধ হলেন।

শুধু ব্যক্তিজীবনের ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের পশ্চাতেও

পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্বের একটা ছায়া কাজ করে। 'শ্রীহরি ঘোষ এবং দেবু বা ইন্দ্র রায় এবং বিমলবাবু বা শিবনাথ এবং তার শ্বশুরবাড়ি বা করালী এবং কাহারপাড়া এদের সংঘাতের মধ্যে বর্তমান ভবিষ্যৎ, ভালো-মন্দের যুদ্ধ, ন্যায়-অন্যায়ের যুদ্ধ প্রভৃতি মোটা দাগের নৈতিক প্রশ্নও জড়িত থাকে। রূপকথার প্যাটার্ণ এই নৈতিক চেতনাকে এভাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। কথক যেমন তার সমস্ত কথকতার শেষে স্বস্তিবাণী উচ্চারণ করেন—তারাশঙ্করের সমস্ত উপন্যাসের ফলশ্রুতি সেই স্বস্তিবাণী।'[৮] হার্দ্দিক বা সামাজিক সমস্যাগত প্রশ্নে তারাশঙ্কর প্রায় সর্বক্ষেত্রেই নৈতিক মানদণ্ডে অবস্থার বিচার করতে চেয়েছেন, বুঝতে চেয়েছেন।

৮

ব্যক্তি ও সমাজ-পটভূমি

ম্যাক্স ওয়েবারের রচনা থেকে ইতিপূর্বেই আমরা লক্ষ্য করেছি সামাজিক রূপান্তরের ইতিহাস। যে সমস্যাগুলি পূর্বসূরীদের গভীর-ভাবে আলোড়িত করেছিল, তারাশঙ্করের যুগে সেগুলির গুরুত্ব অনেকাংশে কমে গিয়েছিল, পরিবর্তে কয়েকটি নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। কৃষিপ্রধান স্থবির সমাজ দ্রুত শিল্পায়নের পথে অগ্রসর হওয়ায় স্পষ্টগোচর হয়ে উঠেছিল দুই কালের দ্বন্দ্ব, শরৎ-সমকালীন সামন্ততন্ত্রের অপ্রতিহত দৌরাত্ম্য তারাশঙ্করের যুগে নতুন শিল্পপতিদের সঙ্গে সংঘাতে ক্রমবিলীয়মানতায় ম্লান ও ধূসর হয়ে উঠেছে, সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য তারাশঙ্করের কালে উগ্রতররূপে আত্মপ্রকাশ করায় তাঁর শিল্পিসত্তা এক নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। তদুপরি তারাশঙ্করের কালে স্বাধীন ভারত বহুতর সমস্যা নিয়ে উপস্থিত, যার সমাধানের জন্য তিনি কোনো বিদ্রোহে বা বিক্ষোভে আস্থাশীল নন, পরন্তু তিনি সমস্ত বিভেদ ও বিরোধের ঊর্ধ্বে উঠে গঠনকর্মে

আত্মনিয়োগ করতে রীতিমতো উৎসাহী। সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন। সুন্দর সাহিত্যরচনাই তাঁর জীবনের একমাত্র আদর্শ নয়, সাহিত্য তাঁর কাছে শাস্ত্র যা মানুষকে সকল প্রকার বেদনা দুঃখ ও গ্লানির শাসন ও পীড়ন থেকে ত্রাণ করতে পারে। সাহিত্য তাঁর কাছে চায়ের পেয়ালার মতো অবসর বিনোদনের পানীয় সামগ্রী নয়, পরন্তু প্রাণরসদায়ী সঞ্জীবনী সুধা। জীবন-সত্যকে মানুষ তার সভ্যতার আদিকাল থেকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর রূপে প্রকাশিত করে চলেছে—সাহিত্য তাকেই প্রতিফলিত করে চলেছে তার সঙ্গে সঙ্গে—সহিতে সহিতে—তাই তার নাম সাহিত্য। যাঁর ভাবনা যাঁর দৃষ্টি যাঁর সৃষ্টি জীবনের সহিতে অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে চলে তিনিই সাহিত্যিক। তারাশঙ্করের কাছে 'সাহিত্যিক ও শাস্ত্রকারে কোন প্রভেদ নেই।'

অতএব, জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সমাজের প্রত্যেকটি বিশিষ্ট ও বিচিত্র ঘটনা তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়বেই। বিষণ্ণতার সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করেছেন পরিবর্তনশীল কালধর্মকে, অতীত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আসন্ন নতুন কালের প্রতি বিমুখতার অভাব, তাঁর সাহিত্যের একটা বৃহদংশের মধ্যে প্রচণ্ড বৈপরীত্যের সৃষ্টি করেছে। তবে অতীতের প্রতি প্রগাঢ় অনুরক্তির ফলে তিনি এই সংঘাতের ক্ষেত্রে প্রায়শই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন এবং অস্তাচলগামী অতীতের ক্রমবিলীয়মান আলোকরশ্মি যেন অপরাহ্নের বিষণ্ন ম্লানিমায় ধূসর হয়ে পাঠকচিত্তকে অধিকতর বেদনাভারাতুর করে তোলে। তবে এইজাতীয় রচনায় তারাশঙ্কর বালজাকের 'দি পেজান্টস্'-এর মতো চরিত্রায়নের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেননি। কাল যেন অমোঘ নিয়তির মতো নিষ্ঠুর অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে আসছে, অতীতাশ্রয়ী পুরোনো সমাজকে সে যেন গুঁড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলবে। সে কালের বাহনের কোনো প্রয়োজন হয় না, বিমল মুখুজ্যের মতো দেশী শিল্পপতির হাতে রামেশ্বর ও ইন্দ্র রায়ের

পতন তাই অবধারিত। নিজে তিনি খুব ধনী জমিদারবংশের সন্তান না হলেও খুব প্রতিপত্তিশালী জমিদার বংশের ঐতিহ্যে লালিত হয়েছেন। 'রায়বাড়ি'র রাবণেশ্বর, 'জলসাঘরে'র বিশ্বম্ভর, 'ধাত্রীদেবতা'র শিবনাথ ও 'কালিন্দী'র ইন্দ্র—এই সব জমিদার চরিত্রের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও আকর্ষণ সহজেই অনুভববেদ্য। সেকালের গ্রাম্য সমাজে অনেক সুখশান্তি, শুভবুদ্ধি ও মানবিক গুণাগুণ-বোধ ছিল—এই অনুভূতি তাঁর সমাজচিত্রে অভিব্যক্ত। কিন্তু জীবনশিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে যখন তিনি এই চরিত্র ও সমাজকে চলমান করেছেন তাঁর সাহিত্যে, তখন তার অবশ্যম্ভাবী পতন ও ধ্বংসের বিষণ্ণমূর্তি তিনি দেখতে পেয়েছেন। নতুন সমাজ কী রকম ও নবযুগের মানুষ কারা, তারও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তার ভিতর থেকে ফুটে উঠেছে। কলের মালিক, যন্ত্রসভ্যতার দাস যারা —এ যুগের তারাই প্রতিনিধি। একালের জীবনের ছন্দ যন্ত্রের ছন্দে ধ্বনিত। সেকালের আত্মসমাহিত গ্রাম্যসমাজ অচল, কারণ তার ভিত্তিস্তম্ভগুলি একে একে ভেঙে পড়েছে। এমন কি, সেকালের পাণ্ডিত্যগৌরবের অবশেষ ন্যায়রত্নরাও দেশত্যাগী হতে আজ বাধ্য। অচলা ভক্তির স্থান দখল করেছে বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস, অতিপ্রাকৃত জগৎ প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে যন্ত্রসভ্যতার প্রসারণশীল চাহিদায়, জীবন ও মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন করতে চেয়ে মানুষ যেন নিয়তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে আগ্রহী। মানবজীবনের ধর্ম ও মূলমন্ত্র 'চরৈবেতি' এবং এই মূলমন্ত্রে তারাশঙ্করের বিশ্বাস হাজার রকমের ভাঙনের ও হতাশার মধ্যেও অবিচলিত। বিলীয়মান অতীতের প্রতি বিষণ্ণতা বোধ করলেও তিনি নতুন কালের নিষ্ঠুরতর পদধ্বনির প্রতি আগ্রহের সঙ্গে কান পেতেছেন। এই পদধ্বনি তাঁর শিল্পিসত্তায় কোনো পুলক-সঞ্চার করেনি। মহিম গাঙ্গুলী, অহীন, প্রদ্যোত বা করালীর অভিযাত্রাকে তিনি যেন নিয়তির অমোঘ নির্দেশ হিসেবে মেনে নিয়েছেন ; এদের ক্রিয়াকলাপে কোনো বৃহত্তর মানবমুক্তির আভাস

পাওয়া যায় না। আধুনিক ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ লেখকের দায়িত্বপালন করতে গেলে যুগলক্ষণকে অস্বীকার করা অসম্ভব, মূলত সেই কারণেই তিনি এ যুগের মানুষকে রূপায়িত করতে চেয়েছেন কিন্তু বিজ্ঞান ও যন্ত্রসভ্যতার অমোঘ পরিণতিরূপে একালের মানুষের স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা ও আত্মম্ভরিতা তাঁকে ব্যথিত করেছে। শুধু জমিদারশ্রেণীই নয়, সামগ্রিকভাবে অতীতকালের মানুষদের উদারতা, ন্যায়বোধ ও সামাজিক সম্প্রীতি তারাশঙ্করকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে (ভিন্নতর প্রসঙ্গে উদাহরণ সহযোগে আমি এই প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব)। জীবনের পুরোনো বিন্যাসের ছকে রূপান্তরের ফলে সেখানে যে আঘাতের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, সেকথা বলার জন্য তারাশঙ্কর নায়ক চরিত্র সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়েছেন। অথচ সে রূপান্তর সৃজনের মাধ্যম হিসেবে করালী অহীন বা শিবনাথ যেন অনেকটা ইতিহাসের যন্ত্র, তাদের মানসলোকে বিশেষ কোনো দ্বন্দ্ব বা টানাপোড়েন নেই এবং সে কারণে কোনো নাটকীয় সার্থকতাও নেই। তুলনায় বনোয়ারী বা ইন্দ্র রায় অনেকটা বিশ্বাসগ্রাহ্য, নিছক আইডিয়াসর্বস্ব নয়, তাদের চরিত্রসৃজনে কিঞ্চিত পক্ষপাতদুষ্ট তারাশঙ্করের অবজেকটিভ্ চেতনার পূর্ণসিদ্ধি ঘটেছে। এবং এই জন্যই 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' ও 'কালিন্দী' করালী এবং অহীনের চেতনার নবজন্মের কাহিনী না হয়ে বনোয়ারী এবং ইন্দ্র রায়ের জীবনের বেদনাবিধূর গল্প হয়ে ওঠে। নবযুগের বাহন হিসেবে অহীন, করালী, প্রদ্যোত ডাক্তার বা আরতির অন্তর্দ্বন্দ্বকে তারাশঙ্কর কখনোই প্রত্যয়গ্রাহ্য করে তুলতে চাননি। অহীন কী করে নিজ জন্মের পরিবেশ ছাড়িয়ে মার্কসবাদী হয়, করালী জুটো বিয়ে করতে চাইলে তার পাপবোধে আঘাত লাগে না কেন, জীবন মশায়ের মহদাশয়তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকলেও কেন তা প্রদ্যোতের ব্যক্তিগত সম্পর্কের সীমা ছাড়িয়ে উঠতে পারল না এবং আরতি গান্ধীবাদ গ্রহণ করে কিসের ভিত্তিতে এ সমস্ত প্রশ্নে তারাশঙ্করের শিল্পিসত্তা আলোড়িত হয়নি।

সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর চারদিকের রূপান্তরমুখী ইতিহাস কী ভাঙ্গন, আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তা বলার উপযুক্ত ক্ষেত্রহিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন বর্ধমান-বীরভূমের সুবিস্তীর্ণ এলাকা। উপনিবেশের প্রভুদের ছত্রছায়ায় থেকেও এক ধরণের অর্ধ-গঠিত বাঙ্গালী শিল্পপতি ও বাঙ্গালী ব্যবসায়ী চরিত্রের বিকাশ এ অঞ্চলে ঘটেছে যা বাংলার অন্যত্র বিরল। তারাশঙ্করের উপন্যাসে এ ধরণের ব্যবসায়ী-চরিত্রের ভূমিকা সর্বত্রই বিদ্যমান। 'কালিন্দী'র বিমল মুখুজ্যে বা 'ধাত্রীদেবতা'র শিবনাথের শ্বশুর বা 'উত্তরায়ণে'র আরতির বাবা শুধু নয়, আরো প্রমাণ এ প্রসঙ্গে দেওয়া চলে। অবশ্য এদের ভূমিকা সম্বন্ধে তারাশঙ্কর ওয়াকিবহাল হলেও তার পূর্ণ ব্যবহার তাঁর উপন্যাসে হয়নি, যদিও এই নতুন ব্যবসায়ীশ্রেণীর সংঘর্ষে ধ্বংসমুখী জমিদার বা ভূম্যধিকারীদের চরিত্র তারাশঙ্কর উপন্যাসে অনেকবার ব্যবহার করেছেন।

জমিদার-বিষয়ক গল্প-উপন্যাসগুলির ভাববস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের আকর্ষণের মূল কারণ এই চরিত্রগুলির কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—তাদের মানসিক বিকৃতি, অপ্রকৃতিস্থতা, উদ্ভট ও বাস্তববিমুখ খামখেয়ালিপনা, উৎকেন্দ্রিক জীবনবোধ। তৎসহ আছে সেকালের সামন্তযুগের অঢেল ঐশ্বর্য ও অমিত শৌর্যের প্রতি তাঁর বিস্ময়াবিষ্ট মোহ, যদিও মর্মে তিনি অনুভব করেছেন যে এই মোহ মিথ্যা, এই ঐশ্বর্য ও শৌর্য নিশ্চিত বিলীয়মান। প্রশস্তবক্ষ স্বেচ্ছাচারী সামন্তের যুগ অস্ত যাবেই, সংকীর্ণচিত্ত হিসেবী যন্ত্রমালিকের যুগের উদয় অবধারিত। বক্ষের এই প্রশস্ততার প্রতি তারাশঙ্কর তাঁর হৃদয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণ গোপন করতে পারেননি, হোক সে প্রশস্ততা সেকালের, অথবা মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারীর চরিত্রসঙ্গী।

জমিদারশ্রেণীর প্রতি তারাশঙ্করের লেখকহিসেবে প্রভূত আকর্ষণ-বোধের অন্যতম কারণ তাঁর সমাজ-সচেতনতা। সমাজ যখন এক কাল থেকে নতুন কালের দিকে মোড় নিতে থাকে, অবশ্যম্ভাবী

পরিবর্তনের তাগিদে দুর্বার বেগে এগিয়ে চলে তখন অতীত সমাজের আলোকে নতুন কালের স্বরূপনির্ণয় সমাজ-সচেতনতার পরিচায়ক। বিগত কয়েক শতাব্দীর সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আমাদের জীবনযাত্রা স্বাধীন, অপ্রতিহতপ্রভাব ভূস্বামীকূলের আদর্শ-আকাঙ্ক্ষা, বিলাস-ব্যসন, অত্যাচার-খেয়ালিপনা, সৌন্দর্য-রুচি ও আশ্রিতবাৎসল্য-গুণগ্রাহিতাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। 'জনসাধারণের বিশেষ কোন আত্মস্বাতন্ত্র্য বা আত্মনির্ধারণ শক্তি ছিল না—জমিদারের প্রভাবই তাহাদের প্রাণস্পন্দনের গতিবেগ ও ক্রিয়াশীলতার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়া দিত। দেশের মধ্যে যে দুর্ধর্ষ, নিয়ম-শৃঙ্খলার পরিপন্থী বিদ্রোহ-শক্তি ছড়ান ছিল, তাহা জমিদারের অত্যাচারের দ্বারাই উত্তেজিত হইয়া ঐক্য ও সংহতি লাভ করিত। জমিদারের দানশীলতা নদী-প্রবাহের ন্যায় দুই ধারে শ্যামলতা বিস্তার করিত। তাহার দৃপ্তগৌরব জাতির দুঃসাহসিকতাকে আত্ম-প্রকাশের অবসর দিত, তাহার অত্যাচারের বজ্রপাত প্রজার প্রতিকার-শক্তিকে উদ্‌বোধিত ও সংঘবদ্ধ করিত, তাহার ক্রমপ্রসারিত দাবী-দাওয়া জনসাধারণের বৈষয়িক বুদ্ধি ও স্বভাবসিদ্ধ চতুরতাকে তীক্ষ্ণতর করিয়া তুলিত। সুতরাং জাতির মুখপাত্র ও নেতা হিসাবে এই অভিজাতবর্গের সাহিত্যে ও ইতিহাসে স্থান আছে।'[১] অতএব, এই জমিদার শ্রেণীর ক্রমবিলীয়মানতায় সমাজ যে নতুন অবস্থার সম্মুখীন হতে চলেছে, সমাজ-সচেতন শিল্প-চেতনায় একালের অন্যতম প্রধান লেখক তারাশঙ্করের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। তবে, তারাশঙ্কর শুধু যে পুরোনো আমলের অন্তর্জীর্ণতা ও তার মহিমা-সুগভীর আভিজাত্যের মধ্যে এক মর্মান্তিক ট্র্যাজিক চেতনাকে রূপ দিয়েছেন তাই নয়, নতুনের সম্ভাবনাদীপ্ত আবির্ভাবকেও তাঁর রচনায় তিনি অনিবার্য করে তুলেছেন। জগৎ-বিধান তথা সমাজ-বিধানের এই সত্যকে নির্মম-নৈপুণ্যে রূপ দিয়েছেন তারাশঙ্কর। 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসের পটোত্তোলিত হয়েছে গ্রামবাংলার ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্রের

উপর—যেখানে কিংবদন্তী ও সংস্কারের মধ্যযুগীয় আবছা অন্ধকারের ঘোর তখনো কাটেনি, এবং উপন্যাসটি শেষ হয়েছে আধুনিক কলকাতার নাগরিক পটভূমিতে এসে—যেখানে দেশপ্রেম ও অভিনব জীবনচেতনার শপথ উচ্চারিত হয়েছে। 'কালিন্দী'তে ইন্দ্র রায়ের হাত থেকে শাসনদণ্ড স্খলিত হয়ে নববলদৃপ্ত শিল্পপতি মিঃ মুখার্জির শক্তি বৃদ্ধি করেছে। মিঃ মুখার্জির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ায় তারাশঙ্করের শিল্পিসত্তা যেভাবে বেদনাহত হয়েছে তাতে সহজেই বোঝা যায়, এই ধরনের সামাজিক রূপান্তরে তারাশঙ্কর খুশি নন, সমাজের এই নয়া অধিপতিরা অদূর ভবিষ্যতে সমাজে যে নতুন ধনতান্ত্রিক কাঠামোর জন্ম দেবে তাতে শ্রেণীবিলোপের প্রশ্ন তো দূরের কথা, শোষণ-বৈষম্য ও নির্যাতনের চূড়ান্ত ঘৃণিত রূপে তা আত্মপ্রকাশ করবে। তাই তখনকার দিনের বামপন্থী সমালোচকেরা এই উপন্যাসটিকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, পক্ষান্তরে প্রতি-ক্রিয়াশীল সমালোচকেরা এর মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন তারাশঙ্করের স্বধর্মচ্যুতির ইঙ্গিত। 'পঞ্চগ্রাম'-এর প্রবীণ ন্যায়রত্ন নবীনের সঙ্গে সংগ্রামে পর্যুদস্ত হয়ে দেশত্যাগ করেছেন—এবং সমকালীন যুগ-মানসকে অনুসরণ করে ন্যায়রত্ন-পৌত্র বিশ্বনাথ উপবীত বর্জন করে সাম্যবাদের মন্ত্র উচ্চারণ করেছে। 'পৌষলক্ষ্মী'তে নতুন কালের যুবক চেকার বিদ্রূপের উত্তর দিতে গিয়ে মহীরুহের মতো অচল অটল বৃদ্ধ মুকুন্দপালকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে, 'জলসাঘরে' সামন্তরক্তের ঐতিহ্যে স্পর্ধিত বলদর্পী বিশ্বম্ভর নতুন যুগের ধনতান্ত্রিক প্রতিযোগী মহিম গাঙ্গুলীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আত্মঘাতী হলেন, 'খাজাঞ্চীবাবু' গল্পে অনুগত ও বহুকালের বিশ্বস্ত খাজাঞ্চীবাবুকে নবনিযুক্ত কর্মাধ্যক্ষ বয়সের অজুহাতে বরখাস্ত করলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি নতুন আমলের সঙ্গে পুরোনো দিনের অমিলের বলি হয়েছেন, 'যাদুকরের মৃত্যু' গল্পে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের পারস্পরিক বিরোধিতায় এগিয়ে এসেছে তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাসী, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপে আস্থাশীল,

জমিদারকে হত্যা করার জন্য বাণ মারতে উদ্যত নাদের—শেষ পর্যন্ত সে ডাক্তারবাবুর স্বচ্ছ যুক্তি ও চিন্তাধারার কাছে নিজের অলৌকিক বিশ্বাসগুলোর আর কোনো মূল্য খুঁজে পায়নি।

এই ধরনের নতুন ও পুরোনো কালের সংঘাত, নতুনের মধ্যে পুরোনোর অবলুপ্তি এবং সেই অবলোপে তারাশঙ্করের শ্রদ্ধাবিমিশ্রিত বিষণ্ণতা এই পর্যায়ের সমস্ত রচনাগুলির বৈশিষ্ট্য। শিক্ষক জীবনকে কেন্দ্র করে তারাশঙ্কর কয়েকটি উল্লেখ্য চরিত্র সৃষ্টি করেছেন 'ইতিহাস' ও 'মধুমাস্টার' গল্পে, 'সন্দীপন পাঠশালা' উপন্যাসে। গল্প দুটির উল্লেখ ইতিপূর্বেই করেছি, উপন্যাসটির আলোচনা করব ভিন্নতর প্রসঙ্গে। কিন্তু কালের দ্বন্দ্বের প্রশ্নে তাঁর 'হেডমাস্টার' গল্পটিতে (যা পরবর্তীকালে বিস্তৃততর হয়ে দেবসাহিত্য কুটির থেকে 'গুরুদক্ষিণা' নামক উপন্যাসাকারে প্রকাশিত হয়েছে) এক আদর্শবাদী প্রবীণ শিক্ষকের জীবনের সুগভীর বেদনাকে তিনি আশ্চর্য সহমর্মিতায় রূপায়িত করেছেন। নবগ্রাম বিদ্যালয় চন্দ্রভূষণ বাবুর হাতেগড়া; স্বার্থত্যাগ, কৃচ্ছ্রসাধন ও তপস্যার ফলে এই শিক্ষায়তনের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। একমাত্র পুত্র ব্রজকিশোরের মৃত্যু হয়েছে, তবু তিনি শোকে দুঃখে ভেঙ্গে পড়েননি, এই প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক উন্নতির মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন সান্ত্বনা, স্কুলটিই যেন তাঁর সন্তানে রূপান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু যুগের আবহাওয়া চিরকাল একরকম থাকে না; অবস্থার, রুচির, চিন্তাধারার ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আসে। এক্ষেত্রেও এল ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সংঘর্ষের রূপ নিয়ে, 'রিলিজিয়াস' ক্লাস তুলে দেওয়ার দাবি উঠল, সুশৃঙ্খল ছেলেদের মধ্যেও দাবী উঠল পিতৃপিতামহের ধর্মসংক্রান্ত মতামতের বিরুদ্ধে, সবকিছুকে অস্বীকার করা অথবা বৈজ্ঞানিক বিচারের কষ্টিপাথরে যাচাই করার উন্মাদক উত্তেজক প্রবণতা দেখা দিল। সীতেশবাবু তরুণ শিক্ষক হলেও এই দলের প্রতিনিধি। বিরোধ ক্রমশ বিপর্যয়ের সৃষ্টি করল যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছাত্র-আন্দোলন,

ধর্মঘট এবং চন্দ্রভূষণবাবুর স্বেচ্ছায় পদত্যাগ। স্কুলের জুবিলি উৎসবেও তিনি যান নি, তবে 'তাঁর পত্র একখানি এসেছিল। তাতে রবীন্দ্র নাথের কবিতার একটি লাইন লেখা, একটু বদল করে দিয়েছিলেন—

যখন আমার চরণ-চিহ্ন পড়ে না আর এই ঘাটে,
তখন নাই বা মনে রাখলে।'

প্রাচীনকালের বেদনাবিমণ্ডিত ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেও তারাশঙ্কর এগিয়ে চলেছেন, কারণ তিনি মানুষের অপরাজেয় অভিযানে বিশ্বাসী। এই দুই কালের দ্বন্দ্ব জীবন-পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এক বৃহত্তর তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। দুই কালের সত্য এক অসামান্য রূপকের মধ্য দিয়ে তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছে:

'আমার সেকাল আর একালের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নাই। চির-কল্যাণের একটি ধারা আমি তার মধ্যে দেখতে পাই। কোন কালে ওপারে ফুটেছে ফুল—কোন কালে এপারে ফুটেছে ফুল। আমি সকল কালের সকল যুগের মালা গেঁথেই পরাতে চাই মহাকালের গলায়। ওই অর্ধনারীশ্বর মূর্তি আমার কালের রূপ ভেদ করেই একদা আমাকে দেখা দেবেন। সেদিন আমার মাল্যরচনা সার্থক হবে।'[২]

পরিবর্তনশীল সামাজিক পটভূমিকায় তিনি যেমন কালের দ্বন্দ্বে বিক্ষত মানুষের বেদনাকে বুঝতে চেয়েছেন, তেমনি সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্য ও শোষণে বিধ্বস্ত মানুষের বাঁচার সংগ্রামকেও তিনি লক্ষ্য করেছেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণি' সম্বন্ধে লেখক জানিয়েছিলেন—'এই গল্পটির মধ্যেই ('শ্মশানের পথে') আমার ভাবী সাহিত্যিক জীবনের সুর নিহিত ছিল। পল্লীজীবন, পল্লীসমাজ জীর্ণ হয়েছে, ভেঙে পড়তে গিয়ে কোনক্রমে সেই ভাঙা কাঠে বাঁশ ঠেকো খেয়ে ঝুঁকে পড়ে টিকে রয়েছে কায়ক্লেশে—শ্মশান আসছে এগিয়ে। জমিদার মহাজন কাবুলিওয়ালাদের শোষণ তাড়না, ম্যালেরিয়ার আক্রমণ; ঈশ্বরের নীরবতা—গ্রামের চাষীকে টেনে

নিয়ে চলেছে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের পথে, মৃত্যুর পথে।' তাই, এই উপন্যাসের পাতায় বিধ্বস্ত মানুষের চেহারা লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন আবেগদীপ্ত ভঙ্গিতে :

'মানুষ তো নয় সব, হাড়-চামড়া ঝরঝর করে, কংকালসার মানুষ অতি ক্ষীণ জীবনীশক্তি লইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায় : বাড়ি-ঘরের অবস্থাও তাই, দেওয়ালগুলির লেপন খসিয়া গিয়াছে, যেন পঞ্জরাস্থি বাহির হইয়া পড়িয়াছে ; চালও তাই, খড় বিপর্যস্ত, কাঠামো বাহির হইয়া পড়ে পড়ে। অবরুদ্ধ জীবন্তের রাজ্যের টুকরাখানা বুঝি আর থাকে না।'

তারাশঙ্কর প্রশ্ন করেছেন মানুষের ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত এই সর্বহারাদের 'কে রক্ষক ?' মানবপ্রেমী তারাশঙ্করের এই প্রশ্নে জবাব দিয়েছেন নাস্তিক্যবুদ্ধিতে উদ্দীপ্ত তারাশঙ্কর। রক্ষক অবশ্যই ভগবান তবে 'কত দূরে কে জানে।' অথচ 'লোকে ভগবানকে ডাকেও :
কিন্তু সে ডাক বুঝি ততদূর পৌঁছায় না।
কিংবা সে বুঝি অতি নিষ্ঠুর :
তবু উচ্চকণ্ঠে প্রতি সন্ধ্যায় তাকে ডাকে—
ও তার নামের গুণে গহন বনে মৃত তরু মুঞ্জরে,
নামের তরী বাঁধা ঘাটে ডাকলে সে যে পার করে।'

কিন্তু ঈশ্বরের উপর তাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস নেই, জীবনের সমস্ত মূল্য-বোধ হারিয়ে তারা যেন যুক্তি বিশ্বাস ও সংস্কারের মধ্যে কোনো ঋজুতার সন্ধান পাচ্ছে না, 'তাই উহারা মুখে বলে, হরি হে যা কর।'
কিন্তু মনে ঠিক ঐ কথাটা মানিয়া লইতে চায় না, সে কবিরাজের 'ডাক্তারখানা' পর্যন্ত ছুটায়, বটিকা পাঁচন মুখ খিঁচাইয়া গিলায়।
বাঁচিলে দেবতার পূজা দেয়, না বাঁচিলে বলে, পাথর, পাথর, দেবতা-ফেবতা মিছে কথা।
মোট কথা, ভগবানকে উহারা মানে কি মানে না, সেটা আজ একটা অমীমাংসিত সমস্যা।

ডাকিতেও মন চায় না, না ডাকিলেও মন খুঁতখুঁত করে।

উপলব্ধ সত্যে আর যুগযুগান্তরের সংস্কারে এখানে প্রবল দ্বন্দ্ব, ব্যর্থতায় বুকের ভিতর ক্ষোভ জাগিয়া উঠে—সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঝোড়ো হাওয়ার মতো।' মাঠে মাঠে সবুজ ধানের দৃশ্যের মধ্যেও গোষ্ঠের পরিবারে প্রচণ্ড দারিদ্র্য, কাবুলীওয়ালার কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ এবং তার অভদ্র ইঙ্গিত ও অপমান দামিনীকে সহ্য করতে হয়, রুগ্ন ছেলের আবদারে স্নেহময়ী দামিনীর মাতৃত্ব উদ্বেল হয়ে ওঠায় পরোক্ষে তার মৃত্যুর কারণ হয়েছে সে. প্রচণ্ড অসহায়তার মধ্যে শয়তান সুবল দাসের কাছে হাত পাততে হয়েছে তাকে ঃ অবশেষে নানাবিধ অত্যাচার ও অবিচারে জর্জরিত হয়ে দামিনীকে নিয়ে গোষ্ঠ শহরে এসেছে এবং এক কারখানায় কুলির কাজ নিয়েছে। সেখানেও মালিক কর্তৃক শ্রমিকের ওপর অত্যাচার এবং শ্রমিকদের মধ্যে দলাদলি অন্যান্যদের সঙ্গে গোষ্ঠকেও এক ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে অনিবার্য বেগে ঠেলে নিয়ে গেছে। তাদের মানসিকতা সম্পর্কে তারাশঙ্কর বলেছেন, 'প্রাণের চেয়ে মান বড়, দর্শনবাদ মানুষের আবিষ্কৃত, এ তাহার স্রষ্টার উপরে সৃষ্ট, মানুষের জন্মগত সংস্কার হইতেছে মরণ হইতে জীবনকে বাঁচানো—দুনিয়ার সর্বধর্ম সর্বদ্রব্যের বিনিময়ে আপন অস্তিত্ব জীব বজায় রাখিতে চায়, সৃষ্টি হইতে এই নগ্ন সত্যটাকে মানুষের ইতিহাস প্রমাণ করিয়া আসিয়াছে।'

শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে বাবুদের সচেতন করে তোলার জন্য ধর্মঘট এবং শ্রমিক-অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিণতি হিসেবে গোষ্ঠের মৃত্যু চৈত্র প্রান্তরের ঘূর্ণীর মতই ক্ষীণ আর ক্ষণস্থায়ী হলেও লেখকের বিশ্বাস, 'চৈতালীর ক্ষীণ ঘূর্ণী অগ্রদূত কালবৈশাখীর।'

মোহিতলালের ভাষায় 'বাঙালী সমাজ ও বাঙালী জাতির জাতিগত জীবনের কথক' তারাশঙ্কর এর পর 'নীলকণ্ঠ' ও 'পাষাণপুরী' উপন্যাস দু'টি লিখেছিলেন। 'নীলকণ্ঠ' উপন্যাসটি প্রথমে 'উপাসনা' পত্রিকায় 'যোগবিয়োগ' নামে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসগুলির মধ্যে

লেখকের যে সমাজসচেতন শিল্পিমানসের পরিচয় পাওয়া যায়, সেই ধারারই অনুবর্তন ঘটেছে তাঁর সুবিখ্যাত আত্মজৈবনিক উপন্যাসগুলির মাধ্যমে এবং আরও পরে 'কালরাত্রি' ও সর্বশেষ '১৯৭১'এর মাধ্যমে। অন্যদিকে 'রসকলি' ও 'রাইকমল'-এ তাঁর কবিমনের যে স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ লক্ষ্য করা যায় সেই শিল্পিসত্তার আনন্দলীলা তাঁর লোকসংস্কৃতিমূলক বা স্থানিক বৈশিষ্ট্যসূচক গল্প-উপন্যাসের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

এরপর 'কালিন্দী' ও বিখ্যাত আত্মজৈবনিক উপন্যাস 'ধাত্রীদেবতা' 'গণদেবতা' 'পঞ্চগ্রাম'-এ তাঁর সমাজচেতনা রাষ্ট্রীয় অভিঘাতে ব্যক্তি-সত্তার বিকাশের ক্ষেত্রে এক নবতম দিগদর্শনের সাক্ষ্য বহন করে। রাজনৈতিক বন্ধন মুক্তির আকাঙ্ক্ষার যে দুর্বার আবেগ তিনি জাতীয় জীবনের স্তরে স্তরে বিভিন্ন ভঙ্গিতে প্রকাশিত হতে দেখেছিলেন, তারই মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন মানুষের সনাতন জীবন-মুক্তির সাধনা। জীবন-মুক্তি কিন্তু দেহ-মুক্তি বা পরলোক-সাধনার সমার্থ-বোধক নয়। জীবন-মুক্তি বলতে তিনি বুঝেছেন জীবনের চারিদিকে সকলপ্রকার ভয়ের বন্ধন, সকল প্রকার ক্ষুদ্রতার বন্ধন অর্থাৎ গণ্ডি, সকল অভাবের পীড়ন, জীবনে জোর করে চাপানো সকলপ্রকার প্রভাবের-নির্যাতনের বিরুদ্ধে মানুষের অবিরত সংগ্রামের কথা, দুর্নিবার অভিযানের কথা। নিজের ক্ষুদ্রতাকে, নিজের অনাচারকে সে নিজেই সংহার করে ; আবার অতি আত্মনির্যাতন আত্মবঞ্চনার বিরুদ্ধে নিজেই বিদ্রোহ করে। সে সময়ের রাজনৈতিক পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করার আবেগের মধ্যে সেই চিরন্তন মুক্তি-সংগ্রামকেই অনুভব করেছিলেন তিনি। মানবীয় মহিমার সনাতন লীলা ঐ পটভূমিতে প্রকাশ পেয়েছিল এবং দিনে দিনে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। তাঁর কল্পনায় ছিল, এই দেশের মানুষের একদিন অভ্যুদয় হবে, উঠবে বিপুল মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে, আত্মপ্রকাশ করবে বিরাট অভ্যুত্থানে। সে অভ্যুত্থান হবে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম। বুদ্ধের

আবির্ভাবে তপস্যাবীজ, গান্ধীজির কর্মসাধনায় তা প[illegible]ত হবে ফলবান বৃক্ষে। সে অমৃতফলের আস্বাদে মৃত্যুভয় থেকে মুক্ত হবে মানুষের ইতিহাসের ভাবী অধ্যায়গুলি।

১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে রেঙ্গুনের পত্তনকাল থেকে যখনই কলকাতা থেকে মানুষদের প্রাণভয়ে পালাতে তিনি দেখেছিলেন তখন শুধু হতাশই হননি, অপরিসীম ক্ষুব্ধও হয়েছিলেন। চারিদিকে শাসন তখন কঠোর কঠিন নিষ্ঠুর, সংবাদপত্রে স্বদেশীযুগে নির্ভিকতাও স্তম্ভিত, কঠোর বন্ধনে যেন বন্দী। তাই তিনি সাহিত্যের মধ্যে মানুষকে চেতনাসম্পন্ন করে তুলতে চাইলেন। তাঁর ইচ্ছা হল, মানুষকে শৃগালপনার ভীরুতা জয় করতে শক্তি দিক সাহিত্য, অভয় দিক, সাহস দিক। মানুষ সাহস করে অমিতবিক্রমে ঘুরে দাঁড়াক। তারপর নিশ্চয়ই অমিতবীর্য মানুষকে কালের বেগ অনিবার্য গতিতে নিয়ে যাবে তার পথে। ভারতের সাধনার পথে চলে এসে ভারতবর্ষের মানুষ আজ প্রাণের ভয়ে গর্ত খুঁড়ে শেয়ালের মতো তার মধ্যে আত্মগোপন করে যদি গতিহীন না হয়, মানুষের মত পথ ধরে চলে তবে তাকে ঐ অহিংস সংগ্রামের পথেই যেতে হবে।

'কালিন্দী'-র সঙ্গে 'চৈতালী ঘূর্ণী'র সাদৃশ্যসমৃদ্ধ প্রাকৃতিক পটভূমিকায় মানুষের জীবনধারার বর্ণনায়, কিন্তু কালিন্দী আরো পরিণত রচনা। দুই কালের দ্বন্দ্বের প্রশ্নে এই উপন্যাসের চরিত্রায়নের ত্রুটির কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক প্রতিনিধি ইন্দ্র রায় এবং আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার তেজ ও বর্বরতা নিয়ে সগৌরবে দণ্ডায়মান, কলকাতার কলওয়ালা মহাজন বিমলবাবুর সংঘাতের মাঝখানে সাঁওতাল-বিদ্রোহ ও গ্রামের চাষীদের ক্রমপরিবর্তনশীল মনোভাব লেখকের পূর্ণ সহানুভূতি লাভ করেছে। এই অধিকার অর্জনের জন্য সাধারণ মানুষকে সংগ্রাম করে যেতে হবে অহিংসা ও সত্যের উপর বিশ্বাস রেখে, 'ধাত্রীদেবতা' থেকে 'মন্বন্তর' এবং 'পঞ্চগ্রাম' পর্যন্ত সর্বত্র

এই ধ্যান-কল্পনায় তিনি আবিষ্ট থেকেছেন। পঞ্চগ্রামের শেষে আছে :

'মানুষ বাঁচিতে চায়। মানুষের পরম কামনার মুক্তি একদিন আসিবেই। সেই দিনের দিকে চাহিয়াই মানুষ দুঃসহ বোঝা বহিয়া চলিয়াছে। নিজের দুঃখের মধ্যে জীবন শেষ করিয়াও সযত্নে রাখিয়া চলিয়াছে, পালন করিয়া চলিয়াছে আপন বংশপরম্পরাকে। ....সে যাহা বুঝিয়াছে বলিয়া যাইবে। বলিবে, তোমরা মানুষ, তোমরা মরিবে না, মানুষ মরে না। ....মুক্তি আসিবেই। সেদিন মানুষের যাহা সত্যকারের পাওনা, তাহা তোমরা পাইবে। সুখ স্বাচ্ছন্দ্য অন্ন বস্ত্র ঔষধ পথ্য আরোগ্য অভয় এ মানুষের পাওনা। আমি যাহা লিখিয়াছি তাহা শোন, আমি কাহারও চেয়ে বড় নই, কাহারও অপেক্ষা ছোট নই, কাহাকেও বঞ্চনা করিবার আমার অধিকার নাই, আমাকে বঞ্চিত করিবার অধিকার কাহারও নাই।'

শেষে নায়ক দেবু, ভারতের চিরন্তন কল্পনার কাল সত্যযুগকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, 'সত্যযুগের আমন্ত্রণ। নূতন ভঙ্গিতে, নূতন ভাষায়, নূতন আশায়, নূতন পরিবেশে। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা ধর্মের সংসার। ....পঞ্চগ্রামের প্রতিটি সংসার ন্যায়ের সংসার, সত্যের সংস্যর, ধর্মের সংসার ও সুখের সংসার। সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা, অভাব নাই, অন্যায় নাই, মিথ্যা নাই, অন্নবস্ত্র ঔষধপথ্য আরোগ্য স্বাস্থ্য শক্তি সাহস অভয় দিয়া পরিপূর্ণ উজ্জ্বল। আনন্দে মুখর, শান্তিতে স্নিগ্ধ। দেশে নিরন্ন কেহ থাকিবে না। শোষণ থাকিবে না। ....মানুষ বলশালী, পরিপুষ্ট সবলদেহ, আকারে তাহারা বৃদ্ধিলাভ করিবে, বুকের পাটা হইবে এতখানি। নূতন করিয়া গড়িবে ঘরদুয়ার পথঘাট। ঝকঝকে বাড়ি....সুসমান সুগঠিত পথ।'

দেবু ঘোষ সমাজের পরিবর্তনশীলতাকে স্বীকার করেও চিরন্তন কল্পনার কাল সত্যযুগকে আমন্ত্রণ জানালো কেন? 'গণদেবতা' উপন্যাসে তার কারণ নিহিত আছে। দেবু করালী বা অনিরুদ্ধ নয়, সমাজের

বুকে দাঁড়িয়ে সব কিছু অস্বীকার করে শুধু মাত্র নতুন কালের মোহে আকৃষ্ট হওয়াকে সে জীবনের সার্থকতা বলে মনে করে না। সে সমাজশৃঙ্খলা বজায় রাখার পক্ষপাতী, অনিরুদ্ধ ও গিরীশের বিদ্রোহে তার বিন্দুমাত্র সায় নেই। গ্রামের আভ্যন্তরীণ বিবাদ-মীমাংসার ক্ষেত্রে সে জমিদারী হস্তক্ষেপ পছন্দ করে না বটে তবে সমাজের সর্বস্তরের লোককে আহ্বান করে শ্রেণীবর্ণনির্বিশেষে প্রত্যেকের প্রতি ন্যায্য বিচারের উপযোগিতায় সে আস্থাশীল। সেখানে সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী সে শ্রীহরি পালের সঙ্গে অনিরুদ্ধ কামার, গিরীশ ছুতোর, তারা নাপিত বা পাতু বায়েনের কোনো-প্রকার তারতম্য লক্ষ্য করে না। শ্রীহরির অর্থ সম্পদ ও বর্বর পশুত্ব, জগনের নকল দেশপ্রীতি ও আভিজাত্যের আস্ফালন, বংশানুক্রমিক দাবিতে হরিশ মণ্ডলের গ্রামের মণ্ডলত্ব-দাবি এবং বয়সের প্রাচীনত্বের ফলে ভবেশ ও মুকুন্দের বিজ্ঞতা তার কাছে অসহ্য ও হাস্যকর। সে চায় সবকিছুর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে, সেজন্য তার গোপনতম অন্তরে অনিরুদ্ধের প্রতি সহানুভূতি থাকলেও সে চণ্ডীমণ্ডপে কামারের পূজো বন্ধ করে তাকে শাস্তি দিতে চেয়েছে, কারণ, জীবনে তার একটি 'আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্য হীন কৌশল, অত্যাচার ও অন্যায়কে সে অবলম্বন করিতে চায় না। জীবনে তাহার একটি আদর্শবোধও আছে। মহাপুরুষদের দৃষ্টান্তের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে গঠিত সেই আদর্শবোধ।' আসলে দেবু ন্যায়রত্নের পৌত্র বিশ্বনাথের মতো বিপ্লববাদে বিশ্বাসী নয়। জীবন সম্বন্ধে তার মূল্যবোধগুলি প্রধানত ঐতিহ্যাশ্রয়ী, তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে বলিষ্ঠ আস্তিক্যচেতনা। ঈশ্বরকে 'আজকাল আর মানুষ প্রণামও করে না' সেজন্য দেবু অত্যন্ত বেদনাবোধ করে; তার সুস্পষ্ট অভিমত, 'ঈশ্বরকে উপেক্ষা করিয়াই তাহারা এই পরিণতির পথে চলিয়াছে।'

নতুন কালের আহ্বায়ক হিসেবে দেবুর ঈশ্বর ভক্তি সমাজ পুনর্গঠনের

ক্ষেত্রে কতোখানি সহায়ক, তা নিশ্চয়ই বিচার্য। তাছাড়া, যুগের চাহিদা অনুযায়ী কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক না করে চণ্ডীমণ্ডপের সংস্কার করা কিংবা মার্কসীয় দর্শনের গ্রন্থগুলিকে অস্পৃশ্য ও বর্জনীয় মনে করে ('ওই সব বই ছুঁলে পাপ') সেকালের ধর্মসম্মত সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা দেবু ঘোষের চরিত্রে প্রগতিশীলতার পরিচায়ক নয়। সম্ভবত এই সুস্পষ্ট মনোভঙ্গির অভাবেই দেখা দিয়েছে তার ব্যবহারে অস্পষ্টতা ও কার্যে দ্বিধা, কিছু উদ্ধৃতি থেকে তার লক্ষ্যহীনতার প্রমাণ পাওয়া যাবে ঃ

এক. 'অনিরুদ্ধের যে অন্যায় সে অন্যায়ের মূল কোথায় সে জানে।' এবং 'অন্যায় অনিরুদ্ধেরই একার নয় এবং অনিরুদ্ধই প্রথমে অন্যায় করে নাই। গ্রামের লোকই অন্যায় করিয়াছে প্রথম।' অথচ অনিরুদ্ধ বিদ্রোহ করলে সে অনিরুদ্ধের পক্ষাবলম্বী হয়নি, সে বলেছে, 'কামার, ছুতোর নাপিত, কাজ করব না বললেই চলবে না। কাজ করতে তারা বাধ্য।' তাছাড়া, অনিরুদ্ধের কৃতকর্মের শাস্তি দিতে সে একটুও পশ্চাৎপদ হয়নি—চণ্ডীমণ্ডপ থেকে তার পূজো ফিরিয়ে দিয়েছে সে-ই। এখানে জমিদার-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর মানুষ থেকে সে নিজেকে স্বতন্ত্র করে তুলতে পারেনি।

দুই. অনিরুদ্ধ ও গিরীশকে শাস্তি দেওয়ার জন্য মজলিস আহ্বান করলেও দেবু তখন অত্যন্ত নিস্পৃহ মনোভাব অবলম্বন করেছে কারণ সমাজ-ব্যবস্থার শিকার অনিরুদ্ধের প্রতি তার তৎকালীন সহানুভূতি ; 'ছিরু পালের মত ব্যক্তি যে মজলিসে মধ্যমণির মত জমকাইয়া বসে, সে মজলিসে তাহার আস্থা নাই বলিয়াই এই নিস্পৃহতা' অথচ পুনরায় ভবেশ, হরিশ প্রভৃতিকে অনুরোধ করেছে ঃ 'আপনারা কই শক্ত হয়ে বসে ডাকুন দেখি মজলিস। ঘাড় হেঁট করে সবাইকে আসতে হবে।'

তিন. মজলিস ডেকে ন্যায্য বিচারের দায়িত্ব যাদের উপর দিতে দেবুর এমন আগ্রহ, সেই হরিশ ও ভবেশের বিচারবুদ্ধির প্রতি দেবুর

মনোভাব কি? 'বংশানুক্রমিক দাবিতে হরিশ মণ্ডলের গ্রামের মণ্ডলত্ব দাবিকেও সে স্বীকার করিতে চায় না। ভবেশ ও মুকুন্দ বয়সের প্রাচীনত্ব লইয়া বিজ্ঞতার ভাণে কথা কয়—সে তাহাও সহ্য করিতে পারে না।' অতএব কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের সাহায্যে সামাজিক অবিচারের প্রতিকার করার চেষ্টা আর আসামীকে বিচারকের আসনে বসিয়ে বিচারের প্রহসন করা যে একই সমান্তরাল ঘটনা, নতুন কালের অগ্রদূত দেবুর কাছে তা অজানা ছিল।

চার. জমিদার ধনী-মহাজনের প্রতি তার ছিল অপরিসীম ঘৃণা। 'তাহাদের প্রতিটি কর্মের মধ্যে অন্যায়ের সন্ধান করা তাহার স্বভাবের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তাহাদের অতি উদার দান-ধ্যান পুণ্যকর্মকেও সে মনে করে কোন গুপ্ত গো-বধের স্বেচ্ছাকৃত চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া।' তার কারণ, তার শৈশবে বাকি খাজনা আদায়ের জন্য জমিদার কর্তৃক তার পিতার লাঞ্ছনা, চাপরাশীর কাছে তার অপমান, ঋণ পরিশোধ না করার অপরাধে কঙ্কনার মুখুজ্জে বাবুদের দ্বারা আদালতের সাহায্যে তাদের উপর অমানুষিক লাঞ্ছনা। তাছাড়া, স্বগ্রামের শ্রীহরির বর্বরোচিত ব্যবহারে তার প্রচণ্ড ক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক। অথচ কারাগার থেকে প্রত্যাবর্তনের পর শ্রীহরি যখন প্রথম দেবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছে তখন দেবুর ব্যবহার এবং উভয়ের কথোপকথন দেবুর চরিত্রকে লেখক যেভাবে গড়তে চেয়েছেন তার পরিপন্থী বলে মনে হয়। প্রথমত শ্রীহরিকে সে 'সম্ভ্রম করিয়া স্বাগত সম্ভাষণ জানাইল'—শ্রীহরির সামাজিক মর্যাদার প্রতি দেবুর স্বীকৃতি বলে আমরা এই ঘটনাকে মনে করতে পারি। দেবুর 'একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, চৌধুরীই বলিয়াছিলেন—পণ্ডিত, মা লক্ষ্মীর নাম শ্রী। লক্ষ্মী যার আছে তারই শ্রী আছে; যার মনে বল, চেহারায় বল, প্রকৃতিতেও বল সে-ই শ্রীমান্। শ্রীহরির পরিবর্তন হবে বৈকি।' শ্রীহরির উপস্থিতিতেই দেবুর এই সশ্রদ্ধ মনোভাবের ফলে তাকে জমিদার-

মহাজন-অত্যাচারিত গ্রাম্য সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে যথেষ্ট সবল ও শক্তিমান বলে মনে হয় না। শ্রীহরির স্বকণ্ঠে তার গ্রামোন্নয়নের কথা শুনে এবং কপট ভক্তিতে দেবুর প্রশংসা শুনে সে এমন বিস্মিত ও বিগলিত হয়ে গেছে যে সেই সুযোগে ধূর্ত শ্রীহরি তার নতুন কীর্তি রক্ষিতা-সংক্রান্ত ঘটনাটিও তার গোচরে এনেছে। শ্রীহরির কোনো কেলেঙ্কারিই তখন দেবুকে আর উত্তেজিত বা ক্ষুব্ধ করতে পারেনি। পরন্তু 'শ্রীহরির দিকটা' সে যেভাবে ভাবতে শুরু করেছে তাতে তাকে তখন শ্রীহরির পক্ষের উকিল বলেই মনে হয়ঃ 'শ্রীহরিকে দোষ দেওয়া যায় না। টাকা থাকা পাপ নয়, বে-আইনী নয়। কাহারও বিপদে টাকা ধার দিলে, খাতক সে সময় উপকৃতই হয়। কিন্তু সুদে আসলে আদায়ের সময় তাহার যে কদর্য রূপটা বাহির হইয়া পড়ে, সেজন্য শ্রীহরি কি করিবে? অথচ সুদের জন্য তাহাকে ইন্‌কাম্ ট্যাক্স দিতে হয়, হক্ পাওনা আদায়ের জন্য আদালতে কোর্ট-ফি দিতে লাগে, ইউনিয়নকে দিতে হয় চৌকীদারী ট্যাক্স। সুদ সে ছাড়ে কি করিয়া?'

পাঁচ. আর একটি ঘটনা দেবুকে শৈশবে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল—যোগ্যতা-অযোগ্যতা নির্বিশেষে বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর জমিদার-মহাজন-ব্রাহ্মণ প্রভৃতির বিশেষ শ্রদ্ধা ও খাতির এবং দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর প্রতি করুণা ও অবহেলা। 'দেবু আজও ভুলিতে পারেনা যে, সে ছিল শিক্ষকদের সস্নেহ করুণার পাত্র, ন্যায়রত্নের পৌত্র বিশ্বনাথ পাইত স্নেহের সহিত শ্রদ্ধা, আর কঙ্কনার বাবুদের মধ্যম মেধার কয়েকটি ছাত্র পাইত স্নেহের সহিত সম্মান। এমন কি, এই ছিরুকেও স্কুলের হেডপণ্ডিত তোষামোদ করিতেন।' অথচ দেবুর চিন্তা ও ব্যবহারে এই ব্যথাতুর স্মৃতি বিশেষ কার্যকর হয়েছে বলে মনে হয় না,—তার বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা শুধু নয়, বিশ্বনাথের পিতামহ ন্যায়রত্নের প্রতি দেবুর শ্রদ্ধা গগনস্পর্শী, কঙ্কণার বাবুদের মহাজন-বৃত্তির মধ্যেও সে মানবতার সন্ধান পেয়েছে আর ছিরু ওরফে শ্রীহরির

প্রতি তার দ্বিধাজড়িত মনোবৃত্তির কথা তো পূর্বেই আলোচনা করেছি।

আসলে, যে সমাজ ব্যবস্থায় 'ধনীকে চোর প্রতিপন্ন করা বড় সহজ নয়,' ডাকাতের সঙ্গে পুলিশের আন্তরিক লেনদেন চালু রয়েছে (পদ্মর অভিজ্ঞতা,) স্বার্থান্বেষী ধনী-মহাজনদের সঙ্গে জমিদারের যোগাযোগ নিবিড় অন্তরঙ্গতায় তাৎপর্যপূর্ণ (অনিরুদ্ধ-গিরীশের কথোপকথন), অন্ত্যজ শ্রেণীর মোড়লরাও কায়েমী স্বার্থের শিকার (পাতু বায়েনের অভিজ্ঞতা,—'শক্তর সব তুয়ার মুক্ত'), উচ্চশ্রেণীর ধনীর প্রতি প্রশাসনিক পক্ষপাতিত্ব সন্দেহাতীত (অত্যাচারী শ্রীহরির প্রতি পুলিশের ব্যবহার) এবং জমিদার, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, দারোগা, হাকিম, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান প্রভৃতির উদগ্র যৌনলালসা থেকে অন্ত্যজ শ্রেণীর নারীর রেহাই নেই, কায়েমী স্বার্থের সেই সম্মিলিত শক্তিকে আঘাত করার ক্ষমতা দেবুর ছিল না। হয়তো আঘাত করতে গেলে যে প্রত্যাঘাত অনিবার্য ছিল সামাজিক বা আর্থিক কোন দিক থেকেই সে তা সহ্য করতে পারত না। তবু তার চেতনায় নতুন কালের অগ্রদূতের মতো কোন বলিষ্ঠ বিদ্রোহের চিহ্ন নেই, তার অবসন্নতা কাটাতে যতীনের উত্তপ্ত সাহচর্য প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়, মহামহোপাধ্যায় শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্ন তাকে রামায়ণ-মহাভারতের আদর্শে গঠিত সমাজবিন্যাসের কল্পনায় অনুপ্রাণিত করেন। সে বিদ্রোহী নয়, পরন্তু উদার সরল দেবপ্রতিম মানুষ। সকলের প্রতি তার ব্যবহার প্রীতিস্নিগ্ধ ও ক্ষমাসুন্দর কিন্তু 'গণদেবতা'র পাতায় অত্যাচারী সমাজ ব্যবস্থার যে ভয়ঙ্কর চিত্র তিনি এঁকেছেন তাকে সামান্য একটু আঘাত করতে গেলেও সেই শক্তির প্রচণ্ডতা অপরিহার্য।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—যে কালের কথা তিনি 'গণদেবতা'য় লিপিবদ্ধ করেছেন, তখন রাষ্ট্র ও সমাজের তথাকথিত শাসকদের সঙ্গে দেশ-সেবকদের সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল, বিরোধিতার একটি স্পষ্ট সীমারেখা

ছিল। কিন্তু এই উপন্যাসেই লক্ষ্য করা যায়, অত্যাচারী শোষকশ্রেণী কীভাবে শাসন ক্ষমতা পাবার জন্য ব্যগ্র ও লালায়িত হয়ে উঠছে। এই ঘটনার প্রতি লেখকের :তির্যক মনোভাব লক্ষ্য করা গেলেও এর বিষময় পরিণতি স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিম বাংলার ভুক্তভোগী মানুষের যে অবর্ণনীয় দুর্দশার কারণ হয়েছে লেখকের শেষ পর্যায়ের রচনাবলীতে তার কোনো প্রমাণ নেই।

'ধাত্রীদেবতা' 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রামে'র গ্রামীণ মানুষদের অধিকার সংক্রান্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা জাতি ধর্ম বা বর্ণভেদের দ্বারা প্রভাবিত বা প্রতারিত হয়নি, এর বীজ নিহিত ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে। তাঁর মতো তাঁর চরিত্রগুলিরও অবিদিত নেই, এদেশের সমাজ ব্রাহ্মণই গঠন করেছে—সমাজকে, সংস্কৃতিকে বহু বিপ্লব, বহু দুর্যোগ ও বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিয়ে এসেছে, বিংশ শতাব্দীর ভাববিপ্লবেও এদেশের নেতৃত্ব করেছে ব্রাহ্মণ। তারাশঙ্কর রবীন্দ্রনাথকে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলেই স্বীকার করেন। তারাশঙ্করের মতো তাঁর চরিত্রেরা আরো জানে, গ্রাম্য সমাজে এখনও ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য বর্তমান রয়েছে, জন্মগত জাতিপ্রধান বর্ণাশ্রম ধর্ম উঠে গেলেও কর্মগত ব্রাহ্মণ প্রাধান্য থাকবেই। পঞ্চ-গ্রামের ন্যায়রত্ন চরিত্র এই কারণেই পরবর্তীকালে তাঁর বহু রচনার কেন্দ্রে প্রায় প্রাণশক্তির মতো আবির্ভূত হয়েছে।

যাহোক, 'পঞ্চগ্রামে'র মধ্যে তিনি পশ্চিমবঙ্গের চাষী মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনার অবতারণা করেছেন, এই প্রসঙ্গে খাজনাবৃদ্ধির বিরুদ্ধে হিন্দু মুসলমান সব প্রজার সম্মিলিত ধর্মঘটের আয়োজন উল্লেখযোগ্য। এই উপন্যাসের ভূমিকায় তিনি 'কতকগুলি হুবহু সত্য ঘটনা' লিপিবদ্ধ করেছেন বলে জানিয়েছেন এবং সবিনয়ে নিবেদন করেছেন, 'সমাজের পটভূমিকায় পল্লীর কথা বলিবার আরও অনেক কিছু আছে। কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে সবকথা বলা সম্ভবপর হয় নাই। এবং এতবড় পুরাতন দেশ ও সমাজের অতি প্রাচীন

ইতিহাসের সব কথা আমার জানাও নাই। তাই অকথিত অনেক কিছু থাকিল। তবে যাহার কথকতা করিয়াছি তাহার বাস্তব রূপ সম্বন্ধে আমার দাবী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার; বিশ্লেষণে মতান্তর ঘটিতে পারে।

সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বকালের সমাজ-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল জাতিভেদ ও ধর্মভেদ, তারাশঙ্করের আমলে সেই বিভেদ নতুন চেহারা নিল অর্থনৈতিক এবং পেশাগত তারতম্যের প্রশ্নে। এই নতুন সামাজিক সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পেশার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জাতিভেদ ঘটে, আর্থিক সামর্থ্যের উপরে কৌলীন্যের প্রতিষ্ঠা হয়। অতএব, চাকুরীগত দীনতা এবং তজ্জনিত দারিদ্র্য সহ্য করতে গেলে বর্তমান সমাজে দ্বিমুখী নির্যাতন ভোগ করতে হয়—এই অত্যাচারে দুর্বল প্রকৃতির মানুষের প্রাণশক্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়। যেমন, ১৩৫২ সালে 'কৃষক'-এ 'উদয়াস্ত' নামে প্রকাশিত এবং পরে মিত্র ও ঘোষ থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত 'সন্দীপন পাঠশালা'র প্রধান চরিত্র সীতারাম, যে বাংলাদেশের অবহেলিত অনাদৃত শিক্ষক সমাজের প্রতিনিধি, 'সমাজ জীবনের সামান্যতম সম্মান' থেকেও বঞ্চিত।

সীতারাম সদ্‌গোপের ছেলে—স্বভাবতই তার উচিত চাষীদের মতো ক্ষেতে খামারে কাজ করা। কিন্তু তার দৃষ্টিভঙ্গি একটু স্বতন্ত্র ধরনের। সে 'কবি'র নিতাই বা 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'র করালীর মতোই নিজেদের সামাজিক আবহাওয়ায় প্রভাবিত হতে চায় না। অনেক প্রতিকূলতা সহ্য করে লেখাপড়া শিখে সে রত্নহাটার জমিদার বংশের সহায়তায় একটা পাঠশালা খুলল। বাবার অনিচ্ছা, স্বজাতির প্রতিকূলতা এবং সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষদের বিদ্রূপ তাকে নিবৃত্ত করতে পারে নি। তার এই নব উদ্দীপনার পাথেয় হল মায়ের সস্নেহ প্রশ্রয়, চোখের সামনে রইল ধীরানন্দের দেশপ্রেমের মহান আদর্শ। বিদ্যালয়ের নামকরণের মূলেও রয়েছে আদর্শ সচেতনতা—শ্রীকৃষ্ণ

সান্দীপনি মুনির কাছে এই রকম একটা পাঠশালায় বিদ্যার্জন-করেছিলেন। সমাজের নানা স্তর থেকে নানাধরনের কিছু ছাত্র তার পাঠশালায় ভর্তি হল।

মনোরমার সঙ্গে তার বিবাহ হল কিন্তু সীতারামের বিবাহিত জীবনে রোমান্টিকতার কোনো অবকাশ ছিল না—পাঠশালা, ছাত্র এবং তাদের শিক্ষাপদ্ধতি ও চরিত্রগঠনের উন্নতিসাধনের চিন্তায় সে সব সময়ে বিভোর হয়ে থাকত। তাছাড়া, সমসাময়িক দেশকালের প্রভাবও তাকে তার মানসগঠনে কম প্রভাবিত করেনি। অসহযোগ আন্দোলনের সময় যেহেতু মহাত্মা গান্ধীর নাম সমগ্র ভারতবাসীর কাছে আদর্শস্থানীয় তাই সীতারামের পাঠশালার ছাত্রদের কাছেও মহাত্মাজি শ্রেষ্ঠ ভারতীয়ের আসন পেয়েছেন। সেজন্য বৃটিশ সরকারের দমননীতির ফলে সীতারামকে খেসারত দিতে হয়েছে, প্রচণ্ড বাসনা সত্ত্বেও সে ধীরাবাবুর প্রতি ভয়ে তার হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে পারেনি। সমাজ চলছিল প্রগতির অভিমুখে, নারীশিক্ষার অপরিসীম প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল দেশকালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। নারী স্কুলে এল একটি শ্যামলী সুতনুকা বুদ্ধিদীপ্ত তরুণী, যার সঙ্গে লজ্জায় সঙ্কোচে সংযতচরিত্র সীতারাম কখনো কথা বলতে পারেনি। সে যেমন একদিন এসেছিল তেমনি একদা চলে গেল, সীতারামের হৃদয়ে প্রচণ্ডভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে। সীতারামের মন অসম্ভব উতলা হয়েছিল, সে অন্যমনস্কভাবে শিক্ষিকার বাসার কাছে চলে যেত। অনেকদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত জানলার পর্দার ছায়ায় প্রতিবিম্বিত একটি মূর্তি। কিন্তু সে শিক্ষক, উচ্চশিক্ষিত নয়, সদ্গোপের ছেলে, সর্বোপরি বিবাহিত। তাই, এক আকস্মিক আলোড়নে তার হৃদয়টা বিপর্যস্ত হয়ে গেলেও সে সেই একান্ত গোপনীয় ঘটনাটি কোনোদিন পৃথিবীর আলোকে নিয়ে আসেনি।

তার চিত্তবিক্ষোভের ঘটনাটি কিন্তু মনোরমার কাছে অজানা ছিল না।

তবু সে জীবনে কোনোদিন এ ব্যাপারে কোনো আক্ষেপ বা অভিযোগ করেনি, শুধু মৃত্যুর সময়ে সে স্বামীর কাছে নিজের দীনতা সলজ্জ কণ্ঠে ঘোষণা করে গেছে। মেয়ে রত্না বিধবা হয়েছে। নানা দুঃখ দুর্যোগের মধ্য দিয়ে পাঠশালাটা চালিয়ে আনলেও নতুন আইনের ফলে সীতারামের পড়ানো বন্ধ হয়ে গেল, তার সন্দীপন পাঠশালা উঠে গেল, বৃদ্ধ সীতারাম জীবনে বহু দুঃখের বিনিময়ে অশ্রুপাত করে করে পরিণামে অন্ধ হয়ে গেছে। সে ডায়েরি লিখে রেখেছিল, ধীরানন্দ সেই ডায়েরির ছিন্নপত্র থেকে মালমশলা নিয়ে সীতারামের জীবন অবলম্বন করে উপন্যাস লিখবে : একটা যুগ ও কালের মধ্যে দেশের নানা ভাঙ্গা-গড়ার আবর্তে কেমন করে একজন নিম্নশ্রেণীর যুবক আপন আদর্শের মহিমায় একটা শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল এবং নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে সেই যুবকটি শেষ পর্যন্ত জীবন-সায়াহ্নে এসে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হল।

পারিপার্শ্বিকতার চাপে পড়ে সীতারাম পরাজিত হলেও 'অভিযান' উপন্যাসের নায়ক নরসিং হার মানেনি। তার জীবনেও এসেছিল নানাবিধ সমস্যা, সমাজের অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীভুক্ত সুবিধাভোগী মানুষদের ক্রূর চক্রান্ত ও নির্লজ্জ অত্যাচারের বলি হওয়া তার পক্ষে মোটেই আশ্চর্য ছিল না। কিন্তু নরসিংয়ের চরিত্রে ছিল না সীতারামের আদর্শবোধ, নৈতিক পাপপুণ্যের চেতনা, মার্জিত রুচি ও শিক্ষিত মনের পরিচ্ছন্নতা, পরন্তু সে অধিকতর স্থূল, ভোগসর্বস্ব। জীবনযাত্রায় সে দুঃসাহসী এ্যাডভেঞ্চারার কারণ জীবনচর্যায় সে কোনো নীতি নিয়ম ও নিষ্ঠায় আস্থা রাখেনি। অন্যায়ের সঙ্গে কখনো সে আপস করতে চায় না বটে, কিন্তু প্রয়োজন হলে ইলামবাজারের মেজবাবুর মতো দুর্দান্ত প্রকৃতির মদ্যপ শয়তান ও নারীলোভীর সহায়তায় ট্যাক্সীর ব্যবসা করতে আপত্তি করেনি, শ্যামনগর-পাঁচমতী সার্বিস খোলার সময় চোরাকারবারী লম্পট ও

যাবতীয় ন্যায়-নীতি-সততার মূর্তিমান বিরোধিতার প্রতীক শুখনরাম সাহুর সাহায্য নিতে দ্বিধাবোধ করেনি। শুধু তাই নয়, শুখনরামের আশ্রিতা ও দেহবিলাসের সামগ্রী ফটকীকে সে নিজের শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করেছে, শুধু মৃতা স্ত্রী জানকীর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকায় সে তার দেহ উপভোগ করেনি। অবশ্য এই অবিশ্বাস্য ঘটনা বস্তুতান্ত্রিকদৃষ্টিসম্পন্ন তারাশঙ্করের চেতনায় প্রখর নীতিবোধের উদ্দীপনের ফলেই সম্ভব হয়েছে।

নতুন শ্যামনগর-পাঁচমতী সার্ভিস খোলার ব্যাপারে সে স্থানীয় এস ডি. ও.-র ড্রাইভার যোসেফ রজনী দাসের প্রভূত সহায়তা লাভ করে। প্রপিতামহের আমলে যোসেফেরা গিরিবরজার অধিবাসী ছিল। তার প্রপিতামহ এক বিধবাকে ভালোবেসে সমাজের কাছে লাঞ্ছিত হয়ে অবশেষে এখানে এসে ক্রীশ্চান হয়েছিল।

এস. ডি. ও.-র কাছ থেকে লাইসেন্‌স করিয়ে নেওয়ার কৌশল সম্পর্কে যোসেফের পরামর্শ তাকে অনেকখানি সাহায্য করে। তার প্রতি নরসিং-এর মুখ্য আকর্ষণের কারণ তার বোন মেরী নীলিমা। গায়ের রং কালো হলেও নীলিমার মধ্যে একটা সহজ স্বচ্ছন্দ উজ্জ্বলতা আছে, তা ছাড়া সে ইংরেজিতে দরখাস্ত লিখতে পারে। স্থানীয় প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা করে। ('সন্দীপন পাঠশালায় নতুন শিক্ষিকার প্রতি সীতারামের দুর্বলতা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, উভয় ক্ষেত্রেই নায়িকার প্রতি নায়কের শ্রদ্ধামিশ্রিত প্রেম নিরুচ্চার থাকলেও সীতারাম ও নরসিংকে প্রচণ্ডভাবে দোলা দিয়েছে)।

নরসিং-এর জীবনে নীলিমা একটা ভিন্নতর আবর্তের সৃষ্টি করে, তার সমস্যা বহির্মুখীনতা থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে অন্তর্মুখী হতে শুরু করে। নীলিমা ও ফটকী তার জীবনে জটিল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে—একটি মেয়ে শিক্ষিতা, মার্জিতরুচিসম্পন্না, সপ্রতিভ ও ভদ্র—আর একজন রূপযৌবনসম্পন্না, উচ্ছলা, লাস্যময়ী। নীলিমার কাছে প্রেম

আদর্শের ব্যঞ্জনায় রঞ্জিত, জনৈক খোঁড়া কানা কুৎসিতদর্শন যুবক তার প্রাণবল্লভ ; বালবিধবা ফটকী জীবনে নানামহল থেকে কুৎসিততম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে প্রেমের মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলেছে, সে নরসিং-এর কাছে উষ্ণ সাহচর্য চায়, নিরুত্তপ্ত আলিঙ্গনে তার হৃদয়ের বুভুক্ষা মেটে না। কিন্তু আশ্চর্য, নীলিমা নরসিং-এর কাছে অধরা জেনেও নরসিং তাকে কেন্দ্র করে স্বপ্ন দেখে আর ফটকী বারে বারে তার দেহের নৈবেদ্যে প্রাণের ঠাকুরকে তুষ্ট করতে পারে না। নীলিমার জন্য নরসিং-এর জীবনে অনেক দুর্যোগের কালো ছায়া নেমে আসে। কদর্য মারামারিতে ড্রাইভারদের সঙ্গে লিপ্ত হতে হয়। কিন্তু সবকিছুর সমাধান হয়ে যায় যখন ব্যানার্জীর সঙ্গে বিয়ের স্বপ্নে নীলিমা অন্যত্র চলে যায়। নীলিমা চলে যাওয়াতে নরসিং-এর মনে একটা গুরুতর ও গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, সে যেন সুস্থ ও সামাজিক জীবনের সবকিছু মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলে। তদুপরি তার দীর্ঘদিনের সহকারী নিতাই তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তার সঙ্গ ত্যাগ করে। এইরকম অশান্তির আগুনে যখন তার স্বপ্নগুলো আস্তে আস্তে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে তখন একদিন এক গুরুতর ঘটনা ঘটল। উকিল-বাবুর বাড়িতে ফটকীকে ভেট দিতে নিয়ে এসেছিল শুখনরাম। অশ্রুমুখী ফটকীকে দেখে প্রচণ্ড অন্তর্দাহে জ্বলে উঠল নরসিং। শুখনরামের ধাক্কায় পতনোন্মুখ ফটকীকে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলে সে। প্রচণ্ড সংঘর্ষের মুখেও সে দৃঢ়তা দেখিয়ে ফটকীকে সামাজিক মর্যাদা দিয়ে ঘরে নিয়ে আসে। ঘটনাটি আদালত পর্যন্ত গড়াল। এককালের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু নিতাই তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেও ফটকীর দৃঢ়তায় নরসিং তার পতিত্বের মর্যাদা পেল। পরে যোসেফ, রামা, নরসিং ও ফটকী শ্যামনগর-পাঁচমতী সার্ভিসের মায়া কাটিয়ে কোলিয়ারি এলাকায় চলে গেছে, যেখানে ব্যানার্জী ও নীলিমা আছে, যেখানে গেলে নতুন সার্ভিস খুলে জীবনকে নতুন করে, সুন্দরতর করে, উপভোগ করার উপায় মিলবে। সীতারামের তুলনায় নরসিং-এর জীবনের

vitality এবং passion অনেক ঋজু ও তীব্র, তাই তার অভিযান জীবনের এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে।

'সন্দীপন পাঠশালা' এবং 'অভিযান' উপন্যাস দুটিতে সীতারাম ও নরসিংকে কেন্দ্র করে সমাজের মধ্যে যে শ্রেণী-সংঘাতের চেহারা এবং তার উৎকট স্বরূপ দেখানো সম্ভব হত, তারাশঙ্কর সে চেষ্টা করেননি। তিনি মূল সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে সীতারাম ও নরসিং-এর চরিত্রে ত্রিকোণ প্রেমের সমস্যা দেখাতে গিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন বলে মনে হয়। এক্ষেত্রে তিনি পূর্বসূরী শরৎচন্দ্রের মতোই সামাজিক সমস্যার ঘাত-প্রতিঘাত দেখানোয় উৎসাহিত না হয়ে হৃদয়ের নিগূঢ় বেদনাকে রূপ দিতে বেশি উৎসাহিত হয়েছেন।

বিষয়বৈচিত্র্যের বিচারে তারাশঙ্করের সমগ্র সাহিত্যসৃষ্টি তুলনারহিত। এর প্রধান কারণ তাঁর সুবিপুল অভিজ্ঞতা, নানা শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে তার গভীর অনুসন্ধিৎসা। পরিবেশ অনুযায়ী আবহ-রচনায় তিনি প্রতিটি অনুপুঙ্খের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখেন, চরিত্রানুযায়ী ভাষা ও সংলাপ গড়ে তোলেন ('গন্নাবেগম'-এ উর্দু ভাষা এবং 'অরণ্যবহ্নি'তে সাঁওতালী ভাষার প্রয়োগ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়) এবং উপন্যাসের সুদীর্ঘ পটভূমিকায় তিনি চরিত্রগুলির ব্যক্তিগত মানসিক অভিরুচি ও ঘাত-প্রতিঘাতকে একটা ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হন। ১৩৭১ সালের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত 'শনিবারের চিঠি'-র তারাশঙ্কর-সংখ্যায় বিনয় ঘোষ 'তারাশঙ্করের সাহিত্য ও সামাজিক প্রতিবেশ' শীর্ষক প্রবন্ধে স্বীকার করেছেন, 'বালজাকের সাহিত্য দেখে, এঙ্গেলস্ বলেছিলেন, 'I have learned more than from all the professional historians, economists and statisticians of the period together', তারাশঙ্করের সাহিত্য সম্বন্ধে বলতে পারি যে আমরা তাঁর গল্প-উপন্যাস থেকে বাংলার গ্রামসমাজ (বিশেষ করে রাঢ়ের) ও লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক বিষয় শিখেছি ও জেনেছি, যা বহু পেশাদার ঐতিহাসিক,

অর্থনীতিবিদ্ ও সংখ্যাতত্ত্ববিদের বিবরণ থেকে শিখতে বা জানতে পারিনি।’—

রাঢ়ীয় লোকসংস্কৃতির প্রধানতম কথাকার ও বাংলাদেশ তথা ভারতীয় লেখকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানিক লেখক তারাশঙ্করের সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য আঞ্চলিকতা বা আঞ্চলিক অধিবাসীদের বিচিত্র জীবনযাত্রার রূপায়ণ। যে বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশপুষ্ট বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড মানবসমাজের তিনি উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, সেই পরিবেশাশ্রিত মানুষদের ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক ও নানারকম সামাজিক ঘটনার উল্লেখ করেছেন বিনয় ঘোষ তাঁর পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে, এখানে তাঁর মূল্যবান রচনা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত হলো :

‘বাংলার রাঢ় অঞ্চল আদিবাসীপ্রধান। স্তরিত শিলার মত রাঢ়ের লোক-সংস্কৃতির স্তরে স্তরে আদিম কৌমসংস্কৃতির উপাদান, নানা রূপে ও বিচিত্র বিন্যাসে গ্রথিত হয়ে রয়েছে। অতি প্রাচীন জন্মভূমি এই রাঢ় অঞ্চল। প্রাচীন জৈনসূত্রগ্রন্থে এই ‘লাঢ়’ বা ‘রাঢ়’ দেশকে জনপথশূন্য বনভূমি রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কথিত আছে, জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর রাঢ়দেশে ধর্মপ্রচারোদ্দেশ্যে ভ্রমণকালে পদে পদে নাকি আদিম অসভ্য অধিবাসীদের সম্মুখীন হতেন এবং তারা চু-চু করে তাঁর পশ্চাতে কুকুর লেলিয়ে দিত। বৌদ্ধগ্রন্থেও এই ধরনের কাহিনী আছে। এই সব কাহিনীর ইঙ্গিত স্পষ্ট। রাঢ় অঞ্চলে ছিল গভীর বিস্তীর্ণ অরণ্য আর তার মধ্যে ছিল আদিম জনসমাজ। যে সমাজ দীর্ঘকাল উন্নত হিন্দুসমাজ ও হিন্দুসভ্যতার সংস্পর্শে আসেনি। এলেও খুব বেশী তার দ্বারা অভিভূত হয়নি। বীরভূমের ‘বীর’ কথা মুণ্ডারী কথা, অর্থ হল জঙ্গল। প্রবল পরাক্রান্ত কোন বীরের দেশ বলে বীরভূম নয়, জঙ্গলভূম অর্থে বীরভূম। উত্তর রাঢ়ের মল্লভূম বীরভূম ঝারিখণ্ড জঙ্গলমহল, সবই গভীর বনাকীর্ণ ছিল। আদি অস্ত্রাল বা নিষাদ ও দ্রাবিড়-ভাষাভাষী দাসদস্যুদের বাস ছিল এই অঞ্চলে

বিষবেদেদের জীবনের মহাকাব্য বলা চলে। কতকগুলো লৌকিক কুসংস্কারে নিজেদের আনন্দ ও বেদনা, আশা ও আকুলতাকে বন্দী করে এরা যেন একটি আদিম অন্ধকারের জগৎ সৃষ্টি করে তার মধ্যে যুগ যুগ ধরে বাস করে এসেছে। তাদের অভিজ্ঞতার পরিধির বাইরে যে সমাজ এত বিবর্তিত হয়েছে তার খবর তারা রাখে না এবং সেজন্য তারা আত্মসন্তুষ্টও বটে। আর তাদের জীবনে এমন সমস্ত ঘটনা ঘটে যা আমাদের অভিজ্ঞতায় অনেকটা অসম্ভব বলে মনে হয়।

মহাদেব-শবলার সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতায় বাস্তবতার পটভূমির কোনো সন্ধান হয়তো না-ও মিলতে পারে কিন্তু যুবতী সুতনুকা আকর্ষণীয়া শবলার প্রতি আদিম, বন্য, হিংস্রস্বভাব মহাদেবের কামজ তাড়নার বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দেহের কোনো কারণ নেই। হয়তো তাদের পারিবারিক সম্পর্কের প্রশ্ন এখানে উঠতে পারে কিন্তু সভ্যতার ইতিহাস বিবর্তিত হতে হতে যে স্তরে এসে পৌঁছেছে যাতে পারিবারিক সম্পর্কে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে, বিষবেদেরা কি সেই ঐতিহাসিক বিবর্তনের বিন্দুমাত্র খবরও রাখে? তাছাড়া 'নাগিনী-কন্যা' হিসেবে ওদের সমাজে যে মেয়েকে স্বীকার করা হতো তার প্রাথমিক শর্ত ছিল স্বামী মৃত এবং মেয়েটিকে যৌবনলাবণ্যে সুদেহিনী হতে হবে। সংস্কারের প্রশ্ন বাদ দিলেও মেয়েটির অপরিতৃপ্ত যৌনপিপাসার উদ্দামতাকে সংযত করার বিধিনিষেধের ফলে মানবিক সত্ত্বার অধিকারিণী হিসেবে তার পক্ষে ঐ আদিম পরিবেশে নিজের বাধাবদ্ধ জীবনে মুক্তির স্বাদ পেতে চাওয়া স্বাভাবিক। সে যৌবনের ফেনিল উদ্দামতাকে অবাধে মুক্ত করে দিতে চেয়েছে, এ ব্যাপারে সমাজপতি মহাদেব গোপনে তার আসঙ্গ কামনা করে আহ্বান জানায়। কিন্তু শবলার প্রেমিক স্বতন্ত্র যুবক, অতএব প্রচণ্ড সংঘাত শুরু হল। পরিণামে সেই যুবকের মৃত্যু হলেও শবলা মহাদেবের কুক্ষিগত থাকেনি, তাকে ছুরিকাঘাত করে নিজে পালিয়েছে।

তারপর 'নাগিনী-কন্যা'র পদে পিঙ্গলা মনোনীতা হল। শিরবেদে গঙ্গারাম তার প্রতি প্রচণ্ডভাবে আকৃষ্ট, ভাদুও তার প্রতি দুর্বলতা বোধ করে, রাঢ়দেশের নাগু ঠাকুর তাকে দেখে মোহিত হল। জমিদার বাড়িতে সাপ ধরার সময় সম্পূর্ণ নগ্ন পিঙ্গলাকে দেখে নাগু ঠাকুরের বুকে ঝড় ওঠে, সে পরে মায়ের আদেশের অছিলায় তাকে নিতে আসে। কিন্তু অসামান্য কুটিল বুদ্ধির অধিকারী, ডোমন করেত, চতুর গঙ্গারাম তা বুঝতে পারে এবং নাগু ঠাকুরকে প্রহার ও অপমান করে ফিরিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, সে পিঙ্গলার ঘরের পাশে আতরের গন্ধ-মাখানো তুলো গুঁজে দিয়ে তার মনে এই বিশ্বাস জন্মাতে চেয়েছিল যে তার গায়ে চম্পকগন্ধের সৌরভ পাওয়া যায়। তার ধারনা ছিল, এই বিশ্বাসে ভুল করে পিঙ্গলা রাত্রির অন্ধকারে বেরোলে অথবা তার সঙ্গে কোথাও পালিয়ে যেতে চাইলে সে স্বচ্ছন্দে তাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে কারণ জমিদার বাড়িতে সেও পিঙ্গলার নগ্নরূপ দেখে নাগু ঠাকুরের মতোই কামার্ত হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত নাগু ঠাকুর এল, গঙ্গারামকে সে হত্যাও করল অথচ পিঙ্গলাকে পেল না—চতুর গঙ্গারামের কুটিল ষড়যন্ত্রে পিঙ্গলা শঙ্খচূড়ের ছোবলে নিহত হল। শবলা পরে ফিরে এসেছিল—সে সাঁতালী বেদেদের নিয়ে রাঢ়ের পথে বেরিয়েছে। 'আর সাঁতালী নয়, অন্যত্র এদের নিয়ে বসতি স্থাপন করবে। মানুষের বসতির কাছে গ্রামে তারা স্থান খুঁজছে।'

ধূর্জটি কবিরাজের ছাত্র ও শিষ্য শিবরামের মুখে এই কাহিনীর কথকতা আরোপিত হওয়ায় কাহিনীটি একটি নতুন স্বাদ পেয়েছে। বিষ-বেদেদের জীবনের এই উপাখ্যানে সাপুড়ে সমাজের রীতি-নীতি, আচার ব্যবহার ও ক্রিয়াকলাপের বাস্তব রূপায়ণ লেখকের জীবন-বোধের ব্যাপ্তি, অভিজ্ঞতার গভীরতা ও যথার্থ বাস্তববোধের দ্যোতক। কবির মতো এই উপন্যাসেও তিনি সংলাপ, শব্দনির্বাচন ও ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বদা পরিবেশ ও পাত্রপাত্রীদের দিকে প্রখর দৃষ্টি

রেখেছেন, কবির মতো এখানেও সঙ্গীতের প্রয়োগ সুষম, সুমিত এবং সুসমঞ্জস।

'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' ১৩৫৪ সালের আষাঢ় মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'কোপাই নদীর প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় যে বিখ্যাত বাঁকটার নাম হাঁসুলীবাঁক—অর্থাৎ যে বাঁকটায় অত্যন্ত অল্প পরিসরের মধ্যে নদী মোড় ফিরেছে সেখানে নদীর চেহারা হয়েছে ঠিক হাঁসুলীর গয়নার মত। বর্ষাকালে সবুজ মাটিকে বেড় দিয়ে পাহাড়িয়া কোপাইয়ের গিরিমাটি-গোলা জলভরা নদীর বাঁকটিকে দেখে মনে হয়, শ্যামলা মেয়ের গলায় সোনার হাঁসুলী; কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে জল যখন পরিষ্কার সাদা হয়ে আসে তখন মনে হয় রূপোর হাঁসুলী। এই জন্যে বাঁকটার নাম হাঁসুলীবাঁক'।[৪] 'নাগিনী-কন্যার কাহিনী'র মতো এই উপন্যাসের পটভূমিও কোনো সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানায় চিহ্নিত নয়; উভয় উপন্যাসের উপজীব্য ইতিহাস নয়, কাহিনী বা উপকথা, অতএব অতিপ্রাকৃতের ঘনকুহেলিকা-মণ্ডিত জীবনচর্যার আস্বাদন স্বাভাবিক। শিবরামের মুখে আমরা 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' শুনেছি, এই উপন্যাসেও অশীতিপর বৃদ্ধা সুঁচাদ পৌরাণিক কল্পনা, অলৌকিক সংস্কার ও বিশ্বাস, প্রাচীন কিংবদন্তী ও আখ্যান, সদ্য অতীতের ঘটনা-প্রতিফলিত জীবনদর্শনের প্রতীক হিসেবে যেন এক দৈবশক্তির অনুভবকারিনী, অতএব ব্যাখ্যাত্রী।

'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'য় এক অন্ধকারাচ্ছন্ন অতিপ্রাকৃত জগতের বর্ণনায় লেখক অপরিসীম দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সভ্যতার আলোকবর্জিত, আদিম জীবন-পিপাসায় উদ্‌ভ্রান্ত এবং প্রকৃতির লীলা-বৈচিত্র্যে অসহায় মানুষগুলির চিত্রণের ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের সমাজ-জিজ্ঞাসাও প্রতিফলিত হয়েছে। করালী অনিরুদ্ধের ব্যাপক সংস্করণ, সে অত্যাচারিত কাহারকুলের মূর্তিমান প্রতিবাদ। কত্তাবাবুর বাহনকে সে পুড়িয়ে মারার স্পর্ধা রাখে, মনিবশ্রেণীর

মাইতো ঘোষের কাছে তার ব্যবহার রীতিমতো উদ্ধত, বাবুদের বকশিশে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। সে দৃঢ়কণ্ঠে বলে, "যে আসেঙ্গা সে আসেঙ্গা, হাম কেয়ার করতা নেহি হ্যায়'। বাঁশবাঁদির অতিপ্রাকৃত জগৎকে পিছনে ফেলে সে অবলীলাক্রমে চন্ননপুরে চলে যায়।

কিন্তু বনওয়ারী ঐ সমাজের মুখ্যতম প্রতিনিধি, সে মাতব্বর। 'সকল কর্মের উপরে হ'ল তার মাতব্বরির দায়িত্ব, গ্রামের ভাল আগে দেখতে হবে তাকে।' করালীর উদ্ধত বেপরোয়া চালচলন তাকে ক্রুদ্ধ করে তোলে। শুরু হয় নবীনের সঙ্গে প্রবীণের সংঘাত।

করালীর অপরাধের ফলে কাহারপাড়ায় নানারকম বিপদ ঘটতে শুরু করেছে বলে বনওয়ারী বিশ্বাস করে, তাই সে সকলকে সাবধান করতে লাগল করালীর সান্নিধ্য বর্জনের জন্য; করালীর পাপের জন্য সে পাঁঠাবলি দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছে কারণ সে পাড়ার অভিভাবক। সে বিশ্বাস করে, 'এই যে মাতব্বরি, এর চেয়ে ঝকমারির কাজ আজ আর কিছু নাই। রাজার দোষে রাজ্যনাশ, মণ্ডলের দোষে গ্রাম নাশ। প্রজার পাপে রাজ্য নষ্ট, গ্রামের পাপে মণ্ডলের মাথায় বজ্রপাত।' এই চেতনার ফলেই সে বাঁশবাঁদির আদিম-অন্ধকারাচ্ছন্ন বাঁশবনে কোপাইয়ের বুক থেকে ছুটে-আসা হড়পা বনের মত যৌনপিপাসার প্লাবনে প্লাবিত করে দিলেও পরস্ত্রী কালোশশীকে, তার 'অঙ'এর মানুষকে 'সাঙ্গা' করতে পারে না।

করালী মাইতো ঘোষকে মানে না, বনওয়ারীকে তো পাত্তাই দেয় না। অথচ পাড়ার আসরে বনওয়ারী ঘোষণা করে সে করালীর মতো চাল চলন সহ্য করবে না, এমন কি, স্থানীয় দারোগাকেও সে করালী সম্পর্কে সচেতন করতে চেয়েছে অথচ দারোগার চোখে সে বাহাদুর ছোকরা—সাপ মারার জন্য সে পাঁচটাকা বকশিশ পাবে। করালীর প্রতি বনওয়ারী দুর্বলতা বোধ করতে থাকে। করালী ও পাখীকে কেন্দ্র করে পাড়ায় নতুন যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, কালোশশীর কথা

মনে পড়ায় সে যেন সমস্যার সঙ্গে নিজেকে আর জড়াতে চায় না। কাহারপাড়ার দলাদলির প্রধান মুরুব্বীদের প্রতি করালীর ক্রোধ অপরিসীম বৃদ্ধি পায়। বনওয়ারীর সঙ্গে তার মারামারি এবং বনওয়ারীর পরাজয়ের কথা সে বীরবিক্রমে জানিয়ে দেয়।

বনওয়ারীর পরাজয় কাহারপাড়ার কাছে রীতিমত বিস্ময়ের ব্যাপার। সে শুধু তাদের মাতব্বরই নয়, তাঁর নির্দেশে রেললাইনের কুলিগ্যাঙের বস্তির অধিবাসিনী স্বৈরিণীরা কাহারপাড়ায় প্রবেশ করতে পারে না, সিধু ও জগদ্ধাত্রীর প্রতি স্নেহশীল হলেও প্রখর নীতিবোধের ফলে তার আদেশ অমান্য করার স্বাধীনতা ও সাহস ওদের নেই। এমন কি, অসময়ে তাকে নিজের বাসায় আসতে দেখে করালীর মতো দুর্বিনীত স্বেচ্ছাচারীরও 'মুখ শুকিয়ে' যায়। বনওয়ারী করালী ও পাখীকে নিজেদের এলাকায় ফিরিয়ে নিতে [illegible]ছে। সাময়িকভাবে করালী যেন তার বশ্যতা স্বীকার করে। আত্মতৃপ্তিতে বনওয়ারী যেন নতুন করে আবিষ্কার করে শক্তিমান করালীকে। থানায় তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করায় সে আরো খুশি হয়। তাই, পানু প্রহ্লাদ ও নয়নের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সে করালী ও পাখীকে ফিরিয়ে আনার একটা যৌক্তিকতা খুঁজে পায় যেন। উদ্ধত করালী যেন সাময়িকভাবে বনওয়ারীর প্রতি বিনয়াবনত হয় এবং এই সুযোগে সে 'তাকে বার বার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে, পঞ্চায়েতের হুকুম অমান্য করা চলবে না। দেবতা-গোঁসাইকে মানতে হবে, অনাচার অধর্ম করবে না। পাকাচুলের কথা না শোন নাই শুনবে, কিন্তু প্রবীণ মুরুব্বির 'রপমান' কখনও করবে না। করালী সে প্রতিজ্ঞা করেছে।' বনওয়ারী সং— সে 'শালের চালায়' থাকলে গুড় চুরি হয় না, শান্তিবাদী-গান্ধী-রাজার কথা তার ভালো লাগে; সে সমাজকে ভাঙতে দিতে চায় না, করালীকে দিয়ে সে কাহারপাড়ায় 'হিতমঙ্গল' করতে চায়। সে চায় না স্থানীয় যুবকেরা কৃষিকর্ম ও পাল্কি-বাহন পরিত্যাগ করে, পিতৃপুরুষের কুলকর্মে জলাঞ্জলি দিয়ে,

'কলকারখানার তেলকালি-ভরা আলক্ষ্মীর পুরী ধরমনাশা এলাকায়' চলে যাক।

কালোশশী ও তাকে কেন্দ্র করে আটপৌরে পাড়ায় গীত রচনা হওয়াতে তার নীতিবোধে আঘাত লাগে, সে বাবার বাহনের হত্যাকারী করালীকে সমাদর করায় নিজেকে অপরাধী বলে মনে করতে থাকে। নীতিবিবর্জিত প্রেমের জন্য সে প্রায়শ্চিত্ত করতে মনস্থ করে।

বর্ষার সময় স্টেশন থেকে 'তেরপল' এনে বনওয়ারীকে সাহায্য করায় করালীর প্রতি সে অত্যন্ত খুশি হয়। কিন্তু হেদোমণ্ডলের একটি অবমাননাকর উক্তিকে কেন্দ্র করে করালী পুনশ্চ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং মণ্ডলের প্রতি বনওয়ারীর ব্যক্তিত্ব-বিবর্জিত সহনশীলতায় সে যখন উষ্মা প্রকাশ করে [illegible] স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে সে বিস্ময় ও শ্রদ্ধার কারণ হয়ে ওঠে। বনওয়ারীও স্বীকার করে 'কথাটি করালী বলেছে ঠিক। তবে —। তবে এমন চেঁচিয়ে না বললেই হত। লঘু-গুরু তো মানতে হয়। ভগবান, বাবা কালারুদ্দের বিধানে তো এ লেখাই আছে, পায়ে মাথায় সমান নয়।' তবু বনওয়ারী করালীর চারিত্রিক পরিবর্তনের প্রতি আশা রাখে।

বনওয়ারীর মনের মধ্যে একটি সাধ হয়। করালীকে নিয়ে সাধ। সে জেনেছে, বেশ বুঝেছে, এই ছোড়া থেকে হয় সবনাশ হবে কাহার-পাড়ার, নয় চরম মঙ্গল হবে। সবনাশের পথে যদি ঝোঁকে তবে কাহারপাড়ার অন্য সবাই থাকবে পেছনে লাগতে লাগবে তার সঙ্গে। সে পথে করালী গেলে বনওয়ারী তাকে ক্ষমা করবে না। তাই তার ইচ্ছা তাকে কোলগত করে নেয়। তার 'পুত্ত' সন্তান নাই। ডান হাত থেকে বঞ্চিত করেছে ভগবান। বনওয়ারীর ইচ্ছে, বিধাতা যা তাকে দেন তাই নিজের কর্মফলের জন্য সে তা এই পিথিমীতে অর্জন করে।'

করালীর শক্তি, সাহস ও বুদ্ধির প্রতি আস্থাশীল বনওয়ারী চায়

করালী যেন দুঃসাহসের বশে চুরি না করে। হিন্দু খালাসীদের সঙ্গে মুসলমান খালাসীদের দাঙ্গায় করালীর অমিত বিক্রমের কথা শুনে বনওয়ারী আপশোষ করে, 'ছোকরাটা যদি বনওয়ারীর 'পুত্তু' হত।' করালীও যেন ইদানীং বনওয়ারীকে খানিকটা 'বাপ খুড়োর মত' ভালবাসতে শুরু করেছিল, তাই সে সর্বসমক্ষে বনওয়ারীর পায়ে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল—আটপৌরে পাড়ায় আর কখনো সে লাঠি খেলতে যাবে না, 'ধার্মিক লোক' বনওয়ারীকে সে 'একশো বার হাজার বার' মানবে। কত্তাবাবার বাহনকে হত্যা করার জন্য করালীর মনে কোনো শঙ্কা বা সংশয় ছিল না, বাবাঠাকুরের 'আশ্চয়', আত্তিকালের শিমূলবৃক্ষের ডালে সে অবলীলাক্রমে উঠে চন্ননপুরে বৈদ্যুতিক তারে আগত আসন্ন ঝড়ের বার্তা ঘোষণা করতে পারে; 'আমার মাতব্বর আমি' ঘোষণা করে সে স্থানীয় অধিবাসীদের অলৌকিক দৈবশক্তির প্রতি নির্ভরতার প্রতিবাদ হিসেবে পুনশ্চ শিমূলবৃক্ষে আরোহণ করতে চলে; পিতৃপুরুষের ট্র্যাডিশনকে অস্বীকার করে নতুন কোঠাঘর করতে চায়, এককথায় 'কাহারপাড়ার করালী যেন ভিনদেশী মানুষ। জাত এক হলে কি হয়, রীতকরণ আলাদা,—বাক্যি, যে বাক্যি শিখেছে সে হাঁসুলীবাঁকের কাহার-পাড়ায়, সেই মুখের বাক্যি পর্যন্ত আলাদা হয়ে গিয়েছে।' সেজন্যই করালী চৌধুরীবাড়ির মাহিন্দারের সঙ্গে মনিববাড়ি যেতে অস্বীকার করেছে, আইন-আদালতের প্রশ্ন তুলেছে, মনিবে ধান বন্ধ করলে স্থানীয় যুবকবৃন্দকে কারখানায় কাজ করতে যেতে প্ররোচিত করেছে, বিজ্ঞানবিমুখ বনওয়ারীকে আসন্ন বর্ষণের বিদ্যুৎবাহিত সংবাদটি যথাসময়ে জানিয়েছে, পাপপুণ্যের মোটা নিয়মে জীবন-মৃত্যুর বিচার না করে মাথলার ছেলেকে হাসপাতালে না নিয়ে যাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে, ঝড়ে বাবাঠাকুরের বেলগাছটি পড়ে গেলে আতঙ্কিত কাহারদের সামনে দাঁড়িয়ে বিদ্রূপ করে বলেছে 'বাবাঠাকুরের ডিঙ্গা উল্টাল্লছে' এবং শেষ পর্যন্ত বনওয়ারীর সঙ্গে হিংস্র ও নারকীয়

মারামারি করে তার 'মাথায় লাথি' মেরে তার দ্বিতীয়া স্ত্রী সুবাসীকে নিয়ে নিজের আস্তানায় গিয়ে উঠেছে।

উপন্যাসটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বনওয়ারীর সঙ্গে করালীর বিরোধের ইতিহাসটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তারাশঙ্কর যেন মানবিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী, নীতিবাদী, শান্তিপ্রিয়, প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় আস্থাশীল, বিজ্ঞানবিমুখ, আস্তিক্যচেতনায় বলিষ্ঠ একজন মানুষের সঙ্গে তাৎক্ষণিক আনন্দে উচ্ছ্বসিত, দুর্নীতিগ্রস্ত, বেপরোয়া, সমাজব্যবস্থার প্রতি উদাসীন, বিজ্ঞানের প্রতি আস্থাশীল, নাস্তিক এক যুবকের সংঘর্ষ এবং পরিণামে পুরোনো কালের প্রতীক মানুষটির মৃত্যু ঘটিয়ে যেন নতুন কালের আবির্ভাবকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে, নতুন কালকে লেখক কখনো প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেননি। পুরোনো আমলের মানুষ, সমাজ-জীবন এবং শান্ত প্রকৃতির মধ্যেই তিনি যেন অধিকতর আনন্দের স্বাদ পান—ন্যায়রত্ন, বনওয়ারী, জীবন মশায় তাঁর কাছে যতোখানি শ্রদ্ধাভাজন, দেবু, করালী বা প্রদ্যোত লেখকের শিল্পিসত্তাকে ততোখানি উল্লসিত করে না।

সমাজজিজ্ঞাসার প্রশ্নে 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'য় আর একটি বক্তব্যও বিচার্য। উপন্যাসের প্রধানতম চরিত্র বনওয়ারী, কোপাই-তীরবর্তী কাহারকুলের সে বিশিষ্টতম প্রতিনিধি—লেখকের এই সুবৃহৎ উপন্যাসে কাহিনীর গতি সাধারণত তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। বনওয়ারীর চরিত্রে দেবু ঘোষের কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় যেখানে লেখকের সমাজচিন্তা স্পষ্টগোচর হয়ে ওঠে। দেবুর লক্ষ্য বনওয়ারীর বিপরীতমুখী, তার জীবন বনওয়ারীর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। একাল এবং সেকালের এই দুই প্রতিনিধির সমাজচেতনা কিন্তু প্রায় সমান্তরাল: বিক্ষোভ বা বিদ্রোহ নয়, নীতি এবং প্রচলিত রীতিকে স্বীকার করে নিয়ে সংস্কার-সাধনই তাদের উদ্দেশ্য। অনিরুদ্ধ এবং করালীর প্রতি তাদের ব্যক্তিগত স্নেহ ভালোবাসা সত্ত্বেও তারা যেন দেবু ও বনওয়ারীর কাছে মূর্তিমান উপদ্রব

বনওয়ারীর মতো আদিম বন্য জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত না হওয়ায় শিক্ষা সুরুচি ও সর্বোপরি যুগোচিত রাজনৈতিক চেতনার ফলে দেবুর সঙ্গে অনিরুদ্ধের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠেনি।

তাছাড়া, দেবুর চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি সে জমিদার-মহাজন-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমাজ শিরোমণিদের প্রতি সামান্য বিরূপতা ব্যতিরেকে মোটামুটিভাবে তাদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করতে চায়নি—যেখানেই বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছে, সেখানেই সে আপোষের শান্তিবারি সিঞ্চন করেছে কারণ বিক্ষোভের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সে অতিমাত্রায় সচেতন। এদিক থেকে বনওয়ারী তার সহধর্মী যদিও পরিবর্তিত কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিক্ষুব্ধ করালীকে শাসকশ্রেণীর সঙ্গে মহাজনদের সম্মিলিত কৌশল বিন্দুমাত্র পর্যুদস্ত করতে পারেনি। কাহারদের প্রতি যুগ যুগ ধরে সমাজের সুবিধাবাদী সম্প্রদায়ের নির্মম নির্যাতন সত্ত্বেও বনওয়ারী তাদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ভক্তিপরায়ণ। তার দৃঢ় বিশ্বাস 'ঘোষবাড়ির নক্ষীর এঁটো-কাঁটায় বনওয়ারীর পিতিপুরুষের জেবন', মনিবেরা বিদ্বান ও জ্ঞানবান, প্রয়োজন হলে কাহারদের পক্ষ নিয়ে প্রতিপক্ষের সঙ্গে ঝগড়াবিবাদও করেন। প্রতিপক্ষ কঠিন হলে, 'ভদ্র মহাশয়দের বলেন—আপনার মত লোকের ওই ঘাসের ওপর রাগ করা সাজে? ঘাসও যা ও-বেটাও তাই।

কখনও বলেন—পিঁপড়ে। ও তো মরেই আছে। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা কি আপনার সাজে? তারপর রতনদের ধমক দিয়া বলেন—নে বেটা উল্লুক কাহার কাঁহাকা, নে ধর্ পায়ে ধর্। বেটা বোকা বদমাস হারামজাদা।

পায়ে ধরিয়ে বলেন নে, কান মল্, নাকে খত দে। তাতেও যদি না মানেন বড় কঠিন লোক বাবু মহাশয়, তবে মনিব নিজেই হাত জোড় করে বলেন—আমি জোড়হাত করছি আপনার কাছে। আমার খাতিরে ক্ষমা-ঘেন্না করতেই হবে। 'না' বললে শুনব না।'

মনিবদের এই ধরনের 'স্নেঁহ'র জন্য বনওয়ারীর কৃতজ্ঞতার সীমা নেই— মনিবদের সামনে তার দাঁড়ানো, বসা, কথা বলার ভঙ্গি পর্যন্ত সবকিছুতেই যেন তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া সে বিশ্বাস করে, মনিবের বাড়িতে লক্ষ্মীর পায়ের ধূলো পড়ায় তার বাবার অবস্থা স্বচ্ছল হয়েছিল, সে চন্দনপুরের বড়বাবুর বাড়িতে দাসত্বের স্বপ্ন দেখে পরম তৃপ্তি অনুভব করে, তার চোখে দয়ালু এবং দণ্ডদাতা হিসেবে কত্তাবাবার পরেই মনিবদের স্থান, জমি থেকে প্রথম ফসল উঠলে সে 'দেবতা-ব্রাহ্মণ-রাজা-মনিব'কে না দিয়ে খায় না, এমন কি, ভোগ দিতে গিয়ে যদি নিজের না-ও থাকে তবু সে 'হাত-পা ধুয়ে হাসিমুখে ঘরে ঢুকবে', কাহার পাড়ার মতব্বর হয়েও তার ভদ্রশ্রেণীর মানুষদের প্রতি আনুগত্যের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত হল ভদ্রজনদের লালসা-বহ্নিতে নিজেদের মেয়েদের দেহসমর্পণকে সে 'বিধির বিধান' বলেই মান্য করে। তার 'ভয় 'বাস্তন'-বৈদ্য বড় জাত মহাশয়দের জিভকে, ও জিভের বাক্যিতে আর শিল্বের বাক্যিতে তফাত নাই।' তাই সে সকলকে অনুরোধ করে, 'সকাল সন্ধ্যে দেবতাকে প্রণাম ক'রে বল এ জন্মে এই হল, আসছে জন্মে যেন উঁচু কুলে জনম দিয়ো দয়াময় হরি হে।'

শাসক ও শোষকশ্রেণীর প্রতি এই ধরনের প্রচণ্ড আনুগত্য সত্ত্বেও বনওয়ারী লেখকের সপ্রশংস শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছে কারণ কোপাই-তীরবর্তী কাহার সম্প্রদায়ের উৎসাদনে মৃত্যুপথযাত্রী বনওয়ারীর বিষণ্ণতা একালের যন্ত্রশাসিত সভ্যতার প্রতি লেখকের বিরূপতা মনে করিয়ে দেয়। কাহিনীর উপসংহারে নতুন কালের কাহারদের প্রতি লেখকের তির্যক মনোভঙ্গির উদাহরণ থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় করালী নয়, বনওয়ারীই লেখকের মানসপ্রতিভূ : 'চন্দনপুরে কারখানায় খেটেও তারা না খেয়ে মরে। কিন্তু তার জন্যে বাবা ঠাকুরকে ডাকে না। ইতিহাসের নদীতে নৌকা ভাসিয়ে তাদের তাকাতে হচ্ছে কম্পাসের দিকে বাতাস দেখার যন্ত্রটার দিকে।'

মানুষ অথবা সমাজের কাছে ধ্বংসই শেষ কথা নয়, এই বিশ্বাসের ফলে লেখক করালীর হাত দিয়ে নতুন সমাজকে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। নতুন জীবনের অগ্রদূত হিসেবে করালীর এই আবির্ভাব তবু যেন প্রত্যাশিত নয়, অনেকটা আরোপিত। কারণ মহৎ জীবনাদর্শের কথা বাদ দিলেও যে আদিম জৈব স্থূল প্রবৃত্তির বশে, বনওয়ারীর নেতৃত্বে হাঁসুলীবাঁকের মানুষেরা লালিত পালিত, করালী তার ব্যতিক্রম নয়। পরন্তু জীবনাদর্শের ক্ষেত্রে বনওয়ারী ও করালী একই ভাবনার অন্তর্ভুক্ত দুটি চরিত্র—একে অপরের সমান্তরাল নয়, পরিপূরক। শক্তি, ঈর্ষ্যা, প্রেম, পাপ ও পতনের দিক থেকে বনওয়ারী যেন হাঁসুলী-বাঁকের কুটিল-সর্পিল খামখেয়ালী নৈসর্গিক রূপের মানুষী প্রতীক। হাঁসুলীবাঁকের স্থবির ভয়ঙ্কর নিশ্চলতা বনওয়ারীকে যেমন রূপ দিয়েছে, করালীকে ততোখানি সর্পিল হিংস্রতায় গড়ে তোলেনি, বাঁশবাঁদির বাইরের নতুন কাল-বাহিত আবহাওয়াই এর মূল কারণ।

হাঁসুলীবাঁকের স্থানিক আবহাওয়ায় পুষ্ট কালদ্বন্দ্ব কয়েক বছর বাদে (চৈত্র ১৩৫৯) প্রকাশিত তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'আরোগ্য-নিকেতন'-এ বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে নতুন করে লেখক দেখিয়েছেন। কিন্তু তৎপূর্বে আঞ্চলিক সংস্কৃতিপুষ্ট জীবনচর্যায় লেখকের পারদর্শিতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হিসেবে 'মঞ্জরী অপেরা'র কাহিনী উপস্থাপনে লেখকের সমাজসচেতনতা কতখানি কার্যকর হয়েছিল তা বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন।

'কবি'র কবিয়াল সম্প্রদায়কে লেখক যে আশ্চর্য তথ্যনিষ্ঠা ও কল্পনা-শক্তির সংমিশ্রণে জীবন্ত করে চিত্রিত করেছেন 'মঞ্জরী অপেরা'য় লেখক সেই ধারাতেই অনুবর্তন করেছেন। আমাদের লোকসংস্কৃতিতে যাত্রার স্থান অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের গ্রামীণ পরিবেশে ভক্তিসাধনার অন্যতম বিশিষ্ট উপাদান হিসেবে সহজ-সরল মানুষদের কাছে যাত্রার আবেদন ছিল সার্বজনীন। পৌরাণিক দেবদেবীর সঙ্গে

মর্ত্যের মানব-মানবীর যোগাযোগ যেন প্রত্যক্ষ হয়ে দেখা দিত এই সম্প্রদায়ের যাত্রা পরিবেশনের বাস্তবসম্মত মুন্সীয়ানায়। পৌরাণিক ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে যাত্রার নটনটীরা যেন মাঝে মাঝে নিজেদের চরিত্রে দিব্যভাবের ক্ষণিক উপলব্ধি করত এবং তারই সূত্র ধরে তাদের জীবনে সঞ্চারিত হত সৌন্দর্য ও মাধুর্যের প্রতি অনুরাগ। এই যাত্রার ঐতিহ্য, ভাবপ্রেরণা এবং নাট্য ও অভিনয়কলা সম্বন্ধে তারাশঙ্করের জ্ঞান ও গভীর অনুভূতি রীতিমতো আশ্চর্যজনক। তথ্যের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ও আসক্তির প্রাবল্যের প্রমাণ হিসেবে এই উপন্যাসখানি অন্যতম উৎকৃষ্ট উদাহরণ। শোনা যায়, যাত্রা ও নটনটীদের জীবনধারণপ্রণালী সম্পর্কে গভীরতর জ্ঞানান্বেষণের তাগিদে তিনি নাকি উপন্যাসটি রচনাকালে যাত্রাদলের দিকপাল আচার্য ফণী বিদ্যাবিনোদকে (বড় ফণী) নিজের বাড়িতে এনে কয়েকদিন রাখতে চান এবং ফণী তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেন। যাত্রাবিষয়ে তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে চাওয়ার প্রধান প্রেরণা তিনি পেয়েছেন বাংলাদেশের প্রাচীন সংস্কৃতি-সম্বন্ধে তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি থেকে।

'কবি' 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' ও 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'য় তিনি যেমন চরিত্রগুলিকে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া-পরিপুষ্ট করে তুলেছেন, 'মঞ্জরী অপেরা'র চরিত্রগুলিও তেমনি যেন সম্পূর্ণভাবে পরিবেশাশ্রিত। মঞ্জরী, রীতুবাবু, গোরাবাবু, অলকা প্রভৃতি চরিত্রগুলি যেন পুরাশক্তি, যৌন আকর্ষণ ও একপ্রকার অতৃপ্ত, অস্থির, বোহেমিয়ান জীবনতৃষ্ণার অক্ষত্রয়ের উপর উন্মত্তভাবে বিঘূর্ণিত। কলানুরাগ এবং দলের প্রতি আনুগত্য-বিশ্বস্ততা তাদের রসাতলমুখী জীবনের পতনবেগকে প্রতিহত করে।

পরিবর্তিত সামাজিক রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী যাত্রার গুরুত্ব বর্তমান সমাজে কী পরিমাণ রয়েছে লেখকের সচেতন দৃষ্টি সেদিকেও নিবদ্ধ হয়েছে। সাধারণ অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত সমাজের অপাংক্তেয় এক

সমাজের জীবনযাত্রার বিচিত্র কাহিনী বর্ণনায় তারাশঙ্কর যে আমাদের সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক, 'মঞ্জরী অপেরা' তা পুনশ্চ প্রমাণ করেছে। সত্য-মিথ্যা, প্রেম-পাপ ও জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বসঙ্কুল পটভূমি একালের তারাশঙ্করের সাহিত্যচেতনাকে আবিষ্ট করে রাখলেও 'মঞ্জরী অপেরা' অতি আকস্মিকভাবে লেখককে যেন সাহিত্যজীবনের পূর্বার্ধে প্রত্যাবর্তন করতে অনুপ্রাণিত করেছে।

'মঞ্জরী অপেরা' প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন,—তিনি গোরাবাবু ও মঞ্জরীকে ছেলেবেলায় দেখেছেন, গোরাবাবুর শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল, এমনকি, রীতুবাবু সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। যে উপকরণ নিয়ে তিনি এই উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন তার প্রতিটি অনুপুঙ্খের প্রতি তাঁর সূক্ষ্মদর্শিতার জন্য তাঁকে অনেকে প্রশ্ন করেছিলেন: 'যাত্রা দল বা যাত্রা পার্টি সম্বন্ধে এত জানলেন কেমন করে?' অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে অনেকে রসিকতা করে জিগোস করেছিলেন: 'কি মশায় যাত্রার দলে কখনও ভিড়েছিলেন নাকি? মেয়ে-যাত্রার দলে?' শুধু তাই নয়, যাত্রাদলের এবং তাদের অভিনয়ের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও অভিজ্ঞতার জন্য যাত্রার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকে তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছিলেন, পুরোনো কালের অভিনেতা প্রভাসবাবু ফণি বিদ্যাবিনোদ থেকে আধুনিক কালের স্বপনকুমার পর্যন্ত। তাঁকে 'মঞ্জরী অপেরা'র সুরটিই ধরিয়ে দিয়েছিলেন জয়নারায়ণ, যিনি যাত্রা থিয়েটার দুই দলেই কাজ করেছেন। 'ভাবনা-কাজী'-খ্যাত দিলীপও তাঁর সঙ্গে আলাপ করে গিয়েছিলেন এবং রবীন্দ্র সদনে 'বিদ্যাসাগর' পালার বিশেষ অভিনয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি একবার উপস্থিত ছিলেন।

'মঞ্জরী অপেরা'র মতো তাঁর প্রয়াণের মাত্র এক বছর আগে প্রকাশিত 'অভিনেত্রী' উপন্যাসের পাতাতেও যাত্রাদলের বিভিন্ন সমস্যা, অভিনয়, অভিনেতা-অভিনেত্রীর মানসিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ প্রভৃতির উপস্থাপন লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসটি তিনি নটসূর্য অহীন্দ্র

চৌধুরীকে উৎসর্গ করেছিলেন। এই উপন্যাসের নায়ক বাপ্পারাওয়ের ভূমিকায় অসামান্য অভিনয় করে বাপ্পা বোস হিসেবে দর্শকদের কাছে নতুন নামে অভিহিত হন। তারাশঙ্কর শেষ পর্বের অধিকাংশ রচনাতে এমন একটা ঘরোয়া মেজাজে, বৈঠকী ভঙ্গিমায়, কাহিনীটি প্রকাশ করতেন যা কাহিনীর মধ্যে একটা স্বতন্ত্র স্বাদের আমদানি করত, গল্পটিকে অধিকতর বিশ্বাসগ্রাহ্য করে তুলত। গল্পের পশ্চাতে কোনো পটভূমি আছে কি নেই, চরিত্রগুলো লেখকের বাস্তব ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে রূপায়িত হয়েছে কিনা—এইসব প্রশ্নে পাঠকের মন আন্দোলিত হত।

'মঞ্জরী অপেরা'কে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক মহলে তারাশঙ্কর সম্পর্কে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। 'কবি'র পরে বাঙলাদেশের লোকসংস্কৃতির স্বতন্ত্র একটি ধারাকে কেন্দ্র করে লেখক রচনা করেছিলেন অসামান্য এই উপন্যাস। যাত্রার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি লেখকের প্রতি প্রীতি ও অভিনন্দন জানাতে থাকেন। এই সূত্রেই লেখকের সঙ্গে বাপ্পা বোসের সাক্ষাৎকার ঘটে। লেখকের লাভপুরের বাড়িতে একদা এক বায়ুপ্রবাহহীন গুমোট বিনিদ্র রজনীতে বাপ্পা বোস তার জীবনকাহিনী শুনিয়েছে। বাপ্পার জীবনে রহস্য রোমান্স নাটক ও উত্তেজনা—সবই আছে। গরীবের ঘরের ছেলে জীবনে সংগ্রাম করতে করতে কীভাবে খ্যাতির সোপান বেয়ে বেয়ে কীর্তির উচ্চশিখরে আরোহণ করেছে সেই কাহিনীই এই উপন্যাসের উপকরণ। উপন্যাসের প্রকাশশৈলী, বক্তব্য এবং চরিত্রচিত্রণের বিচারে 'অভিনেত্রী'কে মনে হয় 'মঞ্জরী অপেরা'র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। পরিসরের স্বল্পতার জন্য সম্ভবত চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ বিস্তৃতভাবে করা সম্ভব হয়নি এবং সেই কারণেই বাপ্পা বোসের সঙ্গে বিনীর সম্পর্কের মধ্যে অতিনাটকীয়তা এবং অবাস্তবতা লক্ষ্য করা যায়। পক্ষান্তরে, গোরাবাবুর সঙ্গে মঞ্জরীর সম্পর্ক-বিশ্লেষণ লেখকের সূক্ষ্মদর্শিতার

পরিচায়ক, কাহিনীর অতি-স্বাভাবিক ঘটনাপ্রবাহরূপে তাদের জীবন পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। 'অভিনেত্রী'র শেষাংশে নায়ক-নায়িকার মিলনান্তক পরিণতি কিন্তু ঘটনার অনিবার্য পরিণাম নয়, লেখকের স্বেচ্ছাকৃত নাট্যরসপরিবেশনের প্রয়াস মাত্র।

'গণদেবতা'য় যে কালের দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে তা প্রথম মহাযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের গ্রামগুলির রূপান্তরমুখী অবস্থার পরিচায়ক, 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'য় এই সংঘাত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন পটভূমিতে রূপায়িত হলেও সেখানে বনওয়ারী বা করালীর আদিম ও অসংস্কৃত পরিবেশ সেই সংঘাতকে একটা সার্বজনীন আস্বাদ এনে দিতে পারেনি। কিন্তু 'আরোগ্যনিকেতন'-এ প্রাচীনকালের অবলুপ্তি ও নতুন কালের অভ্যুদয়কে লেখক অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও ব্যাপকতর পটভূমিতে দেখাতে গিয়ে সেকাল ও একাল, আয়ুর্বেদ চিকিৎসা-পদ্ধতি এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা প্রণালী, প্রাচীন সংস্কার ও আধুনিক মননশীলতা এবং মৃত্যুর প্রতি অসহায় আত্মসমর্পণ ও জীবনের প্রতি উদগ্র আকূতি—এই রকম বহুবিচিত্র সংঘাতসঙ্কুল জিজ্ঞাসাকে এই উপন্যাসে পাশাপাশি উপস্থাপিত করেছেন। তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবনের প্রথমাবধি আমরা লক্ষ্য করে আসছি, তিনি নতুনকে বরণ করেন বটে কিন্তু স্বাগত জানাতে চান না, মৃত্যু বা ধ্বংসের মাধ্যমে পুরোনোকে ত্যাগ করলেও সেখানে যেন তার করুণ বিষণ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস শোনা যায়।

নতুন কালের প্রতি লেখকের বিরূপতা তাঁর ঐতিহ্য-সচেতনতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, তৎসহ আছে বাংলার লোকসংস্কৃতির ক্রমবিলীয়মানতায় তাঁর বিষণ্ণতা, কৃষিপ্রধান সমাজ-ব্যবস্থার দ্রুত শিল্পায়নে রূপান্তরের ফলে গ্রামীণ মানুষের উৎকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার প্রতি সংসক্তি, বিজ্ঞানের নিত্যনতুন পদক্ষেপে মানবিক মূল্যবোধগুলির পুনর্বিচারে অনাসক্তি। তাই, 'গণদেবতা'য় মহাগ্রামে নতুন কালের

আবির্ভাবকে রাজনীতি-অর্থনীতিসচেতন, প্রগতিশীল তরুণ যতীনকে দিয়ে লেখক প্রসন্নহৃদয়ে গ্রহণ করাতে চাননি। মহাগ্রামের 'নূতন কালের সে রচনার মধ্যে যে রূপ ফুটিয়া উঠিবে—সে যতীন বইয়ের মধ্যে পড়িয়াছে—তার জন্মস্থান কলিকাতায় প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে। সে মনে হইলে শিহরিয়া উঠিতে হয়, মনে হয় গোটা পৃথিবীর আলো নিভিয়া যাইবে, বায়ুপ্রবাহ স্তব্ধ হইবে, গোটা সৃষ্টিটা দুর্বৃত্ত-ধর্ষিতা নারীর মত অন্তঃসার-শূন্য কাঙ্গালিনীতে পরিণত হইবে। জীর্ণ অন্তর, বুকে হাহাকার, বাহিরে চাকচিক্য, মুখে কৃত্রিম হাসি। দুর্ভাগিনী সৃষ্টি। আঙ্কিক নিয়মে তার পরিণতি ক্ষয়-রোগীর মত তিলে তিলে মৃত্যু।' কালের প্রতি এই মনোভাব সত্ত্বেও আশাবাদী লেখক আধুনিক রূপান্তরের স্বপক্ষে স্পষ্টভাবে কয়েকটি কথা বলেছেন, 'তবু কিন্তু সে হতাশ নয় আজ। মানুষ সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে অঙ্কশাস্ত্রের অতিরিক্ত রহস্য। পৃথিবীর সমুদ্র তটের বালুরাশির মধ্যে একটি বালুকণার মত ব্রহ্মাণ্ড—ব্যাপ্তির অভ্যন্তরে এই পৃথিবী, তাহার জীবন-রহস্য—সে রহস্য ব্রহ্মাণ্ডের গ্রহ উপগ্রহের রহস্যের ব্যতিক্রম, এককণা জীবন প্রকৃতির প্রতিকূলতা, মৃত্যুর অমোঘশক্তি সমস্তকে অতিক্রম করিয়া শত ধারায়, লক্ষ ধারায়, কোটি কোটি ধারায় কালে কালে উচ্ছ্বসিত হইয়া মহাপ্রবাহে বহিয়া চলিয়াছে। সে সকল বাধাকেই অতিক্রম করিবে। আনন্দময়ী প্রাণবতী সৃষ্টি—অফুরন্ত তাহার শক্তি সে তাহার জীবন বিকাশের সকল প্রতিকূল শক্তিকে ধ্বংস করিবে। তাহাতে তাহার সংশয় নাই আজ। ভারতের জীবনপ্রবাহ বাধা-বিঘ্ন ঠেলিয়া আবার ছুটিবে।' বিবর্তনের পথে বিশ্ব-প্রকৃতি এবং জীবনপ্রবাহ কখনো স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে না, অতীতের সমাধির উপর বর্তমানের প্রতিষ্ঠা হবেই। এই ধরনের অনিবার্যতা ছাড়া যতীন তথা লেখকের মানসপটে আধুনিকতার কোনো আশাব্যঞ্জক উজ্জ্বল-দীপ্ত রূপ ফুটে ওঠেনি। 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'তেও লক্ষ্য করেছি বাঁশবাঁদির কাহারেরা চন্নপুরের নতুন কালের আবহাওয়ায়

চলে গেলে বনওয়ারীর সঙ্গে তারাশঙ্করও যেন হতাশ হয়ে পড়েছেন।
'আরোগ্যনিকেতন'-এ কালান্তরের দ্বন্দ্ব ও বেদনাকে আরো গভীর ও ব্যাপকভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য লেখক নতুন কালের আবির্ভাবে সমাজে যে বহিরঙ্গিক পরিবর্তন ঘটেছে সেগুলিকে অধিকতর বাস্তব-সম্মত করে চিত্রিত করেছেন। মহানগরী থেকে শতাধিক মাইল দূরে অবস্থিত দেবীপুরে অপেক্ষাকৃত উন্নত যানবাহনের সুযোগ, নতুন ওষুধের দোকান ও তৎসহ আধুনিক চিকিৎসকের পোষাকে সজ্জিত ডাক্তার, নতুনকালের ঝকঝকে ইমারত ও হাসপাতাল, হাসপাতালে আধুনিক যন্ত্রপাতি-সরঞ্জাম সহ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চিকিৎসার সুযোগ, পেনিসিলিন-এক্সরে-সার্জারির প্রয়োগে রোগীর দ্রুত নিরাময় ব্যবস্থা, আস্তিক্যবাদ ও অদৃষ্টবাদ সম্পর্কে নির্মোহ মনোবৃত্তি, রোগনির্ণয়ের ক্ষেত্রে কার্য-কারণ-রহস্য জানার জন্য নিত্য-নতুন উপকরণের আবিষ্কার, কমিউনিটি প্রজেক্ট প্রকল্প অনুযায়ী নতুন আমলের দেশ গঠন, মহামারী প্রতিষেধক টিকার ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রসঙ্গের উত্থাপনে তারাশঙ্কর বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিবাদী আধুনিক কালের আবির্ভাব-সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে পশ্চিম বাংলার মফঃস্বল শহরগুলির উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে বিচিত্রমুখী ভাঙা-গড়া চলছে, দেবীপুরে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বাস্তবতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। তাছাড়া, নতুন হাসপাতালগুলিতে কলকাতায় পড়া, যুক্তিবাদী আধুনিক তরুণ চিকিৎসকের আবির্ভাবের ফলে স্থানীয় পুরোনো আমলের চিকিৎসকদের সঙ্গে বিবাদ প্রায় অনিবার্য বলেই মনে হয়। এই বিবাদকে ঘনীভূত রূপ দেবেন বলেই তারাশঙ্কর সম্ভবত জীবনমশায়কে নিছক হাতুড়ে কবিরাজ হিশেবে চিত্রিত করেন নি অথবা প্রদ্যোত বোস তরুণ হলেও এরই মধ্যে চিকিৎসা-বিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করেছে। জীবন মশায়ের প্রায়-অনিবার্য নিদান হাঁকা (মতির মা ব্যতীত যে ঘোষণা সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের

জীবনে অবধারিত প্রতিপন্ন হয়েছে) এবং মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রদ্যোতের যুদ্ধ ঘোষণার ফলে দুটি চরিত্রই পাঠকের সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করে। কিন্তু জীবন মশায়ের স্নিগ্ধ ব্যবহার, স্নেহশীল বয়োজ্যেষ্ঠের মতো আচরণ, প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি বিনয়-নম্র ক্ষমাশীলতা, দুঃখ শোকের আঘাতেও দৃঢ় নির্লিপ্ততার পাশে প্রদ্যোতের 'তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী'তে হাসি, মদগর্বিত উদ্ধত কথাবার্তা, অবিনয়ী চালচলন এবং প্রবীণের প্রতি অসম্ভ্রমসূচক ব্যবহার তারাশঙ্করের বিশিষ্ট মানসিকতার ফলেই এ রকম বিপরীতমুখী হয়ে উঠেছে এবং কোন্‌টা ভালো বা কোন্‌টা মন্দ, সে বিষয়ে স্থূলবুদ্ধি পাঠকও অবিলম্বে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারে। অবশ্য রতনবাবুর ছেলে বিপিন বা মতির মা অথবা স্বয়ং প্রদ্যোতের স্ত্রী মঞ্জুর অসুখের ক্ষেত্রে জীবন মশায় এবং প্রদ্যোত পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে ;—প্রদ্যোতের শক্তি ও সাহসের সঙ্গে বিনয় ও নম্রতা একীভূত হয়ে তাকে যেন আরো উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন করে গড়ে তোলা হয়েছে কিন্তু জীবন মশায়ের প্রতি লেখকের শ্রদ্ধা যতোখানি স্পষ্টগোচর, প্রদ্যোতের প্রতি ততোখানি নয়। এর মূল কারণ দুই কালের সংঘাতে পুরোনোর প্রতি লেখকের আবহমান পক্ষপাতিত্ব, নতুবা তিনি জীবন মশায়কে একালের যুবক, অথচ, গ্রাম্য কবিরাজ হিশেবে চিত্রিত করতে পারতেন কারণ গ্রামাঞ্চলে এখনো কবিরাজী ও হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার যথেষ্ট প্রচলন রয়েছে।

লেখকের বর্ণনায় জানা যায়, জীবন মশায়ের প্রায় সত্তর বছর বয়স। 'স্থবির, ধূলিধূসর দিক-হস্তীর মতো বৃদ্ধ।' শশী কম্পাউণ্ডারের চোখেও তিনি 'মত্ত হস্তী। মত্ত হস্তীই বটে। কোনো কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই।' এমন কি, এককালে তিনি পায়ে হেঁটে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে বেড়াতেন, রোগীদের নিয়মিত তদারক করতেন, তখনও নাকি 'লোকে বলত—হাতি চলেছে। হাতিই বটে।' বারে বারে তার সঙ্গে হাতির উপমার কারণ কি? মনে হয়, লেখক যেন জীবন মশায়ের সুখে বিগতস্পৃহ ও দুঃখে অনুদ্বিগ্ন মনের ছবি ফোটাতে

চেয়েছেন, দেখাতে চেয়েছেন ভাবনা-ভ্রূক্ষেপহীন এক বিশালহৃদয় মানুষকে। তাছাড়া, ক্রমবিলীয়মান অতীতের প্রতীক হিসেবেও উপমাটি সার্থক।

জীবন ও জন্মান্তর সম্পর্কে বিশ্বাস এ যুগে পরিবর্তিত হওয়ায় জীবন মশায় বেদনাহত। তিনি রোগীর নাড়ী ধরে মৃত্যুর আবির্ভাবকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। মৃত্যু তার কাছে অমোঘ নিয়তির মতো—কখনো সে আসে নৃত্যচঞ্চলা কিশোরীর মতো, কখনো স্নেহশীলা সর্বসন্তাপহরা জননীর মতো, কখনো তার আবির্ভাব ঘটে করাল দংষ্ট্রাবদনী মৃত্যুরূপা মহাকালীর বেশে। তিনি কিন্তু শোকবিহ্বল পরিবারটির মধ্যে বসে থাকতে পারেন অচঞ্চল হয়ে 'গুমোটে ভরা বায়ুপ্রবাহহীন গ্রীষ্ম অপরাহ্ণের স্থির বনস্পতির মতো।' তিনি সত্যসন্ধ, তাই মৃত্যুর কথা রোগীর প্রিয়জনদের কাছে তাঁকে বলতে হয়। সেটা তাঁর বিধি বা কর্তব্য, নিজের একমাত্র পুত্রের নিদান হাঁকার ক্ষেত্রেও তার কোনো ব্যতিক্রম ঘটাননি তিনি। তিনি সরল ও অকপট চিত্তের বিনয়ী মানুষ, নিজেই স্বীকার করেন 'সার্জারিতে বিদ্যেবুদ্ধি নাই'; আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রতি তাঁর বৈরিতা নেই, বরং এর প্রয়োগকুশলতায় তিনি খুশি তবে এর বিজ্ঞানসর্বস্ব যুক্তিবাদকে তিনি ঠিক পছন্দ করেন না। তাছাড়া, চিকিৎসকের সঙ্গে রোগীর হৃদয়গত একটা যোগাযোগ গড়ে ওঠায় তিনি প্রীত হন, অতএব আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থার হৃদয়হীনতা তাঁকে ব্যথিত করে। সে জন্যই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, মকবুলের মতো রোগীরা তাঁর কাছে প্রত্যাখ্যাত হলেও তাঁকে ছাড়বে না কারণ, 'নূতনকে এরা ভয় করে, তাকে গ্রহণ করার মতো সামর্থ্য তাদের নাই; মনেও নাই, আর্থিক সঙ্গতিতেও নাই।' শুধু রোগীদের মনের কথাই নয়, তাদের পারিবারিক অবস্থা ও আর্থিক সঙ্গতি তাঁর কাছে অজানা নয়। তিনি সেখানকার 'মাটি মানুষ গাছপালাকে নিবিড়ভাবে চেনেন। তাদের দুঃখ তিনি জানেন।' প্রদ্যোতের মতো রোগীদের সঙ্গে তাঁর

যান্ত্রিক সম্পর্ক নয়, তিনি তাদের হিতৈষী, পরামর্শদাতা ও অভিভাবক। তাই, জীবনে প্রচণ্ডতম শোকের আঘাত সহ্য করেও আবার তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন, স্ত্রীর নিষ্করুণ ব্যবহার সত্ত্বেও পরহিতব্রতে শৈথিল্য প্রকাশ করেননি আবার প্রয়োজনমতো চিকিৎসা-জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে চেয়েছেন। ক্ষোভ হতাশা ও আত্মগ্লানির ফলে এক সময়ে তিনি জনৈক রোগীর কাছে বলেছেন, 'আমি মোটামুটি চিকিৎসা করাই ছেড়ে দিয়েছি। নতুন কাল, নতুন চিকিৎসা, নতুন রুচি এতো আমার কাছে নাই।' তিনি একথা অবশ্য তাঁর অগণিত অনুরাগী রোগীদের অনুরোধে রাখতে পারেননি, সামান্য সম্বলকে পুঁজি করেও তাঁকে চিকিৎসা করতে হয়েছে। কিন্তু প্রদ্যোতের প্রতি তাঁর মনে কখনো প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাব গড়ে ওঠেনি, কখনো কখনো আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা তাঁর প্রায়-অভ্রান্ত নিদানগণনাকে ব্যর্থ প্রমাণিত করতে পারেনি। তবু জীবন মশায় বিনয়ী ও সচেতন, তাই তাঁর মনে দৃঢ় সংকল্প জাগে, 'কীর্তিমান যোদ্ধা প্রদ্যোত ডাক্তার। এ যুগের আবিষ্কার বিচিত্র বিস্ময়কর। আর না। তার কাল গত হয়েছে। আর না।'

জীবন মশায়ের মানবিকতা, নীতিবোধ, সরলতা, ঐতিহ্যপ্রীতি, আস্তিক্যচেতনা, সম্ভ্রমবোধ, বিনয়নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার চিত্রণে লেখক পুরোনো কালের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম প্রীতি প্রকাশ করেছেন। 'সেকালে অর্থাৎ যখন আরোগ্য-নিকেতন প্রথম স্থাপিত হয়েছিল তখন ধারা ছিল অন্যরকম। দেশের অবস্থাও আর-এক রকম। গোলায় ধান ছিল, গোয়ালে গাই ছিল, ভাঁড়ারে গুড় ছিল, পুকুরে মাছ ছিল। লোকে এক হাতে পেটপুরে খেত দুহাতে প্রাণপণে খাটত। দেহে ছিল শক্তি, মনে ছিল আনন্দ। সে মানুষেরাই ছিল আলাদা। একালের মতো জামা জুতো পরত না. হাঁটু পর্যন্ত কাপড় পরে অনাবৃত প্রশস্ত বক্ষ দুলিয়ে চলে যেত। ধবধবে কাপড় জামা চকচকে জুতোপরা আপনাকে দেখলে হেঁট হয়ে নমস্কার করে

বলত কোথা থেকে আসা হচ্ছে বাবু মহাশয়ের? কোথায় যাওয়া হবে প্রভু?' এখানে স্বল্প এই রেখাচিত্রে লেখক পুরোনো কালের লোকের চরিত্রের ঔদার্য ও নম্রতার ছবি এঁকেছেন, অমরকুঁড়ির পরাণ খাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, 'পুরানো কালের লোক পরাণ, এখনও ভালোবাসার মূল্য দেয়।' প্রবীণ পরাণের প্রতি লেখকের শ্রদ্ধার কারণ, সে যুগের পরিবর্তন অনুযায়ী মানবিক মূল্যবোধগুলিকে অস্বীকার করতে শেখেনি। অথচ, এই পরাণের সম্বন্ধেই আমরা লেখকের জবানিতে জানতে পারি, 'নতুন কালের চিকিৎসায় বিশ্বাস থাক বা না থাক নতুন কালের অল্পবয়সী ডাক্তারদের উপর বিশ্বাস তার নাই,' কারণ তার 'তৃতীয়পক্ষের বিবি যুবতী, মেয়েটি শ্রীমতীও বটে; এর উপর পরাণের আছে সন্দেহবাতিক'। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, পুরোনো আমলের লোক বলে পরাণ লেখকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে, তার অন্তর্নিহিত কোন বিশেষ গুণের জন্য নয়। তাছাড়া, পরাণ যে অকৃতজ্ঞ ও স্বার্থপর, কাহিনীর শেষাংশে জীবন মশায়ের প্রতি তার নিষ্ঠুর ব্যবহারই তার প্রমাণ।

সেতাব জীবন মশায়ের কাছে ক্ষুব্ধকণ্ঠে অভিযোগ করেছে, একালে কারো ঈশ্বরে মতি নেই, তরুণ জীবন দত্তকে মঞ্জরীর প্রণাম করার ভঙ্গিমায় লেখক একালকে কটাক্ষ করে বলেছেন, 'সে আমলে গড় করে প্রনাম করত। এ আমলের মত হেঁট হয়ে পা ছুঁয়ে মাথায় ঠেকানো প্রণাম নয়।' যোগ সাধনার দ্বারা দেহের জীর্ণতা মানুষের মানসিক শক্তির বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে না, একথা একালের লোকেরা বিশ্বাস করে না, কিন্তু জীবন মশায়ের মতো প্রবীণেরা তা স্বীকার করেন; হারমোনিয়ম গ্রামোফোনের যুগ পেরিয়ে রেডিওর যুগে আধুনিক মানুষেরা পদার্পণ করেছে বলে 'বড় তালের গানের চর্চা উঠে গেল'; একালের প্রতিনিধি প্রদ্যোত ডাক্তারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও জীবন মশায় তার পরমত-অসহিষ্ণুতায় ক্ষুব্ধ হন; কালধর্মে সেখানকার বৈষ্ণবমন্ত্র উপাসক কায়স্থ সমাজের ছেলেরা

মদ্যপানে আসক্ত হলে তিনি বেদনাবোধ করেন, একালের চিকিৎসকেরা হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করার মতো উদার সাহসী প্রসন্ন মানুষকে দেখতে না পেলেও জীবন মশায় 'দেখেছেন বই কি এমন রোগী। কদাচিৎ নয় একটি দুটি নয়। অনেক অনেক দেখেছেন তিনি। নিতান্ত সাধারণ মানুষের মধ্যেই দেখেছেন।' 'এমন অনেক মানুষকে দেখেছেন। এই যাওয়াই তো যাওয়া। মৃত্যুর সমাদরের অতিথি। একালে তেমন অতিথি বোধ করি মৃত্যু পায় না।'

উপরি-বর্ণিত ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করলে লেখকের অতীত-প্রীতি ও বর্তমানের প্রতি আগ্রহহীনতা সহজেই বোঝা যায়! তাই, লেখকের মানসপ্রতিভূ জীবন মশায় শশীকে বলেছেন 'সে আমলটা বড় সুখেই গিয়েছে, কী বলিস শশী?

'—ওঃ তার আর কথা আছে গো। সে একেবারে সত্যযুগ।' শশীর চিন্তায় সেই সত্যযুগের বর্ণনা নিয়েছেন লেখক—

'সেকালের জলটলমল দীঘি, ধানভরা খেত খামার, শান্ত পরিচ্ছন্ন ছায়াঘন গ্রামগুলি, লম্বা চওড়া দশাসই মানুষ, মুখে মিষ্ট কথা, গোয়ালে গাই, পুকুরে মাছ, উঠানে মরাইয়ে ধান, ভাঁড়ারে জালায় জালায় চাল, কলাই মুগ মুসুর ছোলা অড়হর মাসকলাই, মণ মণ গুড়—সে কাল—সে দেশ দেখতে দেখতে যেন পালটে গেল। ম্যালেরিয়া ছিল না তা নয়। ছিল। পুরোনো জ্বর দু-চারজনের হত। শিউলিপাতার রস আর তাঁদের বাড়ির বড়িতে পাঁচনে তারা সেরে উঠত।'

জীবন মশায় তথা তারাশঙ্করের অতীত-প্রীতির মূল কারণঃ অতীত কালের কথার একটা নেশা আছে। বড় মনোরম বর্ণবিন্যাস। চোখ পড়লে আর ফেরানো যায় না।'

একজন প্রখ্যাত আধুনিক লেখকের পক্ষে এই অতীতপ্রিয়তা কি সঙ্গত? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা চলে তারাশঙ্করের সাহিত্যের ব্যাপ্তি ও গভীরতার ক্ষেত্রে অর্থাৎ তাঁর সাহিত্যের উপজীব্যসংক্রান্ত

পরিধি-বিস্তার এবং চরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ব্যাপারে আধুনিক কালের সাহিত্যের ধারাকে প্রভাবিত করেছেন, একথা নিঃসন্দেহ। চরিত্রসৃষ্টি ও পটভূমি নির্বাচনে তিনি বিশ শতকের বিশ্বসাহিত্যের গতি-প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম কিন্তু আধুনিক যুগের সংগ্রামী মানুষকে তিনি সাহিত্যে রূপায়িত করেননি। যে কৃষক ভারত স্বাধীন হওয়ার বিশ বছর পরেও ভূমিহীন এবং জোতদার-মহাজন কর্তৃক শোষিত, যে শ্রমিক শিল্পে মন্দার অজুহাতে প্রতি মুহূর্তে ছাঁটাইয়ের ভয়ে সন্ত্রস্ত, যে শিক্ষক বিদ্যালয়-পরিচালনা-সমিতির অধিকাংশ ক্ষমতাশালী কিন্তু মূর্খ ব্যক্তির খামখেয়ালীপনায় অতিশয় বিব্রত, যে মধ্যবিত্ত কর্মচারী প্রতিমুহূর্তে সরকারী অথবা বেসরকারী শিল্পপতিদের মেজাজ-মর্জিতে পরিচালিত, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা আবেগ ও যন্ত্রণাকে তিনি ভাষা দিতে আগ্রহবোধ করেননি। একালের সমাজ-মন এত জটিল যে তার মূলসূত্র খুঁজতে গেলে বিচরণ করতে হবে প্রায় সর্বত্র—সংগ্রামী মানুষের যন্ত্রণাকে বুঝতে গেলে রাজনীতির অসাধুতা, অর্থনীতির গলদ, সমাজনীতির বৈষম্য ইত্যাদি যাবতীয় প্রায়-দুরারোগ্য ক্ষতগুলির বেদনাকে স্বীকার করতে হবে। কিন্তু তারাশঙ্কর একালের সমাজ-রূপায়ণে আগ্রহী হননি, স্বাধীনতার পর অজস্র গল্প-উপন্যাস রচনা করলেও সমকালীন সমাজের রাজনীতি-অর্থনীতিগত অন্তর্নিহিত ঘাত-প্রতিঘাতের বর্ণনায় উৎসাহী হননি, বরং তিনি মানুষের চিরকালীন মূল্যবোধের শ্রেষ্ঠতার অনুসন্ধানে আধুনিক যুগের প্রেক্ষাপটকে ব্যবহার করেছেন। কোন্ সামাজিক চাপে একালের মানুষ নৈরাজ্যবাদী, নীতিভ্রষ্ট, অবিবেকী ও স্বার্থপর হয়ে উঠেছে তার সন্ধানে তিনি সচেষ্ট হননি কিন্তু পুরোনো দিনের মানুষের আস্তিক্যচেতনা, নীতিবোধ, উদারতা ও সার্বিক আত্মীয়তার প্রশংসায় তিনি মুখর হয়েছেন। তাঁর অতি আধুনিক গ্রন্থগুলি 'মণি বৌদি' 'দীপার প্রেম' 'নারী রহস্যময়ী' 'মিছিল' 'অভিনেত্রী' 'রূপসী বিহঙ্গিনী' প্রভৃতিতে গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে যে বিরাট রাজনৈতিক

দু'শ নয়

পটপরিবর্তন ঘটল এবং সে সম্পর্কে সাধারণ মানুষের দান ও দায়িত্ব কতোখানি, তারা কিভাবে এই পরিবর্তনকে গ্রহণ করেছে, এই পরিবর্তনের ফলে গত বিশ বছরের সামাজিক কাঠামোর কোনো পরিবর্তন আদৌ সূচিত হল কিনা, সে সম্পর্কে তিনি অস্বাভাবিক নীরবতায় নিজেকে আবৃত করে রেখেছেন। তাছাড়া, বিজ্ঞানের নিত্যনতুন উদ্‌ভাবনায়, জীবিকা এবং আনুষঙ্গিক প্রয়োজনের তাগিদে যৌথ পরিবারের বিলীয়মানতায় এবং নাগরিক জীবনের নানাবিধ সঙ্কট ও সংঘাতে যেভাবে নগর-মন (সমাজবিজ্ঞানী বিনয় ঘোষ যাকে বলেছেন মেট্রোপলিটান মন) তৈরী হচ্ছে একাদিক্রমে সাতাশ বছর শহরে বাস করেও তারাশঙ্কর তা বুঝতে চাননি। পরিবর্তে, তিনি মেদিনীপুর ('জঙ্গলগড়'), সাঁওতাল পরগণা ('অরণ্যবহ্নি') দিল্লী ও আগ্রা ('গন্নাবেগম' ও 'যতিভঙ্গ') এবং বর্ধমান ('নিশিপদ্ম') প্রভৃতি অঞ্চলে পদচারণায় আগ্রহী, সেখানকার ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমিতে অধিকতর আকৃষ্ট। তাঁর 'মহানগরী' সাম্প্রতিক মহানগরীর প্রতিচ্ছবি নয়, লেখকের যৌবনকালের কলকাতা, তবু সেখানেও তিরিশের দশকের শিল্পে মন্দাজনিত অর্থনৈতিক জীবনের অবক্ষয়ের কথা নেই, রাজনৈতিক অস্থিরতার ছবি নেই এবং নগর-জীবনের বিচ্ছিন্নতাবোধের কোন প্রমাণ নেই।

আমি পূর্বেই আলোচনা করেছি সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে তারাশঙ্কর কখনো গভীরভাবে বিচলিত হননি; ঐ সমস্যার কথা তাঁর কোনো ধ্রুপদী রচনার বিষয়বস্তু নয়, বাংলাসাহিত্যে অপাংক্তেয় সমাজের মুখ্যতম রূপকার হয়েও তিনি সংখ্যালঘু সমাজের দিকে দৃকপাত করেননি, 'গন্নাবেগম' বা 'শঙ্করবাঈ' ঐতিহাসিক উপন্যাসের চরিত্র, তাদের সঙ্গে সমকালীন সমাজ-মানসের কোন যোগসূত্র খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক। তবে, তারাশঙ্কর সাম্প্রদায়িকতাকে ঘৃণা করতেন এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনে স্বার্থান্বেষী ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা সমাজদেহে মাঝে মাঝে এই বিষ প্রয়োগ করে থাকে এবং এ ব্যাপারে তথাকথিত

জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলো নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনের অজুহাতে এই পদ্ধতির সমর্থক হয়ে ওঠে, অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে তিনি তা' লক্ষ্য করেছেন। 'ফরিয়াদ' উপন্যাসের সূচনায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ছবি আছে। সেখানে লেখক ব্যঙ্গ করে বলেছেন, 'শাক দিয়ে মাছ যেমন ঢাকা যায় না—মাছের চেহারা দেখা না গেলেও যেমন গন্ধে ধরা পড়ে তেমনিভাবেই একথা আজ প্রমাণিত যে পশ্চিমবঙ্গে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি জাতীয়তাবাদের যে ফোড়ং দিয়ে সংবাদব্যঞ্জন পরিবেশন করেন তা থেকে হিন্দুত্বের তেলকাঁটার গন্ধ ওঠে। একটু চেষ্টা করলেই কাঁটা বেরিয়ে পড়ে। 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী'র পূজোকে নামে সার্বজনীন করে তুললেও মিথ্যা এবং সাম্প্রদায়িকতার গোঁড়ামি থেকে মুক্তি এ জাত পায়নি। ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম বলে ভজন গাইলেও অন্তিম সময়ে গান্ধীজী হায় রাম বলেই বিলাপ করেছিলেন।'

যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং রাজনৈতিক আন্দোলন ১৯৪২-৪৩ খ্রীস্টাব্দের বাংলাদেশের সমাজ-জীবনকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে ফেলেছিল। অর্থ নৈতিক দুর্দশা মানুষের মূল্যবোধকে এমনভাবে হ্রাস করে দিয়েছিল যে পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী বা মা ও সন্তানের মধ্যে যে চিরকালীন একটা মধুর সম্পর্ক আছে সেখানেও অপ্রতিরোধ্য ফাটল দেখা দিয়েছিল। 'ফরিয়াদ' উপন্যাসে এমন একটি ছেলের করুণ এবং শোচনীয় পতন-কাহিনী লেখক আমাদের শুনিয়েছেন। তার গর্ভধারিণী রত্নমালা ওরফে চাঁপাকে বরেন মল্লিকের কাছে দু'হাজার টাকায় বিক্রয় করেছিল চাঁপার বাবা শিবেন ভট্টাচার্য। বিয়ের পর চাঁপা হিংস্রকুটিল, নারীমাংসলোলুপ বরেনের কাছ থেকে মুক্তির জন্য স্বামীকে অনেক অনুনয় করা সত্ত্বেও তার স্বামী বরেনের কাছে একই কৌশলে পরাভূত হল। অসহায়া চাঁপা বছরের পর বছর বরেনের লালসার ইন্ধন যোগাতে বাধ্য হয়েছে যতদিন তার পুত্র বরেনকে হত্যা করে রক্তের ঋণ না শোধ করেছে।

নীলু যেভাবে কুটিল, হিংস্র মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে তা সমকালীন সামাজিক অবক্ষয়ের শোচনীয় দৃষ্টান্ত। যে সামাজিক অবস্থা একটা পরিবারকে তিলে তিলে শোচনীয়তম পরিস্থিতিতে টেনে নিয়ে গেছে, 'ফরিয়াদ' উপন্যাসে লেখক যদি সেই সামাজিক অবস্থাকেই প্রধানত বিশ্লেষণ করতেন, তাহলে এই উপন্যাসটি সমকালীন সমাজের উল্লেখ্য দলিল হয়ে থাকত। কিন্তু সমাজব্যবস্থার শিকার হয়েও এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি সমরেশ বসুর 'প্রজাপতি' বা বিমল করের 'যদুবংশ' উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের মতো সমকালীন অবক্ষয়িত সমাজ-জীবনের প্রতিফলন হয়ে উঠতে পারেনি। তার প্রধানতম কারণ লেখকের দ্বিধাবিজড়িত মনোভাব। তরুণ সম্প্রদায় কর্তৃক খুন-জখম, বেলেল্লাপনা ও আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনের যে ক্রমবর্ধমান মনোভাব গত চার-পাঁচ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক আবহাওয়াকে কলুষিত করে রেখেছে, উনিশশো ষাট সালে তা এতটা প্রকট ছিল না। তারাশঙ্কর লিখেছেন: 'মস্তান। আশ্চর্য! আরবী ভাষা পারসী ভাষা তুর্কী ভাষা যারা এনেছিল এদেশে, এদেশের ভাষার সঙ্গে মিশিয়ে উর্দু ভাষা যারা তৈরী করেছিল তারা বাংলাদেশে বক্তিয়ার খিলজীর নবদ্বীপ অধিকার থেকে পলাশীর যুদ্ধ উধুয়ানালা বক্সারের যুদ্ধ পর্যন্ত কম দিন রাজত্ব করেনি—তারা এই পাঁচ ছ'শো বছরে দিয়েছে অনেক কিন্তু এই মস্তান শব্দটি এবং মস্তানী রূপটি তাদের রাজত্বকালে বাংলাদেশে চালু হয়নি—হঠাৎ এতকাল পরে শব্দটি এবং শব্দের বাস্তবরূপটি আরব্য উপন্যাসের কোন বোতলের ছিপি ফাটিয়ে তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। ১৯৬০ সাল এখন—এখন বারো তের থেকে চব্বিশ পঁচিশ বছর পর্যন্ত সব মানুষই যেন মস্তান হয়ে গেছে।

একজন পনের ষোল বছরের ছেলে যখন কোন বাড়ির মধ্যে ঢুকে অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে বলে—মাসীমা সতু কোথায়? একবার ডেকে দেবেন! তখন মাসীমা বিবর্ণ হয়ে যান। মাসীমা সতুর মা।

তিনি জানেন রামুর হাতে ছুরি আছে। এবং সে-ছুরি সতুর বুকে বা পেটে বসিয়ে যখন দেবে তখন একবারও হাত কাঁপবে না।
১৯৬০ সাল পর্যন্ত, রামমোহন থেকে সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত, মহা আবির্ভাবের সব পুণ্য ফুৎকারে উড়ে গেছে। কোন্ মহাশূন্যে ধূলো হয়ে উড়ে হারিয়ে গেছে।' 'ফরিয়াদ' উপন্যাসে যে কালের ছবি লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন, উল্লিখিত সমাজচিত্র কিন্তু সে কালের প্রতিবিম্ব নয়, পরন্তু তা এক দশক পরবর্তী কালের প্রতিচ্ছবি। এই কালানৌচিত্য দোষ কি স্বেচ্ছাকৃত ?
তারাশঙ্কর যথেষ্ট মাত্রায় আধুনিক নন, এই অভিযোগ মাঝে মাঝে লেখকের মনে একটা অভিমানের সৃষ্টি করত বলে মনে হয়। এই অভিমানই তাঁকে মাঝে মাঝে আধুনিকধর্মী রচনায় প্রবৃত্ত করে : 'সপ্তপদী' (পৌষ ১৩৬৪), 'যতিভঙ্গ' (বৈশাখ ১৩৬৯) এবং 'একটি চড়ুই পাখী ও কালো মেয়ে' (আশ্বিন ১৩৬৯) যার স্বাক্ষর। প্রথম গ্রন্থ দু'টির বিষয়বস্তু নিয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে শেষোক্ত গ্রন্থটির অনুসরণে এখানে তারাশঙ্করের আধুনিক চেতনাকে বিশ্লেষণ করা যাক। জনৈক শিল্পীর চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে ক্ষুদ্রায়তন এই উপন্যাসটিতে। তার মধ্যে তারাশঙ্কর সার্থকভাবে বিধৃত করেছেন এ-যুগের অপরিণামদর্শী বেপরোয়া তারুণ্যকে—যে তারুণ্য তাৎক্ষণিকের প্রতি সংবেদনশীল অথচ যার আস্থা নেই কোন শ্রেয়সের প্রতি। সুরা এবং নারীর প্রতি জান্তব কামনার মধ্যে যে তারুণ্য এই মুহূর্তের মুক্তি খোঁজে এবং সে মুক্তি না পেয়ে মুক্তির ধারণাকেই অলীক কল্পনা বলে উড়িয়ে দেয়, সেই অ্যাংরি ইয়ংম্যানকে তারাশঙ্কর দেখতে পেয়েছেন কমার্শিয়াল আর্টিস্ট আনন্দের চরিত্রে। আর দেখতে পেয়ে শিল্পীর সমবেদনা নিয়ে তারাশঙ্কর তাকিয়েছেন সেই চরিত্রের আরও অন্তস্তলে, আবিষ্কার করেছেন তার মুক্তির চাবিকাঠি। সে মুক্তির মন্ত্র রয়েছে সংবেদনশীলতায়। এ যুগের পথভ্রান্ত তারুণ্যকে তারই চরিত্রের অন্তর্নিহিত বীজমন্ত্র দেখিয়ে দিয়েছেন তারাশঙ্কর। একটি

চড়ুই পাখির প্রতীক সৃষ্টি করে, তার প্রতি অনুকম্পা, রিরংসা এবং পুনশ্চ তারই প্রতি জিঘাংসা জাগিয়েছেন শিল্পী আনন্দের অপরিণামদর্শী তাৎক্ষণিকের পূজারী অন্তরে। আর সেই চড়ুইয়ের রক্তে স্নান করিয়ে পথভ্রান্ত তারুণ্যকে মুক্তির ইঙ্গিত শুনিয়েছেন—যে মুক্তির নাম প্রেম, তারাশঙ্করের বহুল-নির্দেশিত সার্থকতার পথ।

তারাশঙ্করের তথাকথিত আধুনিক বিষয়বস্তু সংক্রান্ত রচনাগুলি পর্যালোচনা করলে মনে হয় লেখক বলতে চান—আধুনিকতা আঙ্গিক মাত্র, সাহিত্যের প্রাণপ্রেরণা প্রাচীন বা অর্বাচীন কোনো আঙ্গিকে নয়, সে প্রেরণা এমন কোনো বৃহত্তর ধ্যানে ও ধারণায় যার মূল সর্বকালে প্রসারিত, যার শাখাবিস্তার সংবেদনশীল মানুষের অন্তরে।

৯

কালান্তরের রূপমহিমা ও লেখকের আগ্রহ

ভারতবর্ষের, বিশেষত বাংলাদেশের, সমাজ-জীবনের স্থূলভাবে কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য আছে—জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সহাবস্থান, সহজ সরল অনাড়ম্বর মানুষদের ধর্মপ্রাণতা, একান্নবর্তী পরিবারে সুশৃঙ্খলায় বসবাস, কৃষিপ্রধান সমাজ-ব্যবস্থার ফলে দেশের মানুষের শহর, যন্ত্রশিল্প ও বিজ্ঞানের প্রতি বিমুখতা।

তারাশঙ্করের অধিকাংশ গল্প উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের মধ্যে মোটামুটি এই ধরনের কিছু কিছু মনোভাবের পরিচয় মেলে। তবে পূর্বাপেক্ষা জাতিভেদ বা ধর্মভেদের প্রখরতা এখন হ্রাস পেয়ে অন্য একটি তারতম্যের মধ্যে অবলুপ্ত হয়েছে, সেটি হল ব্যবসায়ীদের মধ্যে মূলধনগত, জমিদারদের মধ্যে সম্পত্তিগত এবং চাকুরে শ্রমজীবীদের মধ্যে পদমর্যাদাগত বৈষম্য অনুযায়ী নতুন সামাজিক শ্রেণীর উৎপত্তি। তবে এই ধরনের তারতম্যের প্রতি তারাশঙ্কর বরাবরই বিরূপ ছিলেন।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে মানুষের চিরন্তন সমস্যার কথা-প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের শিল্পকর্মের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা অনেকক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি ইদানীন্তনের ভিত্তিতে তিনি কখনো কখনো চিরন্তনের প্রাসাদ তৈরী করেছেন। সমকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে পরিপার্শ্বের পরিধির মধ্যে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন এবং পরিবারের নিষ্ঠাশীল অভিভাবক হিসেবে তাঁর দায়দায়িত্ব সামাজিক মানুষ রূপে তাঁকে যেন অনেকখানি মনোযোগী করে তুলেছিল।

নিঃসম্বল মানুষকে তাঁর সাহায্যদানের প্রবণতার কথা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি উল্লেখ করেছি। প্রয়োজনীয়-সংখ্যক ভিখারি না এলে তিনি রাস্তা থেকে ভিক্ষুক-সংগ্রহে বেরিয়ে পড়তেন। ভারতবর্ষের যে কোনো প্রান্তের প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা আকস্মিক দুর্ঘটনা তাঁকে অপরিসীম ব্যথিত করে তুলত। এমন কি, তাঁর পরিচিত কোনো নির্দোষ তরুণকে হয়তো পুলিশ অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে বা কোনো অসহায় কর্মপ্রার্থী হয়তো কাজের সন্ধানে তাঁর শরণাপন্ন হয়েছে—তিনি যতক্ষণ না অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারতেন, ততক্ষণ একটা প্রবল অস্বস্তি তাঁকে ঘিরে থাকত।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি হিসেবে তাঁর অসামান্য ভূমিকার কথা অনেকের জানা আছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ভারতবর্ষের একটি অগ্রণী ও বৃহত্তম সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। তারাশঙ্কর দাবি করেছিলেন, পরিষদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের কাছে উপযুক্ত বার্ষিক অর্থ সাহায্য আদায় করতে হবে। তিনি জানিয়েছিলেন, কেরালা ও মহারাষ্ট্র সাহিত্য পরিষৎ এবং হিন্দী সাহিত্য পরিষৎ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রভূত অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকেন। রাজ্য সরকারের সাহায্যও তাঁদের কম নয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্য তাই তিনি স্বয়ং কেন্দ্রীয় সাহায্যের জন্য দিল্লী যেতে রাজী হয়েছিলেন—এমন কি, রাজ্য সরকারের দপ্তরে গিয়ে আবেদন-নিবেদন করতে তাঁর নিজেরই আগ্রহ ছিল। আর্থিক

অনটনের ফলে ওখানকার কর্মীরা প্রচণ্ড অসুবিধায় পড়লে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—যতদিন সরকারী সাহায্য বৃদ্ধি না হয়, ততদিন তিনি নিজেই ওখানকার বারজন কর্মীর মাসিক দশটাকা হারে বেতন-বৃদ্ধির ব্যয় বহন করবেন।

উক্ত প্রতিষ্ঠান ছাড়া, পশ্চিমবঙ্গে সর্বভারতীয় লেখক সংস্থা পি. ই. এন-এর যে শাখা আছে তিনি তার সভাপতি ছিলেন। ওয়েষ্ট বেঙ্গল রাইটার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি গঠিত হলে সেখানেও সকলের অনুরোধে তিনি চেয়ারম্যানের পদে বৃত হন। শুধু সাহিত্য প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তাই নয়, তিনি হিন্দ্ কুষ্ঠ নিবারণ সঙ্ঘের দপ্তরেও মাঝে মাঝে যেতেন এবং কুষ্ঠ রোগীদের পুনর্বাসন-সমস্যার গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য সাহিত্যিকদের এগিয়ে আসা উচিত বলে তিনি মনে করতেন।

তাঁর বহু গল্প-উপন্যাস চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। সাহিত্যসাধনার প্রথম পর্বে যখন তিনি প্রচণ্ড আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন তখন চিত্রনাট্য-রচনা-সংক্রান্ত একটি কাজের জন্য তিনি বম্বের চলচ্চিত্রমহল থেকে অনুরুদ্ধ হয়েও সাহিত্য-সাধনায় প্রবল অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে ঐ কাজ করতে রাজি হননি এবং সাতশো টাকা মাইনের ঐ চাকরিটা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রহণ করে বম্বে চলে যান। খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করে পরবর্তীকালে তিনি ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সদস্যের আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন।

রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তারাশঙ্করের প্রাণের যোগ গভীর। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের বারই জুলাই 'কালিন্দী' নাট্য-নিকেতন মঞ্চে অভিনীত হয় এবং ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের আটই জানুয়ারি 'পথের ডাক' নাট্য-ভারতীতে অভিনীত হয়। ঐ বছরেই আটাশে মে 'দুই পুরুষ' মঞ্চস্থ হয় নাট্য-ভারতী মঞ্চে। তার পরের বছর পঁচিশে ডিসেম্বর রঙমহলে প্রদর্শিত হয় 'বিংশ শতাব্দী'। এরপর পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের ঘটনা-অবলম্বনে 'আহ্‌মদ শাহ্ আব্‌দালী' নাটক স্টারে মঞ্চস্থ হয় এবং

দু'শ সতের

'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত 'সোনার পদ্ম' নাটক 'দ্বীপান্তর' নামে কালিকা থিয়েটারে অভিনীত হয়। 'কবি' ও 'আরোগ্যনিকেতন'-এর নাট্যরূপ যথাক্রমে রঙমহল ও বিশ্বরূপা থিয়েটারে প্রদর্শিত হয়। 'রাধা'র নাট্যরূপও বিশ্বরূপা-মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। 'কবি' রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হওয়ার বহুদিন পরে গ্রামোফোন কোম্পানি সেটি রেকর্ডে তোলেন এবং সেই লং প্লেয়িং রেকর্ডটি প্রযোজনা করার দায়িত্ব ছিল বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের উপর। বেতারে মনোমোহন ঘোষ (চিত্রগুপ্ত) তারাশঙ্করকে দিয়ে তাঁরই গল্পের বহু নাট্যরূপ করিয়ে একসময় পরিবেশন করতে শুরু করেন এবং তারপর থেকেই ছায়াচিত্রে ও রঙ্গমঞ্চে তাঁর জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। নাট্যভারতীতে শিশির মল্লিক প্রযোজিত তাঁর 'দুইপুরুষ' নাটকটিও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। প্রথম বয়সে তাঁর যে শুধু নাটক-রচনার দিকে ঝোঁক ছিল তাই নয়, অভিনয়েও তাঁর অপরিসীম আগ্রহ ছিল এমন কি, স্ত্রী-ভূমিকাতেও তিনি অভিনয় করতেন। পরবর্তীকালে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটকটি বেতারে প্রচারিত হওয়ার সময় সজনীকান্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ, শৈলজানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে তারাশঙ্করও অভিনয় করেছিলেন। তিনি সেজেছিলেন কেদার। আর একবার সজনীকান্ত দাসের উৎসাহে ও আগ্রহে কলকাতা বেতার কেন্দ্রে রবীন্দ্রনাথের 'শেষ-রক্ষা' অভিনীত হয় এবং তারাশঙ্কর তাতে অভিনয় করেন। এ ছাড়া, রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে রঙমহল মঞ্চে অনুষ্ঠিত নাটকে তিনি একটি ভৃত্যের ভূমিকায় অভিনয় করেন। খালি গায়ে কাঁধের উপর গামছা ঝুলিয়ে সেদিন তারাশঙ্কর এমন অসামান্য অভিনয় করেছিলেন যা প্রথম শ্রেণীর অভিনেতাকেও রীতিমতো হার মানায়।

প্রয়াণের মাস দেড়েক আগে তিনি স্টার থিয়েটারে এলে দেবনারায়ণ গুপ্ত 'গণদেবতা'র নাট্যরূপ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন এবং

তিনি সানন্দে সম্মতিদানও করেছিলেন। নাটক আর নাট্যশালাকেই তিনি ভালবাসতেন না, নটনটীদের সঙ্গেও তাঁর প্রীতির সম্পর্ক ছিল। অভিনয় দেখতে এলে অভিনয় দেখেই শুধু ক্ষান্ত হতেন না, সাজঘরে গিয়ে শিল্পীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করার সৌজন্যতা থেকে তাঁকে বিচ্যুত হতে কেউ দেখেনি কখনো। আকস্মিক দুর্ঘটনায় ছবি বিশ্বাসের মৃত্যু হলে ফুলের মালা নিয়ে তিনি স্টার-থিয়েটারে ছুটে এসেছিলেন এবং দেবনারায়ণ গুপ্তকে অশ্রুবিজড়িত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'আমার নুটবিহারীকে মালা পরাবো বলে তোর এখানে চলে এলাম।'

দেশের প্রতিটি বিষয়ে তাঁর ছিল সজাগ দৃষ্টি ও ঐকান্তিক আগ্রহ। ছোট বা বড়—যে কোনো ঘটনা যা দেশের কল্যাণ-অকল্যাণের সঙ্গে যুক্ত, তাকে সমর্থন বা বিরোধিতা করা ছিল তাঁর স্বভাব। মা ও মাটির প্রতি তাঁর যেমন ছিল প্রগাঢ় অনুরাগ, তেমনি শ্রদ্ধা ছিল মাতৃভাষার প্রতি। ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দের তিরিশে মার্চ তারিখে 'যুগান্তর'-এর সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় 'জাতীয় সঙ্গীতের ভাষা সরকারী ভাষা হবে না কেন ?' এই প্রশ্নে দক্ষিণারঞ্জন বসুর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং তাতে তিনি পঞ্চরাষ্ট্রভাষার একটি প্রস্তাব পেশ করেন। পরের মাসেই পরপর দু'সপ্তাহে তারাশঙ্কর ঐ পত্রিকাতেই 'একটি কল্যাণজনক প্রস্তাব' শিরোনামায় দু'টি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি দক্ষিণারঞ্জনের প্রস্তাবকে সমর্থন ও স্বাগত জানিয়ে বলেন, প্রস্তাবটি অত্যন্ত সুযুক্তিপূর্ণ। জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় পতাকা —এ পবিত্র বস্তু। জাতীয় সঙ্গীতের ভাষাকে সম্মানিত আসনের পাশে ম্লানমুখী তাম্বুলকরঙ্কবাহিনীর মতো দাঁড় করিয়ে রাখলে জাতীয় সঙ্গীতটিকেই প্রকারান্তরে অসম্মান করা হয় না কি ? তিনি সখেদে বলেন, বাঙালীর মন্দ ভাগ্য, বাঙলার মন্দ ভাগ্য যে দেশ আজ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল এবং বাঙলাভাষী গরিষ্ঠ জনসংখ্যা বিদেশী রাষ্ট্রের অধিবাসী হয়ে পর হয়ে গেল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে

ইতিহাসের এ চক্রান্ত বা বিধানকে আজ আমাদের মেনে না নিয়ে উপায় নেই। কিন্তু ইংরেজি ভাষা যে কারণে আজ অপরিত্যজ্য সে হল তার উৎকর্ষগুণ। সে গুণ বাঙলা ভাষারও আছে। তাই, তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন, আজ একচ্ছত্রের যুগ নয়, একের জন্য রাজসিংহাসন পাতা নেই। এখানে পাঁচটি ভাষা-উত্তরের হিন্দী, পূর্বাঞ্চলের বাঙ্‌লা, দক্ষিণের দু'টি এবং ইংরেজি—এই নিয়ে পঞ্চরাষ্ট্র-ভাষার প্রস্তাব খুবই যুক্তিযুক্ত তাতে সন্দেহ নেই।

এইসব সামাজিক-সংসক্তি ছাড়া রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রে তিনি গান্ধীজির অনুরক্ত-শিষ্য ছিলেন তবে বিপ্লবীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল, সে শুধু তাদের জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমের জন্য, তাদের কর্মপন্থার জন্য নয়। দেশের বা জাতির মঙ্গলের জন্যও তিনি হিংস্রতাকে সহ্য করতে পারেন না, সহিংস গণবিপ্লবের তিনি ঘোরতর বিরোধী।

তারাশঙ্কর মার্কসের 'ক্যাপিট্যাল' বা অন্য কোনো রচনা পড়েননি। বাংলা ভাষায় মার্কসবাদের উপর লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ পড়েছেন মাত্র। প্রথম পর্বের রচনায়, বিশেষত 'চৈতালী ঘূর্ণী'তে অনেকে মার্কসবাদের সন্ধান পাওয়ায় তারাশঙ্কর প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাঁর আত্মজীবনীর পাতায়। তিনি বলেছেন, হাজার হাজার বৎসর ধরে মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তের কাল একদিন আসবেই। তিনি কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে গ্রামে মানুষদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বুঝেছিলেন, সেদিন আসতে আর দেরী নেই। রুশবিপ্লবের সঙ্গে সেদিনের উষাকালের তুলনা করলেও মার্কসবাদ সম্পর্কে কৌতূহলী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি তিনি। মার্কসবাদের উপর এদেশে প্রকাশিত নানা প্রবন্ধের মধ্যে একটি সত্যের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন, যেটি ভারতীয় সত্যের সঙ্গে সর্বসমন্বিত হবার অলঙ্ঘনীয় দাবি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সে হল অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি। সেই শক্তি যে কেমনভাবে ঠেলে নিয়ে চলেছে মানুষের সমাজকে, মানুষকে, সেই সত্যকে বিভিন্ন

প্রবন্ধের মধ্যে তিনি প্রথম জেনেছিলেন—তারপর গ্রামে গ্রামে ঘুরে সেখানকার সামাজিক উত্থান পতনের ইতিহাস সংগ্রহ করে মিলিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন এই তত্ত্বকে। কিন্তু তার বাস্তববাদ-সর্বস্বতাকে মানতে পারেননি। পথ এবং লক্ষ্যের বৈষম্যকেও তিনি ভ্রান্তি ও অপরাধ বলে মনে করেছেন।

সেই সঙ্গে এটাও তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, আরও আছে—মানুষের বিশেষ করে এই দেশের মানুষের যাদের তিনি জানতে চিনতে চেষ্টা করেছেন—তিনি নিজেই যাদের একজন, তাদের আত্মার তৃষ্ণা থেকে, রুচি থেকে, তিনি বুঝতে পেরেছেন, সামাজিক সাম্যই সব নয়—এর পরও আছে পরম কাম্য যা অর্থনৈতিক সাম্য হলেই পাওয়া যায় না। অন্তরের পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, পরিশুদ্ধতার মধ্যেই আছে সেই পরম কাম্য সুখ ও শান্তি। ঈর্ষ্যা বিদ্বেষ থেকে অহিংসায় উপনীত হওয়ার মধ্যেই আছে পূর্ণ মানবত্ব, সত্যকামের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেই অবস্থার উত্তরায়ণে, পূর্ণ মানবত্ব অর্জনের ভিত্তির উপর। সমাজকে যন্ত্রের মতো ব্যবহার করে ছাঁচে-ফেলা মানুষ তৈরী করে সে অবস্থায় উপনীত হওয়া যায় না। তিনি আরো বলেছেন, তিনি বৈজ্ঞানিক নন, অভ্যাসে অভ্যাসে প্রকৃতির পরিবর্তন হলেও মানুষের হয় না কারণ মানুষ গিনিপিগ নয়—সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে প্রকৃতিতে সে প্রচণ্ডতম শক্তিশালী। মানুষকে এ্যাটম বোমার সাহায্যে মেরে ফেলা যায়, তাকে ভীত করে সাময়িকভাবে হার মানানোও যায় কিন্তু সত্য কথা জয় করা যায় না। হিরোসিমা, নাগাসাকির মানুষদের প্রকৃতি কি পরাজয় মেনে নিয়েছে? তারা কি কখনো ভুলতে পারবে এ কথা? আমেরিকা যেদিন এ্যাটম বোমার আঘাত হেনেছিল তাদের উপর সেদিন যারাই ছিল তাদের দলে—রাশিয়া ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি—সবার উপরেই তাদের বিরাগ মহাভারতের অপমানিতা অম্বার মতোই তপস্যামগ্ন হয়ে রয়েছে। বিড়ম্বিত জীবনের দুর্ভোগ ও পীড়ন থেকে মুক্তিই শুধু তার কাম্য নয়—

সে জন্মান্তরেও এর প্রতিহিংসা চাইবে। যে আজ যতো দান নিয়ে আসুক, যতো সাহায্যই করুক, তবু সে ভুলবে না। যাতে ভুলানো যায়, যাতে হিংসা-জর্জর প্রকৃতিকে প্রসন্ন করা যায় সে হলো প্রেম, সে হলো অহিংসার সাধনা। প্রাণহীন বিকৃত ধর্মগত মন্ত্র জপের অহিংসা নয়। অহিংসার সাধনা তারাশঙ্কর স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি গান্ধীজিকে দেখেছেন।

তাছাড়া, তিনি রাশিয়া ও চীন পরিভ্রমণ করে সেখানকার সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হয়ে এসেছেন। মার্কসবাদ অবলম্বন করে তারা বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও শিল্পোৎপাদনে যতোই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিক না কেন, তাঁর মতে মানুষের নিজস্বতা, মৌলিক চিন্তা ও বাক্‌স্বাধীনতার কোন স্থান সেখানে নেই। ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ভারতবর্ষ ও চীনের সঙ্গে সংঘর্ষের পর তারাশঙ্কর সাপ্তাহিক সাহিত্যপত্র 'দেশ'-এ ধারাবাহিকভাবে 'ভারতবর্ষ ও চীন' শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন এবং ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁর জন্মদিনে এম. সি, সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড থেকে সেটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় তিনি বলেছেন, 'চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের পটভূমিকায় রচনাটির আবির্ভাব। ভারতের সঙ্গে চীনের বহু ঘোষিত বহু শতাব্দীর বন্ধুত্ব যখন চীনের অতর্কিত ভারত-আক্রমণে বিধ্বস্ত সেই মুহূর্তে রচনার জন্ম।'[১] প্রবন্ধটি রচনা করতে গিয়ে তিনি প্রচুর পড়াশোনা করেছিলেন, তবে একথা অনস্বীকার্য ভারতবর্ষ ও চীনের কথা বলতে গিয়ে তিনি সর্বক্ষণ গান্ধীজি ও মার্কসকে স্মরণে রেখেছেন এবং এই উভয় মনীষীর প্রতি তাঁর অনুরাগ ও অনীহার কথা আমরা জানি। নবীন চীনের জীবন-সত্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি সোজাসুজি বলেছেন, 'সে তো শুধু সমাজতন্ত্রবাদী নয়—সে তার সঙ্গে সমরতন্ত্রবাদী। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সামরিক শক্তির প্রয়োগ তার অপরিহার্য। তার প্রতীক গাঢ় রক্তবর্ণ, মাটি রক্তাক্ত না হলে তার উপর তার তন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় হয় না। এই তার কাছে সুমহত্তম

ন্যায় ও নীতি। এমন কি পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথেও তার ন্যায়ে যুদ্ধের প্রয়োজন। শান্তির সঙ্গীত আক্রোশের রাগিণীতে সে গেয়ে থাকে। যন্ত্রের ঝনৎকার তার সঙ্গে বাদ্যসঙ্গীত রচনা করে।'[২]

নবীন ভারতের কথা বলতে গিয়ে তারাশঙ্কর মানবতন্ত্রের সন্ধান পেয়েছেন। পৌরাণিক উপমা সহযোগে তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় বলেছেন, 'এই কালের যে মহাপ্রকাশ যাকে দেখে মনে হয় এ ভারতবর্ষ অতীতের ভারতবর্ষ ও তার সেই আদর্শের বিরোধী বা তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, তাকে বলব এই ভারতের ধর্ম ও আত্মার প্রতীক সন্ধান করে দেখতে। আমাদের পুরাণে আছে স্রষ্টা চতুর্মুখ। চারটি মুখ আমার চোখের সামনেও ভেসে ওঠে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ভারতের বাণীমুখ, মহাত্মা গান্ধী ভারতের ধ্যান মুখ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতের শৌর্যমুখ, প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল ভারতের কর্মমুখ। চারটি মুখের ললাটই ত্যাগের তিলকচিহ্নে উজ্জ্বল। প্রত্যেকের কাছেই সত্যের দ্বারা মিথ্যা পরাভূত, হিংসা মিথ্যা, প্রেম সত্য। মৃত্যু পরাভূত, অমৃত করায়ত্ত। প্রতিষ্ঠা রাজাসনে নয়, মানুষের মনোসিংহাসনে। সর্বশেষ সত্য প্রেম অমৃত কর্ম সমস্ত কিছুর একমাত্র আধার মানবধর্ম। এই ধর্মকে আশ্রয় করে ১৯৪৭ সালে যে নবীন ভারতবর্ষের অভ্যুদয় হয়েছে তার পতাকার প্রতীক ধর্মচক্র, তার আদর্শ বিশ্বমৈত্রী তার নীতি অহিংসা এবং তার শীল পঞ্চশীল।'[৩]

এই দুটি উদ্ধৃতি পাশাপাশি রাখলে দেখা যাবে, মার্কসবাদের মধ্যে তিনি অপ্রেম, বৈরিতা হিংস্র হানাহানির সন্ধান পেয়েছেন—মানবতার কোনো পরিচয় সেখানে খুঁজে পাননি। এই প্রত্যয়ে তিনি অটল রয়েছেন 'গণদেবতা'র কাল থেকেই। তাঁর রচিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্র দেবু ঘোষ গান্ধীবাদী, প্রেম অহিংস ও মৈত্রীর আদর্শে সে নতুন সমাজ গঠনের আগ্রহে চঞ্চল, অথচ তার বন্ধু,

মহাগ্রামের ন্যায়রত্নের পৌত্র, মার্কসবাদী বিশ্বনাথের কাছে সামাজিক অবস্থার সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্ক কি সে সম্পর্কে আলোচনা করতে চায়নি। মার্কসের রচনাও দেবুর কাছে অস্পৃশ্য। লেখকের অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে রচিত আত্মজৈবনিক উপন্যাস 'কালান্তর'-এ (১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে) তিনি পুনরায় দুই মতবাদের দ্বন্দ্বকে উপস্থাপিত করেছেন: একজন উগ্র বিপ্লববাদী নাস্তিক কপিলদেব, অন্যজন গোঁড়া প্রাচীনপন্থী ঈশ্বর-বিশ্বাসী সন্তোষ মুখোপাধ্যায়। এই তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব উপন্যাসের পক্ষে অপরিহার্য ছিল না, মনে হয়, পঞ্চাশের দশকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটভূমিকায় মার্কসবাদের ক্রম-প্রসারণশীল জনপ্রিয়তায় লেখক উৎকণ্ঠিত ছিলেন। সেজন্য চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে তিনি কপিলদেবকে মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী একটি ঋজু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যুবক হিসেবে না দেখিয়ে চরিত্রটির প্রতি অবিচার করেছেন। পক্ষান্তরে, সন্তোষ মুখোপাধ্যায়ের জীবন সম্পর্কিত উপলব্ধি দৃঢ়তর ও গভীরতর। তিনি বিশ্বাস করেন চেতনা থেকে চৈতন্যে, অসৎ থেকে সৎ-এ, হিংসা থেকে অহিংসায় প্রতীতি প্রেমে আনন্দে ও শেষ পর্যন্ত সচ্চিদানন্দে ক্রমশ অগ্রসরশীল প্রাণযাত্রার অবশ্যম্ভাবী পরম পরিণতি। বলাবাহুল্য, এ বিশ্বাস লেখকেরও এবং সেজন্যই দেবু ঘোষের মতো সন্তোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও লেখকের আত্মার আত্মীয়তা। শরৎচন্দ্র কিন্তু এ ব্যাপারে একেবারেই নীরব। তাঁর বিপুল রচনাবলীতে কোথাও মার্কসের নামোল্লেখ পর্যন্ত নেই, অথচ তিনি সমাজতত্ত্ব নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করেছিলেন, অবশ্য এর প্রধানতম কারণ মার্কস সম্পর্কে এদেশে তখনো অনুসন্ধিৎসা দেখা দেয়নি—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ভারতবর্ষে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত আন্দোলনে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকা, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে সরকারী যোগসূত্র এবং ঐ দেশগুলির সঙ্গে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল বিনিময়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, সর্বোপরি যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে রাশিয়া ও চীনের বিপুল

প্রতিষ্ঠা' মার্কসবাদ সম্পর্কে আমাদের মনে সচেতনতা এনে দিয়েছে যা রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের আমলে ছিল না।

তারাশঙ্কর চিরকাল যেন একটি বিশেষ তপস্যার ধারাকে অনুসরণ করেছেন। সেটা প্রধানত ছিল পরশাসন থেকে মুক্তি, অথবা স্বাধীনতা লাভ। স্বাধীনতা-উত্তরপর্বে গত দুই দশকে তিনি প্রচুর লিখেছেন, কিন্তু সেই রচনাগুলিতে তিনি সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে যতখানি সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন, তদপেক্ষা আত্মগত বিশ্লেষণ সেগুলিতে প্রাধান্য পেয়েছে। 'আরোগ্যনিকেতন'-এ শশীর চোখে সাম্প্রতিককালের মানুষের মনে সার্বিক চৌর্যবৃত্তির সন্ধান বা প্রদ্যোতের দৃষ্টিতে আধুনিক ঔষধ-ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে কটাক্ষ অথবা 'যোগভ্রষ্ট'-এর নায়ক সুদর্শনের জবানিতে বর্তমান রাজনৈতিক দলবাদের দন্তুর স্বরূপ প্রভৃতি বিক্ষিপ্ত কয়েকটি মন্তব্য ছাড়া স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি তাঁর বিরূপতার কোনো লক্ষণ নেই। আত্মজৈবনিক উপন্যাসগুলি, 'মন্বন্তর', এমনকি, 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'র সমাজ-ব্যবস্থার জন্য তাঁর ক্ষোভ অল্পবিস্তর ব্যক্ত হলেও সেগুলির উপজীব্য প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের বাংলাদেশ। অথচ গত দুই দশকে বাংলাদেশে প্রচণ্ড সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তন ঘটেছে, দেশের অভ্যন্তরে নানামুখী আন্দোলন ও বাইরে থেকে চীন ও পাকিস্থানের সঙ্গে ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়েছে। দেশের মধ্যে বারে বারে দেখা দিয়েছে হতাশা ও বিশৃঙ্খলা, আন্দোলন ও মৃত্যু, বিক্ষোভ ও সংশয়। তবু, একমাত্র 'উনিশ শ একাত্তর'-এর অন্তর্ভুক্ত দুটি বড় গল্প 'একটি কালো মেয়ের গল্প' এবং 'সুতপার তপস্যা' ছাড়া সাম্প্রতিক রাজনীতি-অর্থনীতি সংক্রান্ত বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি কোনো গল্প বা উপন্যাস সৃষ্টি করেন নি। জীবনের প্রান্তসীমায় পৌঁছে এই একবার মাত্র একালের শ্রেষ্ঠ লেখক তাঁর সমকালের ভারতীয় উপমহাদেশের ঊর্মিল-উত্তাল পারিপার্শ্বের সঙ্গে যেন পরিচিত হতে চেয়েছিলেন। 'একটি কালো মেয়ের গল্প' পূর্বপাকিস্তানের

ওপর জঙ্গীশাহী বর্বরতার কলঙ্কজনক অধ্যায়ের প্রতিবেদন। 'মন্বন্তর' রচনার সময় তিনি যেমন দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত বাংলাদেশের রাজধানী কলকাতার ক্ষুধা-খিন্ন মানুষের শোচনীয় চিত্র আঁকতে গিয়ে প্রায় প্রতিবেদকের মত তন্নিষ্ঠ ছিলেন, এই গল্পেও একটি মেয়ের জীবনকে কেন্দ্র করে তিনি ইয়াহিয়ার নরমেধ-যজ্ঞের এমন অবিকল প্রতিলিপি অঙ্কন করেছেন যা শেখ মুজিবর রহমানের বক্তব্য দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। পূর্ববাংলা (অধুনা বাংলাদেশ) পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ—শেখ মুজিবের এই ধারণাকে তারাশঙ্কর রূপায়িত করেছেন তার এই বড় গল্পটিতে, যার মধ্যে গল্পরসের হানি ঘটলেও তথ্যগত সমৃদ্ধির কোনো অভাব নেই।

সু'তপার তপস্যা' কিন্তু ঐ উনিশ শ' একাত্তরেই এপার বাংলায় যা ঘটেছিল, যে হিংসাত্মক আবহাওয়া সমস্ত পশ্চিম বাংলা জুড়ে সৃষ্টি করেছিল একটা নৈরাজ্যবাদের বাতাবরণ, তার কাহিনী। একই কালে রচিত এবং একই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হলেও দু'টি গল্পই বিপরীতমুখী—'একটি কালো মেয়ের গল্প' সমকালীন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত বিশ্বাস, দেশপ্রেম, মানবিকতা ও শৌর্যের জয়গান, পরন্তু 'সুতপার তপস্যা' এপার বাংলার মানুষদের অবিশ্বাস, অপ্রেম, মতান্ধতা এবং জিঘাংসার গল্প। সুতপা এবং তার স্বামী সুব্রত মুখোপাধ্যায় দুই পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী। ব্যারিস্টার বি. বি. দাশগুপ্তের মেয়ে সুতপা মার্ক্সবাদে বিশ্বাস করে কিন্তু সুব্রত যেন অনেকটা 'গণদেবতা'র দেবু ঘোষ। প্রেম বিবাহ প্রভৃতি তাদের উভয়কে একই বন্ধনে বাঁধতে পারেনি। যুক্তফ্রণ্টের আমলে শরিকী সংঘর্ষে সুব্রত কলিয়ারী অঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক হিসেবে নিহত হলে সুতপা যেন সুব্রতর প্রতি তার মনোভাব পালটায়, সম্ভবত তার পাপবোধে আঘাত লাগে, সে তখন গ্রাম-সংগঠনে আত্মনিয়োগ করার জন্য স্বভূমে ফিরে এসেছে। সুব্রতকে কিন্তু লেখক এক স্বতন্ত্র মানুষরূপে ফিরিয়ে এনেছেন, সে তখন

ভোগবিলাসে নিরাসক্ত নয়, ঐতিহ্য ও ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যহীন, অসৎ পথে বিরাট অর্থের মালিক, যদিও 'ব্লাডবাথের মধ্য দিয়ে নতুন পৃথিবী' গঠনের স্বপ্ন দেখে। প্রয়াণের কিছুদিন পূর্বে লেখা এই গল্পে লেখকের অবজেক্টিভ দৃষ্টির ওপর আস্তিক্যচেতনার আস্তরণ পড়েছিল তাই সুতপা বা সুব্রতর জীবনের এই রূপান্তর তাদের চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশ অনুযায়ী ঘটেনি। উপন্যাসের শেষ দৃশ্যে দেখা যায়, সুতপা রাতের অন্ধকারে শালগ্রামশিলা এবং তার শিশু পুত্রকে বুকে নিয়ে ঘর ছেড়ে পথে নেমেছে নতুন প্রভাতের সন্ধানে। তাঁর ধ্রুপদী গল্প-উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর যে বস্তুতান্ত্রিক রসদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, শেষপর্বের রচনাগুলিতে তা দুর্লভ এবং সেজন্য একথা বললে অন্যায় হবে না তারাশঙ্কর এই পর্বে তাঁর লক্ষ লক্ষ অনুরাগী পাঠক-পাঠিকার কাছ থেকে খানিকটা দূরে সরে গেছেন, শ্রমিক-কৃষক মধ্যবিত্তের হতাশা ও সংশয়ের সামনে তিনি সঠিক পথনির্দেশ করতে এগিয়ে আসেননি। অথচ এই দায়িত্ব বহন করার যোগ্যতা ও সামর্থ্য একালে আমাদের সাহিত্যে তাঁর সর্বাপেক্ষা বেশি ছিল। দৈনিক 'যুগান্তরে' প্রকাশিত 'গ্রামের চিঠি' শীর্ষক আলোচনা-মালায় গ্রামের গন্ধ নেই, রঙ্‌লাল যেন গ্রাম্যতা হারিয়ে একটি গ্রামীণ অথচ ভদ্রমানুষ হয়ে বসে আছে, সাপ্তাহিক 'অমৃতে'র বিচিত্র চরিত্রগুলি তাঁর বহু-সৃষ্ট চরিত্রগুলির চর্বিতচর্বন মাত্র এবং ঐ চরিত্রগুলি যখন তিনি সৃষ্টি করছিলেন, তখন সমগ্র পশ্চিমবাংলা এক প্রচণ্ড রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে ক্রমাগত পাক খাচ্ছিল। আত্মজীবনীমূলক কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করা ছাড়াও ১৩৭১ সালের আষাঢ় মাস থেকে 'শনিবারের চিঠি'তে তারাশঙ্করের 'আমার কথা' শীর্ষক আর একটি রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। তাঁর এই পর্যায়ের সমস্ত রচনাগুলি পাঠ করলে জানা যায় তিনি নির্ভীক স্পষ্টবক্তা, নিজের দুর্বলতার কথা অকপটে স্বীকার করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না। 'আমার কথা'য় প্রকাশিত

এই নবতম রচনাটি থেকে তাঁর কিছু উক্তি উদ্ধৃত করলে জানা যাবে তাঁর সাম্প্রতিক মানসিক বিবর্তনের সূত্র :

১. 'সেদিন অর্থাৎ ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ সনের পরই মন, এবং বলতে গেলে আমার জীবনেরই যেন সব প্রেরণা, সবকিছু পাওয়ার একটি তৃপ্তির মধ্যে সূর্যোদয়ে প্রদীপশিখার মত আপনা থেকেই নিভে গিয়েছিল কর্তব্য শেষ হয়েছে বলে।'

২. 'দেশের স্বাধীনতা। দেশ স্বাধীন হবে। স্বাধীন ভারতবর্ষকে দেখব। সত্য বলতে এ দেখে যাব, দেখতে পাব, এমন আশা তো করতে পারিনি। এর জন্য যুদ্ধ করতে করতেই চোখ বুজব এই ধারণাই ছিল। এবং সাহিত্যের ধ্যান এই কামনাকেই আশ্রয় করে আমার ভাগ্যগুণে সরস্বতীর আরতি-প্রদীপ হয়ে উঠেছিল। তাই স্বাধীনতা আসবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল কর্ম আমার শেষ। এই তো সব পাওয়া হয়ে গেল।'

৩. 'আমার যেন মনে হয়েছিল, আমার কাজ ফুরিয়েছে। জীবনে বেদনার ভাণ্ডার নিশেষিত হয়েছে। যারা হাসির কথা বলে, তাদের কথা আলাদা। আসল যে আনন্দ প্রকৃতির মধ্যে সনাতন ধারায় ক্ষণে ক্ষণে বিকশিত হচ্ছে, তা নিয়ে যারা লেখে তারা আলাদা। আমি শেষ।'

৪. 'আমার সাহিত্যজীবনে যে একটির তপস্যার ধারা ছিল, দেশের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তার ধারায় ছেদ পড়ল। রইল যেটা, সেটা নিত্যকর্মপদ্ধতি মতে আচার-আচরণ পালনের মত কিছু।'

এই পর্বে তাই তারাশঙ্কর যেন অপরিসীম অতৃপ্ত, প্রচুর লিখছিলেন অথচ কোন কিছুতেই যেন আবিষ্ট হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না (বিরল ব্যতিক্রম-'আরোগ্য নিকেতন' ও 'মঞ্জরী অপেরা')। পুরোনো গেজেটগুলো পড়াশোনা করে রচনা করেছেন 'জঙ্গলগড়' ও 'অরণ্যবহ্নি', আচার্য যত্নুনাথ সরকারের 'Downfall of the Moghul Empire' পড়ে রচনা করলেন 'গন্নাবেগম' ও 'ছায়াপথ,'

সমাজবিজ্ঞানী বিনয় ঘোষের বইগুলো পড়ে উপাদান পেলেন 'কীর্তি-হাটের কড়চা'র তবু তাঁর বিষয়ে থেকে বিষয়ান্তরে নিত্য পরিক্রমায় প্রচণ্ড আসক্তি কেন? সে প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'শনিবারের চিঠি'র তারাশঙ্কর-সংখ্যায় 'আত্মদীপ তারাশঙ্কর' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে: 'শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর ছায়াছত্র সন্ধান করলেন, হয়তো কিছু আশ্রয় পেয়েও থাকবেন, কিন্তু তারাশঙ্করের সমগ্র শিল্পিসত্তা বার বার বলতে লাগল: তবু রাজনীতি চিরদিনই রাজনীতি। অর্থনৈতিক অথবা রাজনৈতিক দুর্গতি হয়তো সে খানিকটা দূর করতে পারে। হয়তো অনেকখানিই পারে, কিন্তু সেইখানেই কি মানুষের সব দুঃখের অবসান? এইভাবেই কি সব বেদনার নিরসন?

অতএব 'আগে কহ আর'।

তখন মনে হল এর শেষ কোথাও নেই।

দেখা গেল পেছনে ফেলে আসা মানুষগুলোকে আবার নতুন করে মনে পড়ছে। তর্ক-তত্ত্বের জালে, রাজনীতির ভাবনায়, নাগরিকতার অভ্যাসে, তারাশঙ্কর যে সর্বব্যাপী দুঃখের বস্তুতান্ত্রিক সমাধান খুঁজে-ছিলেন তা তাঁর কাছে ক্রমশ অবান্তর হয়ে আসছে। 'বিচারকে'র জ্ঞানেন্দ্র, 'সপ্তপদী'র কৃষ্ণেন্দু, 'যোগভ্রষ্টে'র নায়ক সেই বিরাট দুঃখের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যা অনন্তকাল ধরে জীবনবহ্নি হয়ে জ্বলছে, নিত্যযুগ ধরে মানুষকে যাতে আহুতি অর্পণ করতে হবে, যে ঊর্ধ্বশিখার দহন আমাদের নিয়তি আর যে দহনে আমাদের শাশ্বত শুদ্ধি।' আত্মদহনে দীপিত তারাশঙ্কর যেন এ যুগে এক নতুন তপস্যার আসনে বসেছিলেন।

পরিশিষ্ট ১

১. জীবন

১. 'আমার কালের কথা', ২য় সং, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৪। তারাশঙ্করের পিতার নাম শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতার নাম শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী। প্রথম সন্তানের অকালমৃত্যুর পর দীর্ঘদিন কোনো সন্তান না হওয়ার জন্য তাঁর পিতা ৺তারাপূজার পত্তন করেছিলেন সুপুত্র কামনা করে। তার এক বৎসর কয়েক মাস পরে ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ৮ই শ্রাবণ, ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে জুলাই, শনিবার লাভপুরে তাঁর জন্ম হয়। ছেলেবেলায় তাঁর ডাকনাম ছিল হবু।

২. 'কৈশোর স্মৃতি', ১ম সং, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ [illegible]।

৩. 'আমার কালের কথা', ২য় সং, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৯১।

৪. 'কৈশোর স্মৃতি', ১ম সং, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৬৯-৭০। 'শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার', ১ম সং, অজিতকুমার ঘোষ পৃঃ ৪৬৬।

৬. 'কৈশোর স্মৃতি', ১ম সং, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২২।

৭. 'কৈশোর স্মৃতি', ১ম সং, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৯০।

৮. 'আমার কালের কথা', ২য় সং, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২২২।

৯. 'কৈশোর স্মৃতি', ১ম সং, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৪।

১০. 'কৈশোর স্মৃতি', ১ম সং, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৯০।

১১. 'কৈশোর স্মৃতি', ১ম সং, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২৭।

১২. 'কৈশোর স্মৃতি', ১ম সং, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৭১।

১৩. 'কৈশোর স্মৃতি', ১ম সং, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৭০।

১৪. 'কৈশোর স্মৃতি', ১ম সং, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৭৬।

১৫. 'আমার কালের কথা', ২য় সং, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৯০।

১৬. 'আমার কালের কথা', ২য় সং, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২৬।

১৭. 'কৈশোর স্মৃতি', ১ম সং, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২৬।

১৮. 'কৈশোর স্মৃতি', ১ম সং, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৯৪। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে মাত্র সতের বছর বয়সে শ্রীমতী উমাদেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

১৯ 'কৈশোর স্মৃতি', ১ম সং, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ০৮।

২০. 'কৈশোর স্মৃতি', ১ম সং, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২০২।

২১. 'আমার সাহিত্যজীবন', ১ম খণ্ড, ২য় সং, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৫৯।

২২. 'আমার সাহিত্যজীবন', ১ম খণ্ড, ২য় সং, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৬৬। মাত্র আট বছর বয়সে, ১৩১৩ সালের আশ্বিন মাসে নবমী পূজার দিনে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে এবং ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে যথাক্রমে তাঁর পিসীমা ও মায়ের মৃত্যু হলেও ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দে তাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতা শান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু তাঁর জীবনে প্রচণ্ড আঘাত নিয়ে আসে। এই সময় দীর্ঘদিন তিনি বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কাটাতে থাকেন। শোকের এই তীব্রতা প্রচণ্ডতম হয়ে তাঁকে আঘাত দিয়েছিল প্রথম জীবনে, বুলুর মৃত্যুর পর।

২৩. 'আমার সাহিত্যজীবন', ২য় খণ্ড, ১ম সং. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৮৯।

৩. তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবন

১. 'আমার সাহিত্যজীবন', ১ম খণ্ড, ২য় সং, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৫। বাংলাসাহিত্যে কাব্যরচনার ক্ষেত্রে ভাগীরথীর পশ্চিমতট থেকে আরম্ভ করে ফতে সিং পরগণা (পশ্চিম মুর্শিদাবাদ), বর্ধমান ও বীরভূমের যে অঞ্চল বিস্তৃত হয়েছে পূর্ব বিহারের প্রান্ত পর্যন্ত সেই রাঢ়ের যথেষ্ট অবদান আছে। এই অঞ্চলেই অশ্ব ঘোষ, ধোয়ী, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, দাশরথী রায়, জ্ঞান দাস, লোচন দাস প্রভৃতি সুখ্যাত কবিগণ জন্মলাভ করেছিলেন। এখানেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন। এই এলাকাতেই কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়,

তারাশঙ্কর, শৈলজানন্দ, নজরুল, সজনীকান্ত প্রভৃতি প্রতিভাশালী কবি ও লেখকেরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

২. 'আমার সাহিত্যজীবন', ১ম খণ্ড, ২য় সং, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৫।

৩. 'আমার সাহিত্যজীবন', ১ম খণ্ড, ২য় সং, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৪৮।

৪. 'আমার সাহিত্যজীবন', ১ম খণ্ড, ২য় সং, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৪৮।

৫. 'আমার সাহিত্যজীবন', ১ম খণ্ড, ২য় সং, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৫৩। শ্রীমতী রাণী চন্দর 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' থেকে জানা যায় 'জলসাঘর' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত : 'আমার খুব ভাল লাগে তারাশঙ্করের ছোট গল্প। তার ভিতরে আছে একটা স্মৃতি—যার সঙ্গে পূর্বেকার ওই যেমন জমিদারের ঘরে যা ঘটে থাকে শাসন, পালন, শোষণ দেখিয়েছে ; খুব সত্য করে তুলেছে তার লেখা'।

৬. 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', ৪র্থ সং, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৫৩৫। লেখক-কর্তৃক নামাঙ্কিত 'স্বৈরিণী' অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-কর্তৃক 'রাইকমল'-এ পরিবর্তিত হয়ে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে, লেখক রবীন্দ্রনাথের অভিমত পাবার আগ্রহে 'রাইকমল'-এর একটি কপি তাঁকে পাঠান। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ২৮শে মাঘ রবীন্দ্রনাথ তারাশঙ্করকে জানান : 'কল্যাণীয়েষু, তোমার বইখানি পড়ে খুসী হয়েছি।…………'রাইকমল' গল্পটির রচনায় রস আছে এবং জোর আছে—তাছাড়া এটি ষোলো আনা গল্প, এতে ভেজাল কিছু নেই। পাত্রদের ভাষায় ও ভঙ্গীতে যে বাস্তবতার পরিচয় পাওয়া গেল সেটি গড়ে তোলা সহজ নয়।' এর কিছুদিন পরেই তারাশঙ্কর রবীন্দ্রনাথকে জানান : 'রাইকমল সম্পর্কে আপনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন কিনা জানি না। কারণ আমার সমসাময়িকেরা আমার লেখাকে বলেন স্থূল।' এই চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ২৮ ফাল্গুন ১৩৪৩ তারিখের চিঠিতে তাঁকে লিখলেন : 'তোমার স্থূল দৃষ্টির অপবাদ কে দিয়েছে জানিনে কিন্তু আমার তো মনে হয়

তোমার রচনায় সূক্ষ্মস্পর্শ আছে, আর তোমার কলমে বাস্তবতা সত্য হয়েই দেখা দেয় তাতে বাস্তবতার কোমরবাঁধা ভান নেই, গল্প লিখতে বসে না লেখাটাকেই যাঁরা বাহাদুরি মনে করেন তুমি যে তাঁদের দলে নাম লেখাওনি এতে খুশি হয়েছি।'

'রাইকমল' সম্পর্কে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত : 'রাইকমল আমাকে মুগ্ধ করেছে। ভাষা, বিষয়বস্তু, কথোপকথন, মনস্তত্ত্ব—সব দিক থেকে অপূর্ব। রূপ যৌবন ও ভালবাসার এত বড় ট্রাজিডির এমন artistic পরিণতি অতি বিরল। অনেক কিছু পেলুম·······আমাদের বাণীমন্দির এইরূপ শতশত কমলের সুমিষ্ট সৌরভে সমৃদ্ধ হউক।'

৪. শিল্পিমানস ও সামাজিকতা

১. I. A. Richards-এর 'Principles of Literary Criticism'-এর অন্তর্গত 'Communication and the Artist' প্রবন্ধ, পৃ: ২৬।

২. Louis Harap-এর 'Social Roots of the Arts', পৃ: ১০৫।

৩. Alcidamas-এর 'Against the Sophists' প্রবন্ধে এই অংশটি প্রথম প্রকাশিত হয় এবং Louis Harap-এর 'Social Roots of the Arts' গ্রন্থের ১০৫ পৃষ্ঠায় তা উদ্ধৃত হয়।

৪. Louis Harap-এর 'Social Roots of the Arts', পৃ: ১০৬।

৫. Ernst Fischer-এর 'The Necessity of Art'-এর paperback সংস্করণ, পৃ: ১৪।

৬. 'Studies in European Realism', George Lucaks, পৃ: ১১১।

৭. 'Tolstoy or Dostoevsky ?', George Steiner, পৃ: ১৯২।

৮. 'Social Roots of the Arts', Louis Harap, পৃ: ১০৬।

৯. 'What is Art ?', Tolstoy.

১০. Ibid, পৃ: ১২৩।

১১. 'The conscious effort to liberate themselves from Society altogether generated in the French asthetes a social consiousness which as Christopher Caudwell

said is torn from social action like flesh from bone.'—'Social Roots of the Arts', Louis Harap, পৃঃ ১০৮-৯।

১২. Ibid. পৃঃ ২৩৯।

১৩. টমাস মান কিন্তু প্রথম জীবনে 'রিফ্লেকশনস অফ এ নন পলিটিক্যাল ম্যান' লিখে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের রাজনীতির বাইরে থাকার পরামর্শ দেন।

১৪. 'The Necessity of Art', Ernst Fischer, পৃঃ ১০।

১৫. 'Art in the Third Reich—Survey', 1945।

১৬. 'The Fruits of Fascism', New york, 1943, পৃঃ ৩১০।

১৭. 'Aryan Music', Living Age, May 1938 পৃঃ ২৫৬।

১৮. 'The Speeches of Adolf Hitler', Vol I, পৃঃ ৫৯৫।

১৯. 'The Speeches of Adolf Hitler', Vol I, পৃঃ ৫৯৭।

২০. 'Social Roots of the Arts', Louis Harap, পৃঃ ১৬৫।

২১. 'Literature of the Graveyard', New york, পৃঃ ১৭১।

২২. 'Reminiscences of Lenin', Clara Zetkin, New york, 1934.

২৩. 'Social Roots of the Arts', Louis Harap, পৃঃ ১৭১।

২৪. 'সঙ্গ নিঃসঙ্গতা ও রবীন্দ্রনাথ', ১ম সং, বুদ্ধদেব বসু, পৃঃ ৫৯-৬০।

২৫. 'সঙ্গ নিঃসঙ্গতা ও রবীন্দ্রনাথ', ১ম সং, বুদ্ধদেব বসু, পৃঃ ২০১-২০২।

২৬. 'সঙ্গ নিঃসঙ্গতা ও রবীন্দ্রনাথ', ১ম সং, বুদ্ধদেব বসু, পৃঃ ২০৪-২০৫।

২৭. 'সঙ্গ নিঃসঙ্গতা ও রবীন্দ্রনাথ', ১ম সং, বুদ্ধদেব বসু, পৃঃ ১৫৭।

৫. সমকালীন স্বদেশ ও সাহিত্য

১. 'শনিবারের চিঠি'র তারাশঙ্কর-সংখ্যায় প্রকাশিত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আত্মদীপ তারাশঙ্কর' প্রবন্ধ থেকে।

২. 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', ৪র্থ সং, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৫৫৪।

৬. সমাজচেতনার ঐতিহ্য ও তারাশঙ্করের ভূমিকা

১. জগদীশ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প' গ্রন্থের ভূমিকা, ৮ম সং, পৃঃ ৷/০।

২ জগদীশ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প' গ্রন্থের ভূমিকা' ৮ম সং, পৃঃ ৷৵০।

৩. জগদীশ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প' গ্রন্থের ভূমিকা, ৮ম সং. পৃঃ ৷৵০।

৪. 'তারাশঙ্কর', ১ম সং, হরপ্রসাদ মিত্র, পৃঃ ১৪।

৫. 'তারাশঙ্কর', ১ম সং, হরপ্রসাদ মিত্র, পৃঃ ৬৮।

৬. 'তারাশঙ্কর', ১ম সং, হরপ্রসাদ মিত্র, পৃঃ ১৪০।

৭. 'তারাশঙ্কর', ১ম সং, হরপ্রসাদ মিত্র, পৃঃ ২২৭।

৮. 'তারাশঙ্কর', ১ম সং, হরপ্রসাদ মিত্র, পৃঃ ২৮৫।

৯. 'তারাশঙ্কর', ১ম সং, হরপ্রসাদ মিত্র, পৃঃ ১৯১।

১০. 'তারাশঙ্কর', ১ম সং, হরপ্রসাদ মিত্র, পৃঃ ২২৭।

১১. 'তারাশঙ্কর', ১ম সং, হরপ্রসাদ মিত্র, পৃঃ ২৫০।

১২. 'তারাশঙ্কর', ১ম সং, হরপ্রসাদ মিত্র, পৃঃ ২৫৩।

১৩. 'তারাশঙ্কর', ১ম সং হরপ্রসাদ মিত্র, পৃঃ ২৫৮।

১৪. 'তারাশঙ্কর', ১ম সং, হরপ্রসাদ মিত্র, পৃঃ ২৭৩।

১৫. 'তারাশঙ্কর', ১ম সং, হরপ্রসাদ মিত্র, পৃঃ ২৭৩।

১৬. 'শরৎচন্দ্র', ৯ম সং, সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত, পৃঃ ৩৪।

১৭. 'তারাশঙ্কর', ১ম সং, হরপ্রসাদ মিত্র, পৃঃ ২৫৭।

১৮. 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', ৪র্থ সং, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৫৪৯-৫০।

১৯. রথীন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গল্পপঞ্চাশৎ'-এর ভূমিকা 'গল্পকার তারাশঙ্কর', পৃঃ ৫।

২০. রথীন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গল্পপঞ্চাশৎ-এর ভূমিকা 'গল্পকার তারাশঙ্কর', পৃঃ ৪৩।

২১. 'আমার সাহিত্যজীবন', ১ম খণ্ড, ২য় সং, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৮৩।

২২. 'সাহিত্যের সত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'শরৎচন্দ্র' প্রবন্ধ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৮১।

২৩. 'সাহিত্যের সত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'শরৎচন্দ্র' প্রবন্ধ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৮৪-৮৫।

২৪. 'সাহিত্যের সত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'শরৎচন্দ্র' প্রবন্ধ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৮৫।

২৫. 'সাহিত্যের সত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'শরৎচন্দ্র' প্রবন্ধ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৮৫।

২৬. 'সাহিত্যের সত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'শরৎচন্দ্র' প্রবন্ধ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৮৫-৮৬।

৭. চিত্তবৃত্তির চিরন্তন সমস্যা

১. From 'MAX WEBER: Essays in Sociology', Translated, edited and with an introduction by H. H. Gerth & C. Wright Mills, A Galaxy Book, Oxford University Press, 1958 edition p. 397.

২. 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', ২য় সং, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৬৫৫।

৩. 'শরৎচন্দ্র ও তারপর', ১ম সং, কাজী আব্দুল ওদুদ, পৃঃ ১৪৬।

৪. 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' ৪র্থ সং, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৫৬৭।

৫. রথীন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক 'তারাশঙ্করের গল্পপঞ্চাশৎ'-এর ভূমিকা 'গল্পকার তারাশঙ্কর', পৃঃ ২৬।

৬. 'সাহিত্যের সত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'মনে রাখার মত' নিবন্ধ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৭৮।

৭. 'An Acre of Green Grass', 1st. ed., Buddhadev Bose, p. 84.

৮. 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', ১ম সং, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২৯০।

৮. ব্যক্তি ও সমাজ-পটভূমি

১. 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', ৪র্থ সং, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৫২৮।

২. 'আমার কালের কথা', ১ম সং, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২২২
৩. 'পঞ্চগ্রাম'-এর ১ম সংস্করণের ভূমিকা, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪. 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা', ৬ষ্ঠ সং, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১।

৯. কালান্তরের রূপমহিমা ও লেখকের আগ্রহ

১. 'ভারতবর্ষ ও চীন', ১ম সং, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমিকা।
২. 'ভারতবর্ষ ও চীন', ১ম সং, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২।
৩. 'ভারতবর্ষ ও চীন', ১ম সং, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৬।

পরিশিষ্ট ২

তারাশঙ্করের লেখা গল্পগুলিকে বর্ণানুক্রমিক সাজিয়ে দেওয়া হল। প্রকরণের বিচারে সবগুলিই ছোটগল্প নয়—এর মধ্যে বড় গল্প আছে, স্মৃতি-কথামূলক গল্প আছে, নিছক চরিত্রচিত্রণ আছে। কোন্ কোন্ বইয়ে কোন্ কোন্ গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, আগ্রহী পাঠকের জন্য এখানে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

অগ্রদানী	॥ রসকলি, শ্রেষ্ঠগল্প, তমসা, গল্পপঞ্চাশৎ
অভিনয়	॥ একটি প্রেমের গল্প
অভিনেতা রতনবাবু	॥ মিছিল
অহেতুক	॥ স্থলপদ্ম
আখড়াইয়ের দীঘি	॥ ছলনাময়ী, শ্রেষ্ঠগল্প, স্বনির্বাচিত গল্প, গল্পপঞ্চাশৎ
আখেরী	॥ ১৩৫০, পৌষলক্ষ্মী
আধলা ও পয়সা	॥ দিল্লীকা লাড্ডু
আফজল খেলোয়াড়ী ও রমজান শের আলি	॥ বিস্ফোরণ, কিশোর সঞ্চয়ন, গবিন সিংয়ের ঘোড়া
আরোগ্য	॥ ইমারৎ
আলো আঁধারি	॥ স্থলপদ্ম
আলোকাভিসার	॥ আলোকাভিসার
ইতিহাস	॥ বেদেনী, গল্পসঞ্চয়ন
ইমারৎ	॥ ইমারৎ, গল্পপঞ্চাশৎ
ইস্কাপন	॥ প্রসাদমালা, স্বনির্বাচিত গল্প, পৌষলক্ষ্মী
ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান	॥ দিল্লীকা লাড্ডু
উত্তর কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড	॥ উত্তর কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড
এ মেয়ে কেমন মেয়ে	॥ দীপার প্রেম, পঞ্চকন্যা

এক পশলা বৃষ্টি ॥ এক পশলা বৃষ্টি

একটি কালো মেয়ের গল্প ॥ উনিশ শ' একাত্তর

একটি প্রেমের গল্প ॥ একটি প্রেমের গল্প

একটি মুহূর্ত ॥ বিস্ফোরণ

একরাত্রি ॥ তিনশূন্য, স্বনির্বাচিত গল্প, গল্পপঞ্চাশৎ

এ্যাণ্ড ॥ দিল্লীকা লাড্ডু

এ্যাকসিডেণ্ট ॥ এ্যাকসিডেণ্ট, এক পশলা বৃষ্টি

কমল মাঝির গল্প ॥ ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প

কলকাতার দাঙ্গা
ও আমি ॥ কামধেনু

কয়েক ফোঁটা রক্ত ॥ এ্যাকসিডেণ্ট, এক পশলা বৃষ্টি

কাকপণ্ডিত ॥ শ্রীপঞ্চমী, ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প, চিন্ময়ী, ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প (স্বতন্ত্র গ্রন্থ)

কাত্যায়নী ॥ নারী রহস্যময়ী

কান্না ॥ শিলাসন, ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প, কিশোর সঞ্চয়ন

কামধেনু ॥ কামধেনু, গল্পপঞ্চাশৎ

কালাপাহাড ॥ রসকলি, শ্রেষ্ঠগল্প, তমসা, গল্পপঞ্চাশৎ, রামধনু, গবিন সিংয়ের ঘোড়া

কালো বৌ ॥ নারী রহস্যময়ী

কালো মেয়ে ॥ বিস্ফোরণ

কাঁটা ॥ তিনশূন্য

কুলদা ঠাকুরদা ॥ মিহুল

কুলীনের মেয়ে ॥ হারানো সুর

কুশপুত্তলী ॥ প্রসাদমালা, মানুষের মন

কৃষ্ণা ॥ নারী রহস্যময়ী

খড়্গা ॥ ছলনাময়ী

খাজাঞ্চীবাবু ॥ জলসাঘর, শ্রেষ্ঠগল্প, রামধনু

গবিন সিংয়ের ঘোড়া ॥ বিস্ফোরণ, ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প, গবিন সিংয়ের ঘোড়া, উত্তর কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

প্রসাদমালা	॥ প্রসাদমালা, মানুষের মন, আলোকাভিসার, জায়া
প্রহ্লাদের কালী	॥ শিলাসন
পাটনী	॥ কামধেনু
পিতাপুত্র	॥ বেদেনী, প্রিয় গল্প, গল্পপঞ্চাশৎ
পিঞ্জর	॥ তিনশূন্য
পুত্রেষ্টি	॥ হারানো সুর, গল্পপঞ্চাশৎ
পুরোহিত	॥ প্রতিধ্বনি
পৌষলক্ষ্মী	॥ ১৩৫০, শ্রেষ্ঠগল্প, পৌষলক্ষ্মী, গল্পপঞ্চাশৎ
ফল্গু	॥ যাদুকরী, প্রিয়গল্প, তপোভঙ্গ
বন্দিনী কমলা	॥ তিনশূন্য, গল্পপঞ্চাশৎ
বরমলাগের মাঠ	॥ কামধেনু
বড় বৌ	॥ প্রতিধ্বনি, চিরন্তনী, গল্পপঞ্চাশৎ
বাউল	॥ যাদুকরী
বাণী মা	॥ বেদেনী, গল্পসঞ্চয়ন
বাদল আর বাতাস	॥ আয়না
বাবুমশায়	॥ মিছিল
বাবুরামের বাবুয়া	॥ বিষপাথর, গল্পপঞ্চাশৎ
বারো মাইল ভ্রমণ কথা	॥ ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প
বাংলাদেশের হৃদয় হতে	॥ আয়না
বিগত দিনের দুটি মানুষ	॥ ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা	॥ পৌষলক্ষ্মী
বিচিত্র কাহিনী	॥ ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প
বিধাতা ও মানুষ	॥ শ্রীপঞ্চমী, ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প
বিপিন চাটুজ্জে	॥ মিছিল
বিলিতি মাস্টার	॥ মিছিল
বিষপাথর	॥ বিষপাথর
বিষ্টু চক্রবর্তীর কাহিনী	॥ বিস্ফোরণ, ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প, কিশোর সঞ্চয়ন
বিস্ফোরণ	॥ বিস্ফোরণ
বেদেনী	॥ বেদেনী, শ্রেষ্ঠগল্প, প্রেমের গল্প, তমসা, গল্পপঞ্চাশৎ

বেদের মেয়ে || মাটি

বোবাকান্না || ১৩৫০, প্রিয় গল্প, পৌষলক্ষ্মী, গল্পপঞ্চাশৎ

ব্যাঘ্রচর্ম || হারানো সুর, স্বনির্বাচিত গল্প, গল্পপঞ্চাশৎ

ব্যাধি || ছলনাময়ী, গল্পসঞ্চয়ন, গল্পপঞ্চাশৎ, রামধনু

ভবানন্দের কাশীযাত্রা || উত্তর কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

ভূতপুরাণ || ভূতপুরাণ

ভুলোর ছলনা || ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প, কিশোর সঞ্চয়ন

ভ্রমণ কাহিনী || যাদুকরী

মতিলাল || রসকলি, স্বনির্বাচিত গল্প. গল্পপঞ্চাশৎ, চিন্ময়ী

মধুমাস্টার || জলসাঘর, ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প, চিন্ময়ী

মনের আয়নায়
নিজের ছবি || আয়না, ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প

মরামাটি || স্থলপদ্ম

মলি || নারী রহস্যময়ী

ময়দান || মাটি

ময়দানব || স্থলপদ্ম, স্বনির্বাচিত গল্প, গল্পপঞ্চাশৎ, পঞ্চকন্যা

মাছের কাঁটা || দিল্লীকা লাড্ডু

মাটি || মাটি, স্বনির্বাচিত গল্প

মানুষের মন || মানুষের মন, প্রেমের গল্প

মালাকার || তিনশূন্য, গল্পপঞ্চাশৎ

মুখুজ্জে মশাই || ছলনাময়ী, গল্পসঞ্চয়ন, চিন্ময়ী

মুসাফিরখানা || রসকলি

মেলা || ছলনাময়ী. গল্পসঞ্চয়ন, গল্পপঞ্চাশৎ, পঞ্চকন্যা

যতীনকাকা || মিছিল

যাদুকরী || যাদুকরী, প্রিয়গল্প. স্বনির্বাচিত গল্প, তমসা, গল্পপঞ্চাশৎ, জায়া

যাদুকরের মৃত্যু || কামধেনু

রঙীন চশমা || ছলনাময়ী

রবিবারের আসর || বিষপাথর

রসকলি || রসকলি, প্রিয়গল্প, প্রেমের গল্প, তমসা, গল্পপঞ্চাশৎ

রাঙাদিদি ।। বেদেনী, গল্পসঞ্চয়ন, প্রেমের গল্প
রাখাল বাঁড়ুজ্জে ।। জলসাঘর
রাজপুত্র ।। প্রতিধ্বনি
রাজা রাণী ও প্রজা ।। প্রতিধ্বনি
রাঠোর ও চন্দাবত ।। স্থলপদ্ম, গল্পপঞ্চাশৎ
রাণুর বিবাহ ।। প্রতিধ্বনি, চিরন্তনী
রাধাদা ।। মিছিল
রাধারাণী ।। বেদেনী, গল্পসঞ্চয়ন, প্রেমের গল্প
রামধনু ।। রামধনু
রায়বাড়ি ।। প্রিয়গল্প, গল্পপঞ্চাশৎ
রূপসী বিহঙ্গিনী ।। রূপসী বিহঙ্গিনী
শঙ্করীতলার জঙ্গলে ।। দীপার প্রেম
শবরী ।। ইমারৎ
শশী চোর ।। মিছিল
শশী শেখর ।। মিছিল
শ্মশান বৈরাগ্য ।। রসকলি
শাপমোচন ।। হারানো সুর, গল্পপঞ্চাশৎ
শিবানীর অদৃষ্ট ।। শিবানীর অদৃষ্ট
শিলাসন ।। শিলাসন, চিরন্তন, গল্পপঞ্চাশৎ
শেষকথা ।। ১৩৫০, প্রিয়গল্প, পৌষলক্ষ্মী, প্রেমের গল্প,
গল্পপঞ্চাশৎ, রামধনু
শ্রীনাথ ডাক্তার ।। যাদুকরী, তপোভঙ্গ
শ্যামাদাসের মৃত্যু ।। যাদুকরী
সত্যপ্রিয়ের কাহিনী ।। শ্রীপঞ্চমী, ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প, ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প
(স্বতন্ত্র গ্রন্থ)
সনাতন ।। যাদুকরী, প্রিয়গল্প, গল্পপঞ্চাশৎ, তপোভঙ্গ
সন্তান ।। প্রতিধ্বনি, গল্পপঞ্চাশৎ
সন্ধ্যামণি ।। ছলনাময়ী, প্রিয়গল্প, গল্পপঞ্চাশৎ
সর্বনাশী এলোকেশী ।। প্রসাদমালা, মানুষের মন
সংসার ।। তিনশূন্য

স্থলপদ্ম	।। স্থলপদ্ম, গল্পপঞ্চাশৎ, পঞ্চকন্যা
সাবিত্রী চূড়ী	।। মাটি
সাহিত্যতীর্থ নাল্লুর	।। ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প
সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার	।। হারানো সুর
স্বাধীনতা	।। শ্রীপঞ্চমী, ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প, কিশোর সঞ্চয়ন
সুকু ও ভুকু	।। এ্যাকসিডেণ্ট, এক পশলা বৃষ্টি, ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প, গবিন সিংয়ের ঘোড়া
সুখনীড়	।। তিনশূন্য, গল্পপঞ্চাশৎ
সুতপার তপস্যা	।। উনিশশ' একাত্তর
সুরতহাল রিপোর্ট	।। প্রসাদমালা, মানুষের মন, গল্পপঞ্চাশৎ
সোনার তলোয়ার	।। মিছিল
হরিপণ্ডিতের কাহিনী	।। প্রতিধ্বনি
হারানো সুর	।। হারানো সুর, চিন্ময়ী
হেডমাস্টার	।। বিষপাথর, কিশোর সঞ্চয়ন
হৈমবতীর প্রত্যাবর্তন	।। বিষপাথর
হোলি	।। বেদেনী, গল্পসঞ্চয়ন
ক্ষ্যাপাদাস বাবাজী	।। মিছিল

(যে গল্পগুলি এখনো পর্যন্ত কোনো গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি)

আকাশের কাহিনী	।। শনিবারের চিঠি, বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৬৩
কুড়ানো ঘড়ি	।। দেশ, চৈত্র ১৩৪২ (অনুবাদ গল্প)
চোখের ভুল	।। উপাসনা, ভাদ্র ১৩৩৫
চোরের পুণ্য	।। ভারতবর্ষ, কার্তিক ১৩৪৭
জন্মান্তর	।। তরুণের স্বপ্ন, বৈশাখ ১৩৬২ (লেখকের প্রয়াণের পরে 'চিত্রাঙ্গদা' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়।)
দেবাঃ ন জানন্তি	।। অলকা, আশ্বিন ১৩৪৬
পণ্ডিতমশাই	।। দেশ, চৈত্র ১৩৪৩
বাঞ্ছাপূরণ	।। তরুণের স্বপ্ন, আশ্বিন ১৩৬৬
মন্থর বিষ	।। দেশ, মাঘ ১৩৪২

মরুর মায়া ।। উপাসনা, মাঘ-ফাল্গুন ১৩৩৭

মা ।। পরিচয়, আষাঢ় ১৩৪৫

রঙীন ফাঁস ।। শনিবারের চিঠি, ভাদ্র ১৩৪৫

রাজ সাপ ।। শনিবারের চিঠি, বৈশাখ ১৩৪৩

রাধা ।। শনিবারের চিঠি, আশ্বিন ১৩৫৭

শৈলবালার তাসের ঘর ।। দেশ, অগ্রহায়ণ ১৩৩৩

শ্মশান ঘাট ।। বঙ্গশ্রী, মাঘ ১৩৩৯

শ্মশানের পথে ।। কালিকলম আশ্বিন ১৩৪৫ (এই গল্পটির পরিবর্ধিত রূপ 'চৈতালী ঘূর্ণী' উপন্যাস)

সমাপ্তি ।। বঙ্গলক্ষ্মী, চৈত্র ১৩৪৩ (লেখকের প্রয়াণের পরে 'কালি ও কলম' পত্রিকায় বিশেষ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়)

সমুদ্রমন্থন ।। শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, আশ্বিন ১৩৪৩ (লেখকের প্রয়াণের পরে 'শনিবারের চিঠি'র বিশেষ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়)

স্রোতের কুটো ।। পূর্ণিমা, ১৩৩৮

৫. রাইকমল ॥ উপন্যাস ॥ আশ্বিন ১৩৪১

৬. প্রেম ও প্রয়োজন ॥ উপন্যাস ॥ আশ্বিন ১৩৪২

৭. ছলনাময়ী ॥ গল্পগ্রন্থ ॥ বৈশাখ ১৩৪৩

(ছলনাময়ী, মেলা, ডাইনীর বাঁশী, ঘাসের ফুল, ব্যাধি, মুখুজ্জে মশাই—ছয়টি গল্প। সন্ধ্যামণি, আখড়াইয়ের দীঘি, খড়্গা, রঙীন চশমা—এই চারটি গল্প পরবর্তী সংস্করণে যুক্ত হয়।)

৮. জলসাঘর ॥ গল্পগ্রন্থ ॥ শ্রাবণ ১৩৪৪

(জলসাঘর, পদ্মবউ, ডাকহরকরা, প্রতীক্ষা, মধু মাস্টার, তারিণীমাঝি, খাজাঞ্চীবাবু, টহলদার, টাারা, রাখাল বাড়ুজ্জে, নারী ও নাগিনী—এগারটি গল্প।)

৯. আগুন ॥ উপন্যাস ॥ আশ্বিন ১৩৪৪

১০. রসকলি ॥ গল্পগ্রন্থ ॥ বৈশাখ ১৩৪৫

(কালাপাহাড়, তাসের ঘর, মতিলাল, মুসাফিরখানা, শ্মশান-বৈরাগ্য, মুটু মোক্তারের সওয়াল, অগ্রদানী, প্রতিমা, রসকলি—নয়টি গল্প।)

১১. ধাত্রীদেবতা ॥ উপন্যাস ॥ আশ্বিন ১৩৪৬

১২. কালিন্দী ॥ উপন্যাস ॥ ভাদ্র ১৩৪৭

১৩. তিনশূন্য ॥ গল্পগ্রন্থ ॥ বৈশাখ ১৩৪৮

(একরাত্রি, চন্দ্রজামাইয়ের জীবনকথা, সুখনীড়, পিঞ্জর, মালাকার, কাঁটা, বন্দিনী কমলা, চণ্ডী বায়েব সন্ন্যাস, চাবড়াটির স্টেশন মাস্টার, সংসার, তিনশূন্য—এগারটি গল্প)

১৪. কালিন্দী ॥ নাটক ॥ শ্রাবণ ১৩৪৮

১৫. দুই পুরুষ ॥ নাটক ॥ আষাঢ় ১৩৪৯

১৬. গণদেবতা ॥ উপন্যাস ॥ আশ্বিন ১৩৪৯

১৭. পথের ডাক ॥ নাটক ॥ ফাল্গুন ১৩৪৯

১৮. প্রতিধ্বনি ॥ গল্পগ্রন্থ ॥ চৈত্র ১৩৪৯

(প্রতিধ্বনি, রাজা রাণী ও প্রজা, বড় বৌ, রাজপুত্র, হরি পণ্ডিতের কাহিনী, পুরোহিত, রাণুর বিবাহ, সন্তান—আটটি গল্প।)

১৯. বেদেনী ॥ গল্পগ্রন্থ ॥ আশ্বিন ১৩৫০

(বেদেনী, পিতাপুত্র, ইতিহাস, রাধারাণী, ডাইনী, রাঙাদিদি, বাণী মা, হোলি, চোরের মা, চোর, না—এগারটি গল্প।)

২০. দিল্লীকা লাড্ডু ॥ গল্পগ্রন্থ ॥ কার্তিক ১৩৫০

(দিল্লীকা লাড্ডু, পঞ্চরুদ্র, টিটি, মাছের কাঁটা, এ্যাও, আধলা ও পয়সা, ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান—সাতটি গল্প।)

২১. মন্বন্তর ॥ উপন্যাস ॥ মাঘ ১৩৫০

২২. পঞ্চগ্রাম ॥ উপন্যাস ॥ মাঘ ১৩৫০

২৩. যাদুকরী ॥ গল্পগ্রন্থ ॥ ফাল্গুন ১৩৫০

(যাদুকরী, শ্রীনাথ ডাক্তার, জায়া, ভ্রমণকাহিনী, ফল্গু, তপোভঙ্গ, প্রত্যাবর্তন, বাউল, শ্যামাদাসের মৃত্যু, সনাতন—দশটি গল্প।)

২৪. স্থলপদ্ম ॥ গল্পগ্রন্থ ॥ ফাল্গুন ১৩৫০

(স্থলপদ্ম, চব্বিশে ডিসেম্বর, আলো আঁধারি, ময়দানব, রাঠোর ও চন্দাবত, মরামাটি, অহেতুক—সাতটি গল্প।)

২৫. কবি ॥ উপন্যাস ॥ ফাল্গুন ১৩৫০

২৬. ১৩৫০ ॥ গল্পগ্রন্থ ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৫১

(বোবাকান্না, পৌষলক্ষ্মী, শেষকথা, আখেরী—চারটি গল্প।)

২৭. বিংশ শতাব্দী ॥ নাটক ॥ মাঘ ১৩৫১

২৮. চকমকি ॥ প্রহসন ॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২

২৯. দ্বীপান্তর ॥ নাটক ॥ আষাঢ় ১৩৫২

৩০. প্রসাদমালা ॥ গল্পগ্রন্থ ॥ শ্রাবণ ১৩৫২

(প্রসাদমালা, সুরতহাল রিপোর্ট, দেবতার ব্যাধি, কৃশপুত্তলী, সর্বনাশী এলোকেশী, ইস্কাপন—ছয়টি গল্প।)

৩১. হারানো সুর ॥ গল্পগ্রন্থ ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৫২

(হারানো সুর, শাপমোচন, পুত্রেষ্টি, সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার, কুলীনের মেয়ে, ব্যাঘ্রচর্ম, চৌকিদার, জুয়াড়ী—আটটি গল্প।)

৩২. সন্দীপন পাঠশালা ॥ উপন্যাস ॥ মাঘ ১৩৫২

৩৩. ঝড় ও ঝরাপাতা ॥ উপন্যাস ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৫৩

৩৪. অভিযান ॥ উপন্যাস ॥ পৌষ ১৩৫৩

৩৫. ইমারৎ ॥ গল্পগ্রন্থ ॥ মাঘ ১৩৫৩

(ইমারৎ, নারী, তৃষ্ণা, আরোগ্য, তমসা, শবরী—ছয়টি গল্প।)

৩৬. রামধনু ॥ গল্পগ্রন্থ ॥ বৈশাখ ১৩৫৪

(রামধনু, কালাপাহাড়, মুটু মোক্তারের সওয়াল, ব্যাধি, খাজাঞ্চীবাবু,

ডাকহরকরা, শেষকথা—সাতটি গল্প।)

৩৭. তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠগল্প ॥ গল্পগ্রন্থ ॥ পৌষ ১৩৫৪

(জলসাঘর, তারিণী মাঝি, খাজাঞ্চিবাবু, আখড়াইয়ের দীঘি, নারী ও নাগিনী, কালাপাহাড়, তাসের ঘর, অগ্রদানী, বেদেনী, না, পৌষলক্ষ্মী, দেবতার ব্যাধি—তেরটি গল্প। শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত।)

৩৮. শ্রীপঞ্চমী ॥ গল্পগ্রন্থ ॥ মাঘ ১৩৫৪

(সত্যপ্রিয়ের কাহিনী, ধার্মিকের পরীক্ষা, বিধাতা ও মানুষ, কাক পণ্ডিত, স্বাধীনতা—পাঁচটি গল্প।)

৩৯. সন্দীপন পাঠশালা ॥ উপন্যাস (কিশোর সংস্করণ)

॥ ফাল্গুন ১৩৫৪

৪০. তামস তপস্যা ॥ উপন্যাস ॥ চৈত্র ১৩৫৪

৪১. কামধেনু ॥ গল্পগ্রন্থ ॥ ভাদ্র ১৩৫৫

(কামধেনু, যাদুকরের মৃত্যু, পাটনী, বরমলাগের মাঠ, কলকাতার দাঙ্গা ও আমি—পাঁচটি গল্প।)

৪২. পদচিহ্ন ॥ উপন্যাস ॥ বৈশাখ ১৩৫৭

৪৩. উত্তরায়ণ ॥ উপন্যাস ॥ আষাঢ় ১৩৫৭

৪৪. মাটি ॥ গল্পগ্রন্থ ॥ কার্তিক ১৩৫৭

(মাটি, ময়দান, বেদের মেয়ে, নব মহাপ্রস্থান উপাখ্যান গার্ড চ্যাটার্সনের কাহিনী, সাবিত্রী চণ্ডী—ছয়টি গল্প।)

৪৫. আমার কালের কথা ॥ আত্মজীবনী ॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮

৪৬. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা ॥ আত্মজীবনী ॥ আষাঢ় ১৩৫৮

৪৭. যুগবিপ্লব ॥ নাটক ॥ শ্রাবণ ১৩৫৮

৪৮. শিলাসন ॥ গল্পগ্রন্থ ॥ মাঘ ১৩৫৮

(কান্না, প্রহ্লাদের কালী, শিলাসন—তিনটি গল্প।)

৪৯. নাগিনী কন্যার কাহিনী ॥ উপন্যাস ॥ আশ্বিন ১৩৫৯

৫০. বিচিত্র ॥ নিবন্ধ ॥ চৈত্র ১৩৫৯

৫১. আরোগ্য নিকেতন ॥ উপন্যাস ॥ চৈত্র ১৩৫৯

৫২. আমার সাহিত্য জীবন ॥ আত্মজীবনী ॥ শ্রাবণ ১৩৬০

৫৩. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয় গল্প ॥ নাটক

॥ কার্তিক ১৩৬০

(রায় বাড়ী, পিতাপুত্র, যন্ত্র, যাদুকরী, মুটু মোক্তারের সওয়াল, সন্ধ্যামণি সনাতন, রসকলি, দেবতার ব্যাধি, বোবাকান্না, শেষকথা—এগারটি গল্প।)

৫৪. না ॥ উপন্যাস ॥ চৈত্র ১৩৬০

৫৫. স্বনির্বাচিত গল্প ॥ গল্পগ্রন্থ ॥ শ্রাবণ ১৩৬১

(আখড়াইয়ের দীঘি, তাসের ঘর, মাটি, ব্যাঘ্রচর্ম, ময়দানব, পঞ্চরুদ্র, ইস্কাপন, মতিলাল, প্রতিমা, নারী ও নাগিনী, একরাত্রি, ইমারত, যাদুকরী—তেরটি গল্প।)

৫৬. চাঁপাডাঙার বৌ ॥ উপন্যাস ॥ শ্রাবণ ১৩৬১

৫৭. গল্পসঞ্চয়ন ॥ গল্পগ্রন্থ ॥ পৌষ ১৩৬১

(বাবারাণী, ইতিহাস, ডাইনী, রাণী মা, [illegible], [illegible] চোরের মা, [illegible], [illegible], ডাইনীর বাঁশী, ঘাসের ফুল, [illegible] [illegible]—তেরটি গল্প।)

৫৮. বিস্ফোরণ ॥ গল্পগ্রন্থ ॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২

(একটি মুহূর্ত, জটায়ু, বিস্ফোরণ, কালোমেয়ে, বিষ্টু চক্রবর্তীর কাহিনী, গবিন সিংয়ের ঘোড়া, আফজল খাঁ পাথাড়ী ও রমজান শেখ [illegible]—সাতটি গল্প।)

৫৯. কৈশোর স্মৃতি ॥ আত্মজীবনী ॥ শ্রাবণ ১৩৬৩

৬০. পঞ্চপুত্তলী ॥ উপন্যাস ॥ ভাদ্র ১৩৬৩

৬১. কালান্তর ॥ উপন্যাস ('পদচিহ্ন'-এর দ্বিতীয় পর্ব ॥ ভাদ্র ১৩৬৩

৬২. ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প ॥ গল্পগ্রন্থ ॥ ভাদ্র ১৩৬৩

(সত্যপ্রিয়ের কাহিনী, বিচিত্র কাহিনী, জটায়ু, [illegible], গবিন সিংয়ের ঘোড়া, মধুমাস্টার—ছয়টি গল্প।)

৬৩ কবি ॥ নাটক ॥ আষাঢ় ১৩৬৪

৬৪. বিচারক ॥ উপন্যাস ॥ শ্রাবণ ১৩৬৪

৬৫. কালরাত্রি ॥ নাটক ॥ আশ্বিন ১৩৬৪

৬৬ বিষপাথর ॥ গল্পগ্রন্থ ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৬৪

(বিষপাথর, [illegible] আসন, হেড মাস্টার, [illegible] বাঘ, হৈমবতীর প্রত্যাবর্তন—পাঁচটি গল্প; প্রথম সংস্করণে 'বাঞ্ছাপূরণ' গল্পটিও ছিল।)

৬৭. সপ্তপদী ॥ উপন্যাস ॥ পৌষ ১৩৬৪

৬৮. বিপাশা ॥ উপন্যাস ॥ মাঘ ১৩৬৪

৬৯. রাধা ॥ উপন্যাস ॥ চৈত্র ১৩৬৭

৭০. মানুষের মন ॥ গল্পগ্রন্থ ॥ বৈশাখ ১৩৬৫

(প্রসাদমালা, সুরতহাল রিপোর্ট, দেবতার ব্যাধি, কুশপুত্তলী, সর্বনাশী এলোকেশী, মানুষের মন—ছয়টি গল্প।)

৭১. ডাকহরকরা ॥ উপন্যাস ॥ বৈশাখ ১৩৬৫

৭২. রচনা সংগ্রহ, ১ম খণ্ড ॥ সঙ্কলন ॥ শ্রাবণ ১৩৬৫

(ধাত্রীদেবতা, পথের ডাক, রসকলি।)

৭৩. রবিবারের আসর ॥ গল্পগ্রন্থ ॥ শ্রাবণ ১৩৬৫

('বিষপাথর'-এর পরিবর্তিত নাম।)

৭৪. মস্কোতে কয়েকদিন ॥ ভ্রমণ বিবরণী ॥ আশ্বিন ১৩৬৫

৭৫. প্রেমের গল্প ॥ গল্পগ্রন্থ ॥ ভাদ্র ১৩৬৬

(বেদেনী, রসকলি, নারী ও নাগিনী, রাধারাণী, জায়া, মানুষের মন, রাঙাদিদি, তমসা, ঘাসের ফুল, নারী, প্রত্যাবর্তন, শেষকথা—বারোটি গল্প।)

৭৬. মহাশ্বেতা ॥ উপন্যাস ॥ আষাঢ় ১৩৬৭

৭৭. যোগভ্রষ্ট ॥ উপন্যাস ॥ শ্রাবণ ১৩৬৭

৭৮. পৌষলক্ষ্মী ॥ গল্পগ্রন্থ ॥ শ্রাবণ ১৩৬৭

('১৩১০' গল্পগ্রন্থের পরিবর্তিত সংস্করণ—পৌষলক্ষ্মী, ইস্কাপন, শেষকথা, আখেরী, বোবাকান্না, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা—ছয়টি গল্প।)

৭৯. আলোকাভিসার ॥ গল্পগ্রন্থ ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৬৭

৮০. সাহিত্যের সত্য ॥ প্রবন্ধ সঙ্কলন ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৬৭

(লেখকের কথা, বাঙলার সংস্কৃতি ও সমস্যা, আমার জীবনে কপালকুণ্ডলা, বাঙলা সাহিত্যের মর্মবাণী, সমাজ ও সাহিত্য, আধুনিক কাল ও সাহিত্য, আমি যদি আমার সমালোচক হতাম, যে বই লিখতে চাই, বঙ্কিমের মাতৃপূজা, সাহিত্যের সত্য, আধুনিক বাঙলা নাট্যসাহিত্য, কবির কথা, মনে রাখার মত, শরৎচন্দ্র, আধুনিক সাহিত্য ও সমাজ, চীন ভ্রমণ, আধুনিক চীনের নারী—সতেরটি আলোচনা।)

৮১. নাগরিক ॥ উপন্যাস ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৬৭

৮২. নিশিপদ্ম ॥ উপন্যাস ॥ মাঘ ১৩৬৮

৮৩. চিরন্তনী ॥ গল্পগ্রন্থ ॥ ফাল্গুন ১৩৬৮

(রাণুর বিবাহ, তাসের ঘর, জায়া, বড়বৌ, প্রতিমা, প্রত্যাবর্তন, শিলাসন, তমসা—আটটি গল্প।)

৮৪. যতিভঙ্গ ॥ উপন্যাস ॥ বৈশাখ ১৩৬৯

৮৫. কান্না ॥ উপন্যাস ॥ বৈশাখ ১৩৬৯

৮৬. এ্যাকসিডেণ্ট ॥ গল্পগ্রন্থ ॥ বৈশাখ ১৩৬৯

(এ্যাকসিডেণ্ট, কয়েক ফোঁটা রক্ত, স্নুকু ও ভুকু—তিনটি গল্প।)

৮৭. সংঘাত ॥ নাটক ॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯

৮৮. ছোটদের ভালো ভালো গল্প ॥ গল্পগ্রন্থ ॥ আষাঢ় ১৩৬৯

৮৯. আমার সাহিত্যজীবন (২য় পর্ব) ॥ আত্মজীবনী ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৬৯

৯০. তমসা ॥ গল্পগ্রন্থ

(তমসা, রসকলি, নারী ও নাগিনী, অগ্রদানী, কালাপাহাড়, যাদুকরী, বেদেনী—সাতটি গল্প। রথীন্দ্রনাথ রায়ের ভূমিকা সম্বলিত।)

৯১. কালবৈশাখী ॥ উপন্যাস

৯২. ভারতবর্ষ ও চীন ॥ প্রবন্ধ

৯৩. গল্প পঞ্চাশৎ ॥ গল্পগ্রন্থ

(রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত। দেবতার ব্যাধি, জটায়ু, মেলা, সনাতন, ব্যাধি, সন্ধ্যামণি, সুবতহ'ল রিপোর্ট, সন্তান, রসকলি, নারী ও নাগিনী, অগ্রদানী, কালাপাহাড়, যাদুকরী, বেদেনী, তমসা, রায়বাড়ি, জলসাঘর, আখড়াইয়ের দীঘি, মতিলাল, পিতাপুত্র, কামধেনু, একরাত্রি, বন্দিনী কমলা, তারিণী মাঝি, প্রতিমা, ঘাসের ফুল, ডাইনী, তিনশূন্য, শিলাসন, নারী, ময়দানব, স্থলপদ্ম, বোবাকান্না, বড়বৌ, পৌষলক্ষ্মী, মালাকার, সুখনীড়, তাসের ঘর, ব্যাঘ্রচর্ম, পুত্রেষ্টি, প্রত্যাবর্তন, শাপমোচন, বাবুরামের বাবুয়া, না, ইমারত, রাঠোর ও চন্দাবত, প্রতিধ্বনি, চারহাটির স্টেশন মাস্টার, টুটি, শেষ কথা—পঞ্চাশটি গল্প। রথীন্দ্রনাথ রায়ের বিস্তৃত ভূমিকা।)

৯৪. একটি চড়ুই পাখী ও কালো মেয়ে ॥ উপন্যাস

দু'শ তিপ্পান্ন

৯৫. আয়না ॥ গল্পগ্রন্থ

(বাংলাদেশের হৃদয় হতে, গল্প নয়, বাদল আর বাতাস, মনের আয়নায় নিজের ছবি—চারটি গল্প।)

৯৬. জঙ্গলগড় ॥ উপন্যাস

৯৭. মঞ্জরী অপেরা ॥ উপন্যাস

৯৮. চিন্ময়ী ॥ গল্পগ্রন্থ

(কাকপণ্ডিত, চারহাটীর স্টেশন মাস্টার, মতিলাল, মুখুজ্জেমশায়, মধু-মাস্টার, হারানো সুর—ছয়টি গল্প।)

৯৯. সংকেত ॥ উপন্যাস

১০০. ভুবনপুরের হাট ॥ উপন্যাস

১০১. বসন্তরাগ ॥ উপন্যাস

১০২. একটি প্রেমের গল্প ॥ গল্পগ্রন্থ

(একটি প্রেমের গল্প, অভিনয়, জগন্নাথের রথ, চিনু মণ্ডলের কালাচাঁদ)

১০৩. স্বর্গমর্ত্য ॥ উপন্যাস

১০৪. গন্নাবেগম ॥ উপন্যাস

১০৫. অরণ্যবহ্নি ॥ উপন্যাস

১০৬. হীরাপান্না ॥ উপন্যাস

১০৭. কিশোর সঞ্চয়ন ॥ গল্পগ্রন্থ

(হেডমাস্টার, কান্না, স্বাধীনতা, ভুলোর ছলনা, চিনু মণ্ডলের কালাচাঁদ, বিষ্টু চক্রবর্তীর কাহিনী, আফজ্জাল খেলোয়াড়ী ও রমজান শের আলি—সাতটি গল্প ; আমার ছেলেবেলা—স্মৃতিকথা ; বার মাইল দেশভ্রমণ—ভ্রমণকাহিনী।)

১০৮. মহানগরী ॥ উপন্যাস

১০৯. গুরুদক্ষিণা ॥ উপন্যাস

১১০. তপোভঙ্গ ॥ গল্পগ্রন্থ

(তপোভঙ্গ, ফল্গু, সনাতন, প্রত্যাবর্তন, শ্রীনাথ ডাক্তার—পাঁচটি গল্প।)

১১১. দীপার প্রেম ॥ গল্পগ্রন্থ

(দীপার প্রেম, এ মেয়ে কেমন মেয়ে, শঙ্করীতলার জঙ্গলে—তিনটি গল্প।)

১১২. নারী রহস্যময়ী ॥ গল্পগ্রন্থ

(মলি, কৃষ্ণা, টুনুর কথা, কাত্যায়নী, কালোবৌ—পাঁচজন নারীর

আলেখ্য। ভূমিকায় নারীচরিত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের অভিমত)

১১৩. পঞ্চকন্যা ॥ গল্পগ্রন্থ

(ময়দানব, নারী, এ মেয়ে কেমন মেয়ে, মেলা, স্থলপদ্ম—পাঁচটি গল্প।)

১১৪. শুকসারী কথা ॥ উপন্যাস

১১৫. শিবানীর অদৃষ্ট ॥ গল্পগ্রন্থ

(শিবানীর অদৃষ্ট, দেহের প্রদীপ রূপের শিখা—দুইটি গল্প।)

১১৬. শঙ্করবাঈ ॥ উপন্যাস

১১৭. আরোগ্যনিকেতন ॥ নাটক

১১৮. গবিন সিংয়ের ঘোড়া ॥ গল্পগ্রন্থ

(আফজাল খেলোয়াড়ী ও রমজান শের আলি, কালাপাহাড়, চিনু মণ্ডলের কালাচাঁদ, ডগি-এ্যালসেশিয়ান নয়, সুকু ও ভুকু, গবিন সিংয়ের ঘোড়া—ছয়টি গল্প।)

১১৯. জায়া ॥ গল্পগ্রন্থ

(জায়া, প্রসাদমালা, যাদুকরী, তপোভঙ্গ—চারটি গল্প।)

১২০. এক পশলা বৃষ্টি ॥ গল্পগ্রন্থ

(এক পশলা বৃষ্টি, এ্যাকসিডেন্ট, কয়েক ফোঁটা রক্ত, সুকু ও ভুকু—চারটি গল্প।)

১২১. মণি বউদি ॥ উপন্যাস

১২২. ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প ॥ গল্পগ্রন্থ

(কান্না, সুকু ও ভুকু, সাহিত্যতীর্থ নাম্বুর, চিনু মণ্ডলের কালাচাঁদ, বারো মাইল ভ্রমণ কথা, মনের আয়নায় নিজের ছবি, ভুলোর ছলনা, জটায়ু, দিগ্বিজয়ী ও নগ্ন সন্ন্যাসী, বিগত দিনের দুটি মানুষ, কমল মাঝির গল্প, বিষ্টু চক্রবর্তীর কাহিনী, সত্যপ্রিয়ের কাহিনী, ধার্মিকের পরীক্ষা, বিধাতা ও মানুষ, কাকপণ্ডিত, স্বাধীনতা—সতেরটি গল্প।)

১২৩. মিছিল ॥ গল্পগ্রন্থ

(অভিনেতা রতনবাবু, বিপিন চাটুজ্জে, জটিল ডাক্তার, সোনার তলোয়ার, রাধাদা, যতীনকাকা, কুলদা ঠাকুরদা, বিলিতি মাস্টার, শশীশেখর—নয়টি গল্প।)

১২৪. ছায়াপথ ॥ উপন্যাস

১২৫. কালরাত্রি ॥ উপন্যাস

১২৬. রূপসী বিহঙ্গিনী ॥ গল্পগ্রন্থ ॥

(রূপসী বিহঙ্গিনী, প্রত্যাখ্যান—দু'টি গল্প।)

১২৭. অভিনেত্রী ॥ উপন্যাস ॥

১২৮. ফরিয়াদ ॥ উপন্যাস ॥

১২৯. রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী ॥ প্রবন্ধ সঙ্কলন ॥

(১৯৭১ সালের ১৪ই ১৫ই ১৬ই ও ১৮ই ফেব্রুয়ারী বিশ্বভারতীতে 'নৃপেন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতা'য় দ্বিতীয় বর্ষে 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী' বিষয়ে চারটি বক্তৃতা। শেষ প্রবন্ধটি রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী বর্ষে রচিত ও প্রকাশিত। প্রারম্ভিক নিবেদন, রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীর মানুষ, রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীসমাজ, রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবর্ষ—পাঁচটি প্রবন্ধের সঙ্কলন।)

১৩০. উনিশ শ' একাত্তর ॥ গল্পগ্রন্থ

(সুতপার তপস্যা, একটি কালো মেয়ের গল্প—দু'টি বড় গল্পের সঙ্কলন।)

১৩১. শতাব্দীর মৃত্যু ॥ উপন্যাস

১৩২. উত্তর কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ॥ গল্পগ্রন্থ

(ভবানন্দের কাশীযাত্রা, গবিন সিংয়ের ঘোড়া, উত্তর কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ডগি-এ্যালসেশিয়ান নয়—চারটি গল্প।)

১৩৩. ব্যর্থ নায়িকা ॥ উপন্যাস

১৩৪. সখী ঠাকরুণ ॥ উপন্যাস

১৩৫. ভূতপুরাণ ॥ একটি বড় গল্প

১৩৬. জনপদ ॥ উপন্যাস

১৩৭. নবদিগন্ত ॥ উপন্যাস

যে উপন্যাসগুলো এখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি :

১. কীর্তিহাটের কড়চা

২. গোপন বাঁধের ইতিকথা

৩. কাঞ্চনী বিলের ধারে মালঞ্চার চর

৪. সুমিতার সাধনা

(তারাশঙ্করের যে সব অনুবাদিত রচনার উল্লেখ এই গ্রন্থে করা হয়েছে, সেগুলি ছাড়া 'গণদেবতা' 'পঞ্চগ্রাম' ও 'আরোগ্যনিকেতন'-এর ইংরেজি অনুবাদ দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ইউনেস্কো থেকে 'রাইকমল'-এর ফরাসী অনুবাদ এবং 'কালিন্দী'র ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের অপেক্ষা রয়েছে।)